শ্রীরমণাশ্রমের পত্রাবলী

প্রথম খণ্ড

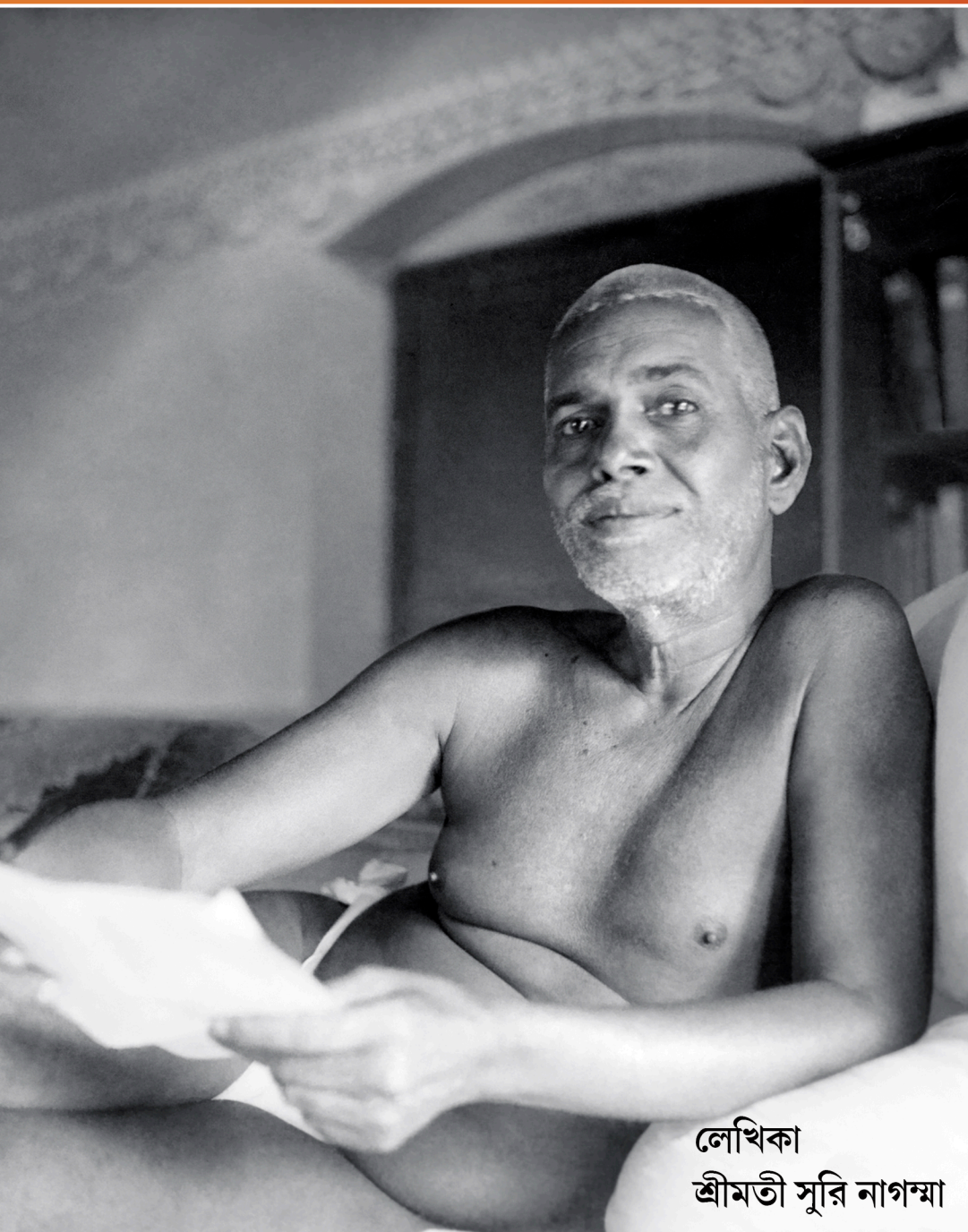

লেখিকা
শ্রীমতী সুরি নাগম্মা

ওঁ

নমো ভগবতে শ্রীরমণায়

শ্রীরমণাশ্রমের পত্রাবলী

প্রথম খণ্ড

লেখিকা

শ্রীমতী সুরি নাগম্মা

অনুবাদিকা

শ্রীমতী পূর্ণিমা সরকার

শ্রীরমণাশ্রম

তিরুভণ্ণামলই, দক্ষিণ ভারত

SRI RAMANASRAMER PATRABALI (BENGALI):
Original in Telugu: *Sri Ramanasrama Lekhalu* by Smt. Suri Nagamma
Translated from English *Letters from Sri Ramanasramam* by Smt. Purnima Sarkar

© Sri Ramanasramam
Tiruvannamalai, INDIA

ওঁ

নমো ভগবতে শ্রীরমণায়

শ্রীরমণাশ্রমের পত্রাবলী

প্রথম খণ্ড

21শে নভেম্বর, 1945

(1) পিতার প্রতি সন্তানের কৃতজ্ঞতা

দাদা,

ভগবানের সান্নিধ্যে বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ্যে তিনি যা বলেন লিখে পাঠাতে বলেছ। আমি কি তার যোগ্য? যাই হোক, আজ তার প্রথম আরম্ভ। ভগবানের কৃপা থাকলে চেষ্টা সফল হবে।

গত পরশু পূর্ণিমা ছিল, দীপম্ উৎসব খুব আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হল। আজ সকালে শ্রীঅরুণাচলেশ্বর অনুচরবৃন্দ ও ভক্তগণের সহিত গীতবাদ্য সহকারে গিরি প্রদক্ষিণে বার হয়েছেন। শোভাযাত্রা আশ্রমের প্রবেশ দ্বারে এলে সর্বাধিকারী শ্রীনিরঞ্জনানন্দস্বামী ও আশ্রমিকেরা নারিকেল, কর্পূর ইত্যাদি শ্রীঅরুণাচলেশ্বরকে নিবেদন করলে। পুরোহিতেরা শোভাযাত্রা থামিয়ে ঈশ্বরের আরতি করলে। আশ্রমের সবাই প্রণামাদি করলে। সেই সময়ে শ্রীভগবান গোশালার দিকে যাচ্ছিলেন শোভাযাত্রার আড়ম্বর দেখে জলকলের কাছে পুস্তক ভাণ্ডারের বারান্ডায় বসলেন। শ্রীঅরুণাচলেশ্বরের আরতি পাত্র তার কাছে আনা হ'লে ভগবান সামান্য বিভূতি নিয়ে কপালে লাগালেন আর মৃদুকণ্ঠে বললেন, ''আপ্পাকু পিল্লাই অড়ক্কম্'' (পিতার প্রতি সন্তানের কৃতজ্ঞতা)। মনে হল আবেগে তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হল। তাঁর মুখের ভাবে প্রাচীন বাক্য ''ভক্তি পূর্ণতয়া জ্ঞানম্'' (ভক্তির পূর্ণতাই জ্ঞান) প্রমাণিত হল। শ্রীভগবান পরমেশ্বর শিবের সন্তান। গণপতি মুনি

তাঁকে স্কন্দ অবতার বলতেন, আজ তার সমর্থন পাওয়া গেল। মনে হল, ভগবান যেন আমাদের শেখাচ্ছেন যে সকল জীবই ঈশ্বরের সন্তান, এমন কি জ্ঞানীও ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ।

মহাত্মাদের কথা কত যে জ্ঞানগর্ভ তা ধারণা করা কঠিন। তুমি আমাকে যে কোন প্রকারে লিখতে বলেছ, কিন্তু তাঁর বলার অপরূপ ভঙ্গিটি আমি চিঠিতে কী ক'রে পাঠাই? যথার্থ বর্ণনাই বা কী ক'রে দিই? সম্প্রতি একটা কবিতায় লিখেছিলাম যে তাঁর মুখের প্রতিটি কথাই শাস্ত্র। কেবল কথা কেন? যদি অনুভবের সামর্থ্য থাকে, তবে তাঁর চাহনি ও চলন, কর্ম ও বিশ্রাম, নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস সব কিছুই তাৎপর্যপূর্ণ। আমার কি এসব বোঝার ও ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা আছে? শ্রীভগবানের কৃপার ওপর অখণ্ড বিশ্বাস রেখে কাঠবিড়ালের শ্রীরামচন্দ্রকে সেবা করার মত ভগবানের সেবায় মনে যা উঠবে তোমায় লিখে পাঠাব।

তোমার বোন

* * *

22শে নভেম্বর, 1945

(2) অহম্ সুরণ

গতকাল হৃষীকেশানন্দ নামে একজন গৈরিকধারী বাঙালি সাধু এসেছিল। আজ সকাল সাড়ে আটটা থেকে বেলা এগারোটা অবধি ভগবান তার সঙ্গে ক্রমাগত আধ্যাত্মিক বিষয়ে কথাবার্তা বললেন। তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বর অবিরাম অমৃতময়ী গঙ্গা প্রবাহের মতো বয়ে যেতে লাগল। আমার লেখনী সেই তীব্র প্রবাহের সঙ্গে কী ক'রে সঙ্গতি রাখবে? সেই অমৃত কেবল ভক্তিরূপ অঞ্জলি দিয়ে আহরণ ক'রে আকণ্ঠ পান করা যায়– চিঠি ভ'রে সেটা কী ক'রে পাঠাই? যখন শ্রীভগবান মাদুরায়ে তাঁর মৃত্যুর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন তখন তাঁর মুখশ্রীর উজ্জ্বলতার দিকে

তাকানো যাচ্ছিল না, তাঁর জ্ঞানগর্ভ বাণী বুদ্ধির অগম্য ছিল। বক্তার বর্ণনার আগ্রহে শ্রোতার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গেল।

তাঁদের প্রশ্নোত্তরের আরও বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারতাম, কিন্তু বর্তমানে মেয়েদের বসার জায়গা অনেক দূরে আর আমিও সবার পিছনে বসার জন্য সব আলোচনা ভালভাবে শুনতে পাইনি। একটি কথা কিন্তু স্পষ্ট শুনেছি। ভগবান বললেন, 'মৃত্যুর অভিজ্ঞতায় ইন্দ্রিয় নিস্তেজ হলেও অহম্ সুরণ (আত্মচেতনা) স্পষ্ট অনুভব হচ্ছিল। সুতরাং আমি একে, যাকে আমরা 'আমি' বলি সেই চেতনা বলে হৃদয়ঙ্গম করলাম, এটা শরীর নয়। আত্মচেতনা কখনই নষ্ট হয় না। এটা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। এটা স্বয়ং প্রকাশ। শরীরটা দাহ করা হলেও এর কোন বিকার হবে না। সুতরাং সেইদিন থেকে একেই আমার 'আমি' ব'লে পরিষ্কার উপলব্ধি করলাম।''

এরূপ অনেক বিষয় বলা হয়েছিল কিন্তু আমি ঠিক ধরতে পারিনি বা মনে নেই সুতরাং এ সম্বন্ধে আর বেশি কিছু লিখতে পারলাম না। এরকম আলোচনা আগেও হয়েছে কিন্তু সেই সব অমূল্য রত্ন হারিয়ে আমার আর খেদের অন্ত নেই। বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আলস্য ও ঔদাসীন্যের জন্য আমার না লেখাকে ক্ষমা কোরো।

* * *

23শে নভেম্বর, 1945

(3) উমা ও মহেশ্বরের বিবাদ

আজ অপরাহ্নে অন্যান্য ভক্তের সঙ্গে বিশ্বনাথও ভগবানের কাছে বসেছিল। কেন জানি না, তাঁর একজন বৃদ্ধার কথা মনে এল, তিনি তার সম্বন্ধে বললেন (পরে জেনেছিলাম যে, সে মুট্টকৃষ্ণ ভাগবতারের ছোট বোন সে কীলুর অগ্রহারমে (জন্মাষ্টমীর) দিনে ভগবানকে আদর ক'রে খাইয়েছিল)– ''সেই সাধ্বী মহিলা যে কেবল পরিতোষপূরক খাইয়েছিল

তা নয়, স্নেহভরে একটি নৈবেদ্যের ছোট মোড়ক দিয়ে বলেছিল, 'বাছা, এটি ভাল ক'রে রাখ, রাস্তায় খিদে পেলে খেও।' আমি যখন বিরূপাক্ষ গুহায় ছিলাম, সে দু-দু'বার দেখতে এসে বলেছিল, 'আহারে, বাছা আমার, দেখ দেখি কী অবস্থায় আছ! এমন সোনার বরণ শরীর, একটা কাপড়ও গায়ে দাও না'।'' এভাবে ভগবান যখন তার মাতৃস্নেহের কথা বলেছিলেন, দেখলাম তিনিও স্নেহে বিগলিত। আবেগে তাঁর গলা ধরে এল। এই দৃশ্য দেখে, পুরাতন প্রবচন ''জ্ঞানী নবনীত কোমল'' কথাটা ও আর একবার সেই আপ্তবাক্য ''প্রেম পূর্ণতয়া জ্ঞানম্'' (ভক্তির পরাকাষ্ঠা জ্ঞান) মনে পড়ল।

কিছুকাল আগে, অরুণাচল পুরাণের যে অংশে গৌতম অম্বার স্তব করেছেন সেটা পড়তে গিয়ে ভগবানের চোখে জল এল, গলা ভেঙ্গে গেল, তিনি বইটা বন্ধ করে চুপ করে রইলেন। যখনই কোনো করুণ বা প্রেমভক্তিপূর্ণ ঘটনা ঘটে কিংবা ভক্তি উদ্দীপক কিছু পড়া হয় তখনই তিনি আবেগে অভিভূত হন। লক্ষ্য করে দেখলে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে প্রেম ও ভক্তি জ্ঞানেরই নামান্তর।

এক সপ্তাহ আগে 'হিন্দু সুন্দরী' পত্রিকায় 'পাচিকলু' (পাশা) নামে একটা কথিকা ছিল। স্কন্দপুরাণের একটা কাহিনী। এক সময়ে পার্বতী ও মহেশ্বর নারদের ঝগড়া বাঁধানোর ফাঁদে পড়েছিলেন। ''লক্ষ্মী ও বিষ্ণু পাশা খেলেন, আপনারাও খেলেন না কেন?'' এই বলে নারদ তাঁদের উৎসাহিত করেন। পার্বতী আগ্রহান্বিত হ'য়ে শিবকে পাশা খেলার জন্য প্ররোচিত করেন। বলাবাহুল্য খেলায় শিব হারলেন। পার্বতী গর্বিত হয়ে শিবকে তাচ্ছিল্য করেন। কাহিনীটা এই রকম।

কথিকাটি পড়ে ভগবান ভক্তি আপূরিত হৃদয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''কাহিনীটি পড়েছ?'' আমি, ''হ্যাঁ, ভগবান'' বললে, তিনি আবেগের সঙ্গে বললেন, ''উমা-মহেশ্বরের এই বিবাদ উপলক্ষ্যে বাৎসরিক সংক্রান্তি পালন করা হয়।''

প্রতি বৎসর ওই দিনে দিব্য বিবাহ তিথি পালন করা হয়, জানো তো, ভগবানের কাছে এই উৎসবের কোন আলোচনা হলে, সাধারণতঃ তিনি ভাবালুতার সঙ্গে মন্তব্য করেন ''এটা মা-বাবার (উমা-মহেশ্বর) বিবাহোৎসব পালন।'' তুমি তো জানো, মহাত্মাদের জীবন কত রহস্যময় ঘটনায় ভরা, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁদের মুখমণ্ডলে সেই সেই রসের উপযুক্ত ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু সকল রসের ঘন মূর্তি সর্বব্যাপক বিজ্ঞানরসের তুলনায় আর কী বলার আছে?

* * *

24 নভেম্বর, 1945

(4) বিবাহ

গতকাল ভগবানের মাঝে মাঝে 'মা-বাবার' বিবাহ উৎসব সম্বন্ধে মন্তব্য লিখেছি। এমনকি ভক্তেরাও তাদের পরিবারের সদ্যবিবাহিত নবদম্পতিকে শ্রীভগবানের শ্রীচরণে প্রণামের জন্য নিয়ে এলে তিনি অভ্যস্ত করুণাপূর্ণ হাস্যে তাদের আশীর্বাদ করেন খুব আগ্রহের সঙ্গে বিয়ের খুঁটিনাটি খবর শোনেন। সেই সময়ে, আমাদের ছোটবেলায় পুতুলের বিয়ে দেওয়া দেখে বড়রা যেমন মজা পেতেন ঠিক সেই ভাব ভগবানের মুখে ফুটে ওঠে।

প্রভাবতীর বিয়ে বেশি দিন হয়নি। বোধ হয় এক বছর হল। বিয়ের আগে প্রায় দু'বছর সে এখানে ছিল। অতি নম্র মার্জিতা সুন্দরী মহারাষ্ট্রীয় মেয়ে। সাধ্বী মীরাবাঈ-এর মতো ভক্তিমতী হওয়ার ইচ্ছায় নাচগান করত আর বলত বিয়ে করবে না মাঝে মাঝে গেরুয়া রঙের কাপড় প'রে ভগবানের সামনে দুরন্তপনা করত। ভগবান জানতেন বিয়ে না হলে এ দুষ্টামি যাবে না। যাই হোক শেষে বিয়ে হল। বিয়ের পরই বিয়ের পোশাকে সেজে বর-বধূ আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ফল-ফুল নিয়ে ভগবানকে প্রণাম করতে এল।

দু'তিন দিন এখানে থাকার পর, নূতন বাড়িতে যাওয়ার আগে একদিন সকাল আটটার সময়ে সে ভগবানের আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য স্বামীর সঙ্গে হলঘরে এল। তখন কাঠবিড়ালেরা সোফার ওপর ছুটোছুটি করছে ময়ূরেরা হলঘরের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘরেও বিশেষ কেউ নেই ঘরটি নির্জন-নিস্তব্ধ যুবকটি সম্ভ্রম ও ভক্তির সঙ্গে প্রণাম ক'রে বিদায় নিয়ে দরজার কাছে অপেক্ষা করতে লাগল। লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে ছলছল চোখে দাঁড়িয়ে থাকা আশ্রমের স্নেহের পুতুলিকে ঠিক যেন কণ্ব-আশ্রমের বিদায়-কালীন শকুন্তলার মতো দেখাচ্ছিল। ভগবান সম্মতি দিলে, সে প্রণাম করল। তার চৌকাঠ পার হতে না হতে ভগবান তার দিকে চেয়ে মন্তব্য করলেন, ''এই সেদিন ও সুন্দরেশ আইয়ারকে দিয়ে ভাগবতের 'কৃষ্ণাবতার' লেখালে, আমি আনন্দের সঙ্গে বললাম পরের বার ছেলে কোলে নিয়ে আসবে''। ইতিমধ্যে সে হলঘর প্রদক্ষিণ করতে করতে কোকিলার মতো সুমধুর সুরে একটি ভক্তিগীত গাইতে শুরু করেছে। ভগবান স্পষ্টতঃ কণ্ব ঋষির মত বিচলিত হয়ে বললেন, ''মকুন্দমালা স্তোত্র শুনতে পাচ্ছ?'' আমার চোখে জল ভরে এল।

তার বার বার ভগবানকে প্রণাম করার সময়ে আমি বাইরে চলে গেলাম আর তাকে আমার আশীর্বাদ জানালাম তারপর তাকে আশ্রমের ফটক অবধি এগিয়ে দিয়ে হলে ফিরে এলাম। জানি না, তুমি একে অতিরঞ্জন বলবে কি না, কিন্তু বলতেই হবে যে, আমরা পুরাণে যে সকল কাহিনী পড়ি সেগুলো আমাদের চোখের সামনেই পুনরভিনীত হয়ে চলেছে।

* * *

25শে নভেম্বর, 1945

(5) স্কন্দাশ্রমের দিকে

আগামী কাল শুভদিনে ভগবানের ভক্তদের সঙ্গে স্কন্দাশ্রমে গিয়ে বনভোজনের ব্যবস্থা হয়েছে। আশ্রমিক ও নিকটে যারা থাকে সব গুরু ভাইবোনেরা উৎসবের বিপুল আয়োজনে সারাদিন ব্যস্ত। ভগবান কিন্তু শান্ত সমাহিত ও নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বসে আছেন। যদি সকলে তাঁকে যেতে বলে তবে তিনি যাবেন আর তারা যদি 'না' বলে তাহলে থেকে যাবেন। তাঁর ব্যবস্থা ও চিন্তা করার কী আছে? করা (লাঠি), কৌপীন, কমণ্ডলু ও গায়ের তোয়ালে, এইতো তাঁর সম্বল। যে মুহূর্তে ইচ্ছা হবে তখনই রওনা দিতে পারেন। শঙ্করাচার্য এরকম ঋষিদের কথাই ''কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ'' (কৌপীনধারীরাই ভাগ্যবান) বলে বর্ণনা করেছেন। এই আশ্রম, এর উন্নতি, ভক্তমণ্ডলী আর সাজসরঞ্জাম যেন অন্যের জন্য মঞ্চে সাজানো নাটক, কিন্তু এ সবে ভগবানের কী দরকার? তাঁর অসীম করুণায় তিনি এই বাঁধন স্বীকার ক'রে আমাদের মধ্যে রয়েছেন, কিন্তু মুহূর্তের ইচ্ছায় সাত সাগর হেলায় পার হয়ে যেতে পারেন। মনে রেখো, তাঁর আমাদের মধ্যে থাকা, আমাদেরই পরম সৌভাগ্য। আগামীকালের বিবরণ পরে লিখব।

* * *

26শে নভেম্বর, 1945

(6) ঋষির সেবায়

সকালের বেদপারায়ণে গিয়ে দেখি সকলেই ভীষণ ব্যস্ত। রান্না- ঘরটা দেখবার মত হয়েছে, কেউ রান্না করছে, কেউ বাসন মাজছে, কেউ অন্যকে ফরমাশ করছে, সকলেই কিছু না কিছুতে ব্যস্ত। পুলি- হোদরা, দধ্যোদনম্, পোঙ্গল, বড়া, ভাজা, পুরি, কূটু ও আরও নানা খাবারে ঝুড়ি ভর্তি ক'রে

পাহাড়ে পাঠানো হচ্ছে। মনে হয়, সর্বাধিকারী সারারাত ঘুমান নি। সব দায়িত্ব তাঁর।

বলা হয়, শ্রীকৃষ্ণ গোপদের বাৎসরিক ইন্দ্র-যজ্ঞ বন্ধ ক'রে গিরি গোবর্দ্ধনের পূজার প্রচলন করেন। পাহাড়ে পাঠানো সারিবন্দি ঝুড়িগুলো দেখে মনে হচ্ছিল বোধহয় শ্রীরমণ বাৎসরিক কার্তিকী আমলাগাছের পূজা 'বন সমারাধনা' স্থগিত ক'রে অরুণাচলের পূজা শুরু করালেন।

বেদপারায়ণের পর ভগবানের স্নান ও জলখাবার খাওয়া হলে, শিবের সহচর নন্দীর মতন রঙ্গস্বামীর সঙ্গে তিনি রওনা দিলেন। সবার আগে চলেছেন ভগবান, যেন নিজের বাড়ি ফিরছেন।

ভগবানের কিছুমাত্র অসুবিধা না করে ভক্তেরাও দলে দলে রওনা দিয়ে স্কন্দাশ্রমে পৌঁছাল। আলামেলু পিসিমা (ভগবানের ছোট বোন) ও আমি পিছু নিলাম। কয়েকজন মহিলা একটু পরে এসে পৌঁছাল। স্কন্দাশ্রম ঘরটির সামনে মনোরম গাছের ছায়ায় ভক্তদের নিয়ে ভগবান আরাম করে বসলেন। ঋষির আশ্রম যে কেমন হয়, এবার বোঝা গেল। এই আশ্রমটি 'হরিবংশে' বর্ণিত পুরাকালের বদরিকাশ্রমের মতন। বদরিকাশ্রম আর সাক্ষাতে দেখার উপায় নেই। স্কন্দাশ্রমও তার মতো নয়নানন্দদায়ক, সেই সন্ধ্যার্ঘজলদায়িনী 'শম্যাস্বরের' মত একটি পাহাড়ি ঝরনা পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে, ঋষিকুমারদের সামগানের মতো পাখির কলকূজনে মুখরিত রয়েছে। বহু সাধুসন্ন্যাসী ছাড়া উকিল, ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, শিল্পী, সংবাদপত্র প্রতিনিধি, কবি, গায়ক ও আরও অন্যান্য লোক মাদ্রাজ, পণ্ডিচেরি ও ভিল্লিপুরম থেকে এসেছে। ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ, ধনী-গরিব সব ভেদ ভুলে ভগবানের শ্রীচরণতলে বসে তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। খনিজ সম্পদে ভরা অরুণগিরি যেন তাঁর মণিরত্নময় সিংহাসন, আকাশের সাদা মেঘ যেন শ্বেত ছত্র, অসংখ্য শাখাবিশিষ্ট গাছটি যেন 'বীঞ্জনবরম' (মন্দিরের বড় পাখা)। ভগবান রাজ্যাভিষিক্ত সম্রাটের মতো বসে রয়েছেন আর প্রকৃতিকান্তা (প্রকৃতি সুন্দরী) কোমল সূর্যরশ্মির প্রদীপ নিয়ে যেন আরতি করছেন।

দাদা, এ ছবি আমি তোমার জন্য কী ক'রে আঁকি? মহর্ষি শান্ত, আর তাঁর অতল গভীর সৌম্য দৃষ্টি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর হাল্কা হাসিটি যেন চাঁদের জ্যোৎস্না, কথা যেন অমৃত নির্ঝর, আমরা দেহজ্ঞান ভুলে পুতুলের মত বসেছিলাম। ফোটোগ্রাফারেরা তাদের ছবি নিলে। সাড়ে নয়টায় আশ্রমের দিনলিপি চিঠিপত্র পড়া, খবরের কাগজ দেখা শুরু হল, যেন মহারাজার দরবার। ক্রমশঃ আকাশ মেঘলা হল, জোরে হাওয়া উঠল। ভক্তেরা ভগবানকে একটি শাল দিলে, তিনি তাই দিয়ে মুখটি বাদ দিয়ে সব ঢেকে বসলেন। এরকম বসা অবস্থায় তাঁকে ঠিক তাঁর মা অলগম্মার মত দেখাচ্ছিল। পিসিমা ও আমার ঠিক তাই মনে হচ্ছিল। এই রকম ফোটোও একটা নেওয়া হল।

ভগবান মৌন ধ্যানমগ্ন যেন ''গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানম্'' (গুরু মৌন দ্বারা ব্যাখা করছেন)। নিশ্চয় সেখানে কোন শুদ্ধ আত্মা ছিলেন যিনি ছিন্ন সংশয় হয়ে থাকবেন। কিন্তু আমার মন সেই পুলিহোদরা, দধ্যোদনম্ ইত্যাদিতে পড়েছিল। প্রায় দুপুর হল, ভাবছিলাম সবই কি পাহাড়কে নিবেদন করা হয়েছে না আমাদের জন্যও কিছু আছে। একটু পরে সাড়ে এগারোটার সময়ে সন্দেহ মিটল। আমার ভায়েরা ভগবানকে আলাদা খাওয়ানোর মতলবে ছিল। কিন্তু তিনি কি তাতে রাজি হবেন? তাঁর সোফার কাছে একটা ছোট টেবিল আনিয়ে সকলের মধ্যে বসে খেলেন।

খাওয়ার পর তাঁর সোফা বারান্ডায় রাখা হল। বারাণ্ডা লোহার গরাদে ঘেরা। প্রথমে ভক্তেরা দূরে বসলেও একে একে সবাই কাছে সরে এল। আলামেলু পিসিমা, আমি আর কয়েকজন মহিলা পাশের ঘরে বসে তাঁর শ্রীচরণের সোজাসুজি একটা ছোট জানালা দিয়ে দর্শন করছিলাম। তারপর তিনি পাহাড়ে থাকার সময়ের ছোট ছোট ঘটনা যেমন মায়ের আসা, স্কন্দাশ্রম প্রতিষ্ঠা, জল সরবরাহ, খাবার পাওয়া, বাঁদর-রাজ্যের নিয়ম, ময়ূরের নৃত্য, তাঁর চিতাবাঘ ও সাপের সঙ্গে দেখা হওয়া ইত্যাদি বলতে লাগলেন। এই রকম কথাবার্তার সময়ে সদ্য আগত কবি নগনার্যকে সম্বোধন ক'রে বললেন ''কখন এলে?'' তারপর আমার দিকে চেয়ে

বললেন, ''এতক্ষণে এল।'' আমি বললাম, ''তাইতো দেখছি।'' তারপর কিছু মনে পড়ায় বিস্ফারিত নেত্রে এক দৃষ্টে চেয়ে বললেন, ''ওখানে মায়ের নির্বাণ (দেহত্যাগ) হয়েছিল। আমরা তাঁকে বাইরে ওইখানে এনে বসিয়েছিলাম, মুখে কোন মৃত্যুর চিহ্ন প্রকাশ হয়নি, যেন একজন গভীর সমাধিমগ্ন অবস্থায় রয়েছেন, মুখের ওপর স্বর্গীয় জ্যোতি ভাসছিল। ওখানে, ঠিক ওইখানে যেখানে তোমরা বসে আছ।''

তাঁর মনোমুগ্ধকর কথাগুলো যেন আমার কানে বাঁশি বেজে উঠল। যেখানে আসা চিরকাম্য সেখানে এসেছি, যা শোনার শুনেছি। আজ কী শুভদিন!

কপিল দেবাহুতিকে মোক্ষধর্মে দীক্ষিত ক'রে মুক্তি দিয়েছিলেন। ধ্রুব সুনীতিকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন। শ্রীরমণ তাঁর বেলায় শ্রদ্ধেয়া মাকে কেবল যে মুক্তির অনন্তরাজ্য আর পরমানন্দ দিলেন তাই নয়, উপরন্তু তাঁর সমাধির ওপর মাতৃভূতেশ্বর লিঙ্গ স্থাপন ক'রে সর্বোত্তম গৌরব ও তার ঘোষণার চিরস্থায়ী ব্যবস্থাও করেছেন।

শ্রীভগবানের মুখে 'মা' কথাটা শুনে আমার ভাবাবেশ হল, চোখ জলে ভরে এল। মনে হল মেয়ের কাছে মায়ের কথা হচ্ছে। মহাত্মারা সব সময়ে মেয়েদের সম্মান করেন। তাঁরা মেয়েদের জননী ও স্নেহের আদর্শরূপেই দেখে থাকেন। প্রকৃতি ছাড়া সৃষ্টি হয় না। মা আসার আগে আশ্রমে রান্না হত না। মা এসে আশ্রমিকদের পেট ভরে খাওয়ালেন। তিনি যে অগ্নিহোত্র (আগুন) স্থাপন করলেন, সে আজও রান্না করছে আর হাজার হাজার ভক্তদের উদর পূরণ করছে।

আমি পিছন ফিরে দেওয়ালে পূজনীয়া মায়ের ছবি দেখতে গিয়ে হতাশ হলাম কারণ সেখানে কোন ছবি ছিল না তখন মনে মনে বললাম, ''মাগো! এ যে সকল নারী জাতির গৌরব! আমরা সার্থক!'' ইতিমধ্যে অনেক রকম সুস্বাদু খাবার জিনিস পরিবেশন করা হল। খাওয়ার আধঘন্টা পরে পুরি ও কূটু (সবজি) দেওয়া হল। খাওয়ার পর একে একে ফেরার

পালা। সকলকে একে একে বিদায় দিয়ে অরুণগিরি সিংহাসন ত্যাগ ক'রে সেবকদের সঙ্গে ভগবান ধীরে ধীরে পাহাড়ের নীচে আশ্রমে ফিরে এলেন, সূর্যও পাহাড়ের পিছনে পশ্চিম আকাশে অস্ত গেল। তারপর আশ্রমের দিনলিপি বেদপারায়ণ ইত্যাদি যেমন হয়, হল।

বিনবলে কনবলেগা কে
যনুবুন ভ্রায়ংগবচ্চু নন্না। বিনুমা
অনুপম তেজুনি মহিমলু
বনজজুড্ডে চেপ্পুগাক বশমে নাকুণ্।
শ্রবণে নয়নে তারে করো আহরণ
মহতের মহিমা না যায় বর্ণন।
লেখনী প্রকাশ করে, হেন সাধ্য কার?
করিতে এরূপ মাত্র ব্রহ্মা শক্তিধর॥

* * *

26শে নভেম্বর, 1945

(7) নিক্ষেপন্ (সম্পদ)

গতকালের চিঠি খুলে পড়লাম। স্কন্দাশ্রম যাত্রা মহা আনন্দের হয়েছিল সন্দেহ নেই। গভীর ভাবে চিন্তা ক'রে একটা কথা আমার মনে উঠল। বিন্নাকোটা বেঙ্কটরত্নমের গান আছে–

ক্ষুধাতুরে তৃপ্ত করি দিল সে বিদায়
মুক্তির পথ না দেখাল কাহারেও।
কৃপাপর, উদাসীন দু'টি ব্যবহার
পথ বলি দিয়া, না জিজ্ঞাসিল আর॥

এই কথাগুলো সত্য হল। যতক্ষণ স্কন্দাশ্রমে ছিলাম তিনি এটা ওটা নানা কথা বললেন তার আমাদের খাইয়ে বিদায় দিলেন। ভেবে দেখ!

এতেই আমরা মহা আনন্দিত ও বিগলিত হ'য়ে নিজেদের কথাও ভুলে গেলাম। আসল বস্তুটি, অমৃত সম্পদ, তিনি নিশ্চয় অরুণাচলের কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন। আমাদের আসল বস্তু খুঁজে লাভ করতে না দিয়ে, মুখরোচক খাদ্যসামগ্রীর মোহে ভুলিয়ে দিলেন। গুপ্ত সম্পদের কথা কেউ জিজ্ঞাসা করল না। দোষ তো আমাদেরই। এ সব জিনিস নয়, আমাদের কাম্য ছিল অন্য বস্তু- চেয়েছিলাম একমেবাদ্বিতীয়মের এক রস। মায়ের কাছেও না চাইলে পাওয়া যায় না। আমরা অসুট স্বরে অভাব জানাই কিন্তু যদি ক্ষুধার্ত হয়ে চাইতাম, তবে কি তিনি অখণ্ডজ্ঞানরূপ আধ্যাত্মিক অন্ন দিতেন না? তিনি যে করুণার সাগর। তাঁর আর কী হল? আমরাই চাইতে জানি না। গুপ্তধনটি তাঁর নিজের বাড়ি অরুণাচলেই রয়ে গেল। মহাত্মাদের কাজ কী ইঙ্গিতপূর্ণ দেখেছ? ভগবান কীভাবে জানালা দিয়ে এক দৃষ্টিতে এর দিকে চেয়ে থাকেন, দেখেছ তো? এক মুহূর্তের জন্যও গুপ্তধনের কথা ভোলেন না। আমাদের মত লোকের কি সেটা পাওয়ার উপায় আছে? উপযুক্ত হলে তবে তিনি দেন, না হলে নয়। বলে না, জমি অনুসারে বীজ, যোগ্যতা অনুসারে পুরস্কার। আমাদের গুরুর মতো এমন দাতা পেয়েও আমাদের অক্ষমতায় কিছু পেলাম না। তুমি কী বল? এটা সত্যি না?

* * *

28শে নভেম্বর, 1945

(8) আত্মস্বরূপের সেবাই আত্মসেবা

ভগবানের বাতের জন্য মালিশের তেল দিয়ে সেবকেরা গত দু'তিন মাস তাঁর পা মালিশ করছিল। তাঁর শরীর সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে কয়েকজন ভক্তও পালা ক'রে আধঘন্টা মালিশ করতে শুরু করাতে আশ্রমের সব রুটিন ওলট-পালট হয়ে গেল।

ভগবানের কি তা সহ্য হয়? তিনি এতই সহানুভূতিশীল যে নিজের সেবকদেরও জোর করে 'না' বলতে পারেন না। সুতরাং কথায় কথায় বললেন, ''একটু দাঁড়াও, আমিও মালিশ ক'রে একটু পুণ্য করি!'' এই বলে তাদের হাত সরিয়ে নিজেই মালিশ করতে লাগলেন। আমার খুব মজা তো লাগলই আর মালিশের ছলে তাঁর চরণ কমলে প্রণাম করার যে বাসনাটুকু মনে উঠেছিল তাও কর্পূরের মতো উবে গেল। ভগবানের কথায় একটা নিজস্ব জাদু আছে। দেখ! তিনিও একটু পুণ্য চান! বুদ্ধি থাকলে বুঝতে পারবে কী সূদ ইঙ্গিত!

প্রায় সেই সময়ে একজন অবসরপ্রাপ্ত অতিবৃদ্ধ বিচারপতি বললেন, ''স্বামী, আমায় একটু গুরুর পদসেবার সুযোগ দিন।'' ভগবান বললেন, ''তাই নাকি? আত্মবৈ গুরুঃ! (আত্মসেবাই গুরু সেবা)। সত্তর বছর বয়স, আমার সেবা করতে চাও? থাক! এখন থেকে নিজের সেবা করো। শান্ত হয়ে থাকো, তাতেই হবে।''

ভেবে দেখলে- এর থেকে বড় উপদেশ আর কী হতে পারে? ভগবান বলছেন, শান্ত হতে পারলেই হবে। তাঁর পক্ষে এটা স্বাভাবিক, আমরা কী করে করব? যতই চেষ্টা করি- আমাদের সে অবস্থা লাভ হয় না। অতএব ভগবানের উপর ভার দেওয়া ছাড়া আর কী করার আছে?

* * *

29শে নভেম্বর, 1945

(9) সমত্ব (সবার প্রতি সমভাব)

বোধ হয় এক বছর আগে হবে। আয়ুর্বেদ চিকিৎসক রামচন্দ্র রাওকে মনে আছে? ভগবানের শরীর যাতে ভাল হয় এরকম ওষুধ তৈরি করবে বলে একটা গাছ-গাছড়ার লম্বা তালিকা ভগবানকে দেখালে, তিনিও বাধ্য ভাল ছেলের মতো আগাগোড়া প'ড়ে গাছ গাছড়ার গুণাগুণ আলোচনা ক'রে

অবশেষে বললেন, ''বাপু, এটা কার জন্য?'' সে বললে, ''ভগবানের জন্য।'' শুনে ভগবান উত্তর দিলেন, ''তাই জন্য এত বড় তালিকা, কিন্তু পয়সা কোথায় পাব? হয়ত দশ টাকা খরচ হবে, কার কাছে চাইব?''

চারিদিকে আশ্রমের ঘরবাড়ির দিকে চেয়ে একজন মৃদুস্বরে বললে, ''ভগবান, এসব কার?''

ভগবান বললেন, ''তা তো বুঝলাম, আমার কী আছে? আমার এক পয়সা দরকার হলে সর্বাধিকারীর কাছে হাত পাততে হবে। কী বলে চাইব? ঠিক ঘন্টা বাজলে যদি যাই তবে সে আমায় কিছু খেতে দেবে। সবার সঙ্গে যাই, খেতে পাই, দেরি করলে হয়ত পাব না! খাওয়ার বেলায়ও আমি সবার শেষে পাই।'' বেচারি চিকিৎসক ভয় পেয়ে হাত জোড় করে বললে, ''আপনাকে তালিকা দেখালাম, অনুমতি করলে এ সব আমিই জোগাড় করব।''

তাতে ভগবান বললেন, ''তাই নাকি, তুমি জোগাড় করবে? বেশ তো, এটা যদি আমার পক্ষে ভাল হয় নিশ্চয় সবার পক্ষেও ভাল। সবার জন্য ওষুধ তৈরি করতে পারবে তো?'' এ কথা শুনে কয়েকজন বলে উঠল, ''আমাদের কী দরকার, ভগবান?'' তার উত্তর হল ''যারা শারীরিক পরিশ্রম করে তাদের যদি টনিকের দরকার না থাকে তবে আমি তো বসে বসে খাই? না, না, তা হতে পারে না।''

আরও একবার ডাঃ শ্রীনিবাস রাও ভগবানকে একটা অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের নাম ক'রে বলেছিল যে ভগবান যদি খান তবে ভাল হয়। ভগবান শুনে বললেন, ''তা বেশ, তোমরা বড়লোক যা ইচ্ছা খেতে পারো কিন্তু আমায় কেন? আমি সন্ন্যাসী, এত দামি ওষুধ কোথায় পাব?'' ডাক্তার বললে, ''ভগবান সব সময়ে আপত্তি করেন। আপনি রাজি হলে ওষুধ ঠিক এসে যাবে, যদি তাও না করেন তবে পুষ্টিকর খাদ্য দুধ, ফল, বাদাম তো খেতে পারেন?''

ভগবানের উত্তর হল, ''তা বেশ, কিন্তু আমি দরিদ্র নারায়ণ এসব জোগাড় করব কী করে? তাছাড়া আমি কি একলা? আমার এত বড় পরিবার, সবাইকে কী করে ভাল জিনিস খাওয়ানো যাবে?''

তাঁর জন্য বিশেষ কিছু করা ভগবান একেবারে পছন্দ করেন না। বার বার বলেছেন যে আশ্রমে সুখাদ্য এলে সবাইকে দিয়ে যদি তাঁর ভাগে কিছু নাও থাকে তাতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু কেবল তাঁকে দিয়ে যদি অন্যেরা না পায় তাতে তিনি দুঃখিত হবেন। পথে চলতে বিপরীত দিক থেকে কেউ এলে, তারা যদি দাঁড়িয়ে ভগবানকে পথ দেয়, তিনি আপত্তি করেন আর যতক্ষণ না তারা তাঁকে পেরিয়ে যায় ততক্ষণ তিনি এক পাও যান না। আমরা তাঁর বৈরাগ্য ও সমত্বের হাজার ভাগের একভাগ পেলেও ধন্য হয়ে যেতাম।

তাঁর ইচ্ছা না বুঝে, আমার মতো মূর্খেরা যদি খাওয়া ইত্যাদির ব্যাপারে বিশেষ কিছু করে বসে তাহলে অসীম ক্ষমাশীল অনেক সহ্য করেন, কিন্তু বাড়াবাড়ি হলে বিরক্ত হয়ে বলেন, ''আমি আর কী করতে পারি? এদের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকি, ওরা দেয় আমাকে খেতে হয়, ওরা যা বলে আমায় তাই করতে হয়। দেখ এর নাম 'স্বামীত্বম্' (সাধু হওয়া), এবার বুঝেছ?'' এর চেয়ে বেশি ভর্ৎসনা আর কী হতে পারে, বল?

* * *

30শে নভেম্বর, 1945

(10) সাংসারিক জ্বালা

এক প্রৌঢ় দম্পতি মাঝে মাঝে এখানে আসে, দু'বছর আগে একবার তারা এখানে দু'মাস থেকে গেল। লোকটির বাড়িঘর, ছেলেমেয়ে ছেড়ে বেশিদিন থাকার উপায় ছিল না কিন্তু দোষটা স্ত্রীর ওপর চাপিয়ে ভগবানের কাছে গিয়ে বললে, ''আর সংসারের ঝঞ্ঝাট ভাল লাগে না, স্ত্রীকে আসতে

বারণ করেছিলাম তবুও এল। দু'মাস হতে না হতে বলছে, 'বাড়ি চল, অনেক কাজ আছে।' ওকে একলা চলে যেতে বলছি, রাজি হচ্ছে না। যতই বলি না কেন কিছুতেই শুনছে না। ভগবান, আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন তাহলে ক'দিন আপনার কাছে শান্তিতে থাকি।''

ভগবান পরিহাস ক'রে বললেন, ''সংসার ছেড়ে কোথায় যাবে, বাপু? আকাশে পালাবে? পৃথিবীতেই তো থাকতে হবে। যেখানেই থাকো সেখানেই সংসার। আমিও সংসার ছেড়ে এসেছিলাম কিন্তু দেখ, কী বড় সংসার হয়েছে। এটা তোমারটা থেকে একশ' গুণ বড়। তুমি আমায় তোমার স্ত্রীকে বাড়ি যেতে বলতে বলছ। সে যদি বলে 'স্বামী, আমি কোথায় যাব? তার চেয়ে এখানেই থাকি', বলতো, তখন আমি কী বলব? তুমি তোমার সংসার চাও না, আমি আমারটা নিয়ে কী করব? এদের ছেড়ে দিয়ে কোথায় যাব?''

ঘরের সবাই মিটিমিটি হাসতে লাগল। প্রৌঢ় লোকটি মাটিতে উবু হয়ে বসে বললে, ''তা তো ঠিক, ভগবানের আর কী? ভগবান মুক্ত পুরুষ, যত বড়ই সংসার হোক তিনি সব ভার নিতে পারেন।''

দেখ, ভগবান সব বিষয় কেমন হাল্কা পরিহাসের সুরে বলেন। তিনি যে কথাই বলুন সবের মধ্যে কিছু উপদেশ থাকে। আমার মতো ভক্তদের নিজেদের পেটের ব্যথা, পায়ের ব্যথা ভগবানকে বলা অভ্যাস হয়ে গেছে। একবার একজন এসে বললে, ''আমার চোখ খারাপ, ভাল দেখতে পাই না। ভগবান দয়া ক'রে চোখটা ভাল করে দিন।'' ভগবান তাঁর অভ্যস্ত ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লেন, লোকটি চলে যেতেই বললেন, ''ও বলছে চোখ খারাপ, আমার পায়ে ব্যথা। আমি কাকে বলব?'' আমরা অবাক হয়ে চুপ ক'রে রইলাম।

* * *

1লা ডিসেম্বর, 1945

(11) সংসারের অর্থ কী?

আমি যখন প্রথম আসি, সে সময়ে একদিন বেলা তিনটার সময়ে একজন নবাগত প্রৌঢ় আন্ধ্র ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞাসা করলে, ''ভগবান, আমি সকাল ও সন্ধ্যায় এক ঘন্টা রামনাম জপ করি, এর মধ্যে অন্যান্য চিন্তা আসতে থাকে আর জপটা ভুল হয়ে যায়। আমি কী করব?''

''সেই সময়ে নামটা (রামনাম) ধরো'', ভগবান বললেন। আমরা হেসে উঠলাম। বেচারি! লোকটি কাঁচুমাচু হয়ে বললে, ''সংসারের জন্যই জপটা নষ্ট হয়, তাই না? ভাবছি সংসার ত্যাগ করব।'' ভগবান বললেন, ''ও! তাই নাকি? সংসারের অর্থ কী? এটা বাইরে না ভিতরে?'' সে বললে, ''স্ত্রী ছেলেমেয়ে আর সব।'' ভগবান বললেন, ''কেবল এই সবই সংসার? তারা কী করেছে? আগে সংসারের অর্থটা বোঝো তারপর সেটা ছাড়ার কথা দেখা যাবে।'' সে উত্তর দিতে না পেরে হতাশ হয়ে বসে রইল।

ভগবান দয়াময়। করুণামাখা চাহনিতে তার দিকে চেয়ে বললেন, ''মনে করো, তুমি ছেলে বৌ ছেড়ে এলে। এখানে যদি আস, এও একরকম সংসার। যদি সন্ন্যাস নাও, দণ্ড-কমন্ডলু ইত্যাদি নিয়ে এক সংসার। দরকার কী? সংসারের অর্থ মনের সংসার। সেটা যদি ত্যাগ করতে পারো তবে সব জায়গা এক। কোন অশান্তি নেই।''

বেচারি লোকটি! কিন্তু সাহস সঞ্চয় ক'রে বললে, ''ঠিক তাই, স্বামী! মনের সংসার কী করে ত্যাগ করব?'' ভগবান বললেন, ''এবারে ঠিক হয়েছে তুমি বললে রামনাম জপ করো। জপের সময়ে কখনো কখনো মনে পড়ে যে তুমি জপটা ভুলে গেছ। এই মনে পড়াটা যত ঘন ঘন হয় তার চেষ্টা করো আর জপটা ধরো। ক্রমশঃ অন্য চিন্তা চলে যাবে। নাম জপের ক্রম আছে। উচ্চৈঃস্বরে জপের থেকে কেবল ঠোঁট নেড়ে নিম্নস্বরে

জপ ভাল। তার থেকে মনে মনে জপ আরও ভাল। আর সব থেকে ভাল ধ্যান।''

উত্তমস্তবাদুচ্চমন্দতঃ।
চিত্তজং জপ-ধ্যানমুত্তমম্॥

(উপদেশসার- 6)

* * *

2রা ডিসেম্বর, 1945

(12) যে পথে এসেছ সেই পথে যাও।

আর এক সময়ে একজন আন্ধ্র যুবক এসে বললে, ''মোক্ষ লাভের আকাঙ্ক্ষায় ও তার উপায় জানার জন্য বেদান্ত সংক্রান্ত অনেক বই পড়েছি। তারা এক একজন এক একভাবে বর্ণনা করে। অনেক সাধু মহাত্মার কাছে গেছি, সবাই আলাদা আলাদা পথ বলেন। আমার সব গোলমাল হয়ে গেছে, শেষে আপনার কাছে এসেছি দয়া ক'রে কোন্ পথে যাব, বলুন।''

মিষ্টি হেসে ভগবান বললেন, ''বেশ তো, যে পথে এসেছ সেই পথে যাও।'' আমাদের এতে মজা লাগল। ছেলেটি কী বলবে ভেবে পেল না। ভগবানের ঘর ছেড়ে না যাওয়া অবধি অপেক্ষা করার পর হতাশ হয়ে অন্যদের দিকে চেয়ে বললে, ''দেখুন, মোক্ষলাভের তীব্র বাসনায় আমি অনেক দূর থেকে, টাকা পয়সার কথা না ভেবে, বহু কষ্টে এসেছি আমায় যে পথে এসেছি সে পথে ফিরে যেতে বলা কি ঠিক? এটা কি একটা তামাশার কথা?''

তাতে একজন বললে, ''না, বাপু! এটা পরিহাস নয়। এটা তোমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর। ভগবানের উপদেশ হল 'আমি কে?' অনুসন্ধানই মোক্ষের সব থেকে সহজ উপায়। তুমি জানতে চেয়েছ কোন্ পথে 'আমি'

যাব আর তিনি বলেছেন, 'যে পথে এসেছ' অর্থাৎ তুমি যদি 'আমিটা' কোথা থেকে এল তার খোঁজে লেগে থাকো তাহলে তুমি মোক্ষ পাবে।''

মহাত্মারা যদি পরিহাস করেও কিছু বলেন তাতেও সত্য নিহিত থাকে। তারপর তাকে 'আমি কে?'' বইটি দেওয়া হলে সে অপূর্ব ব্যাখ্যা পড়ে আশ্চর্য হয়ে গেল। ভগবানের কথাটি উপদেশ ভেবে ভগবানকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বিদায় নিলে।

ভগবান আমাদের কথায় কথায় কৌতুকছলে বা সান্ত্বনার ভাবে তাঁর শিক্ষা দেন। আমার আশ্রমবাসের প্রথম অবস্থায় যখন বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা হত তখন যে সময়ে ঘরে বিশেষ কেউ থাকত না সেই সময়ে ভগবানকে গিয়ে বলতাম, ''বাড়ি যেতে চাই কিন্তু ভয় হয় পাছে সংসারে জড়িয়ে পড়ি।'' তিনি বলতেন, ''যখন সবই এসে আমাদের ওপর পড়ে তখন আর আমাদের কোথাও পড়ার ভয় কোথায়?''

অন্য এক সময়ে আমি ''স্বামী, আমার এখনও এইসব বন্ধন হতে মুক্তি হয়নি'', বললে, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, ''যা আসছে তাকে আসতে দাও, যা যাচ্ছে তাকে যেতে দাও। চিন্তা করো কেন?'' যদি একবারও বুঝতে পারতাম 'আমি'টা কী তাহলে এসব অশান্তি থাকত না।

* * *

3রা ডিসেম্বর, 1945

(13) অহেতুক ভক্তি

1944 সালের আগস্ট মাসে দিল্লির বিড়লা মন্দির থেকে চিন্ময়ানন্দ নামে একজন গৈরিক বসন পরা বাঙালি যুবক প্রচারক এখানে এসেছিল। সে অনেক দেশ ঘুরে পন্ডিচেরি আশ্রম হয়ে দিলীপ রায়ের পরিচয়পত্র নিয়ে এসেছিল। সে বেশ ভজনানন্দী আর তার কণ্ঠস্বরও বেশ মধুর। তার কথাবার্তায় মনে হল সে চৈতন্যদেবের ভক্তিমার্গের অনুগামী। চার পাঁচটি

সংস্কৃত ও হিন্দি ভজন গেয়ে শোনাল। কোন আধুনিক ধর্মীয় সংস্থানের অধ্যক্ষ তাকে বলেছে যে এক জায়গায় স্থির হয়ে না থাকলে জীবনের লক্ষ্য লাভ হয় না।

সুতরাং এ বিষয়ে ভগবানের অভিমত জানার জন্য সাধারণভাবে জিজ্ঞাসা করলে, ''স্বামী! সাধক যদি ঈশ্বরের নাম স্মরণে বিভোর হয়ে ঘুরে বেড়ায় তবে সে কি জীবনের অভীষ্ট লাভ করতে পারবে না? তাকে কি এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতেই হবে?'' ভগবান বললেন, ''যেখানেই ঘুরুক মনকে একাগ্র ক'রে একটা বিষয়ে লাগিয়ে রাখা ভাল। শরীরটাকে এক জায়গায় বসিয়ে রেখে মনকে ঘুরে বেড়াতে দিয়ে কী লাভ?'' যুবকটি বললে, ''অহেতুক ভক্তি কি সম্ভব?'' ভগবান বললেন, ''হাঁ, সম্ভব।'' আগেও অন্য আর একবার এ প্রশ্ন হলে ভগবান বলেছিলেন ''কেন হবে না? প্রহ্লাদ ও নারদের ভক্তি অহেতুক।''

অরুণাচলের প্রতি ভগবানের ভক্তিও এরূপ অহেতুক। প্রথম দর্শনে ভগবান বলেছিলেন, ''হে পিতা! তোমার আজ্ঞায় এখানে এলাম, এখন সব ভার তোমার।'' দেখ! ভগবান বলছেন অরুণাচলের আজ্ঞায় এসেছেন। কেন-ই বা উনি আজ্ঞা দিলেন আর কেন-ই বা ইনি এলেন? ভগবান এসে অরুণাচলের কাছে আত্ম-সমর্পণ করলেন। কেন করলেন জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেওয়ার কিছু নেই। ভগবানের তামিলে লেখা অরুণাচল নব মণিমালার সপ্তম পদটি দেখ। এটা জি. নরসিংহরাও তেলুগুতে অনুবাদ করেছে। এতে অরুণাচলে আসার উদ্দেশ্য কী লেখা আছে? কিছু না। মাঝে মাঝে ভগবান বলেন অহেতুক ভক্তি, অনন্য ভক্তি, পূর্ণ ভক্তি ইত্যাদি জ্ঞানেরই নামান্তর, আলাদা নয়।

* * *

12ই ডিসেম্বর, 1945

(14) প্রচলিত সম্মান

একদিন সকালে কথায় কথায় ভগবানের মায়ের আসা, থাকা আর তাঁর জীবনযাত্রার কথা উঠলে তিনি আমাদের বললেন–

''মা এসে মাঝে মাঝে বেশ কিছুদিন এখানে থাকতে লাগলেন। তোমারা তো জানো, আমি পশু-পাখিদেরও বেশ সম্মান দিয়ে কথা বলি। আমি মাকেও ঠিক সেইরকম 'আপনি' 'আজ্ঞে' ক'রে কথা বলতে লাগলাম। পরে মনে হল তাঁকে আঘাত দিচ্ছি, তখন প্রচলিত ঘরোয়াভাবে বলতে লাগলাম। একটা সহজ অভ্যাস বদলাতে প্রথমে অস্বস্তি হয়। যাই হোক এ সব শরীর সংক্রান্ত ব্যাপারে কী এসে যায়?'' তিনি গভীর আবেগের সঙ্গে কথাগুলো বললেন আর আমার চোখে জল ভরে এল।

যৌবনের প্রারম্ভে জাগতিক সকল কামনা বাসনা ত্যাগ ক'রে তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরম পুণ্যময় অরুণাচলে ছুটে এসেছেন আর অখণ্ড আনন্দের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে রয়েছেন। এমন ছেলে 'মা' বলে ডাকছে, সে মায়ের সৌভাগ্য কি বর্ণনা করা যায়? বেদেও মায়ের স্থান সর্বাগ্রে, 'মাতৃদেব ভব'। তা সত্ত্বেও মজা এই যে ভগবান এঁকেও সম্মান ক'রে কথা বলতে অসুবিধা বোধ করলেন। ''এভাবে বললে কি তিনি ক্ষুণ্ণ হবেন না?'' তিনি যখন তাঁকে 'মা' বলে ডাকলেন মায়ের প্রাণ ভরে গেল। বোধহয় ভগবান ভাবলেন, এত তুচ্ছ বিষয়ে তাঁকে আঘাত দেওয়া ঠিক নয়।

''মা যখন মারা গেলেন ভাবলাম সকল বন্ধন ঘুচল, এবার স্বাধীন ভাবে একলা যেখানে সেখানে গুহায় পাহাড়ে থাকব। এখন দেখছি আরও জড়িয়ে পড়েছি, নড়বার যো নেই।'' ভগবান প্রায়ই এরূপ বলেন। মা তাঁর একজন, সন্তান হাজার হাজার, বন্ধন তো দৃঢ় হবেই। কেন বলছি শোনো, এই সেদিন স্কন্দাশ্রম মেরামত হয়ে গেছে শুনে তিনি সেবক রঙ্গনাথস্বামীকে নিয়ে দুপুর বেলা কাউকে না বলে সেটা দেখতে চলে গেলেন। চুপিচুপি

ফিরে আসবেন ভেবেছিলাম। তা কি হল? আমরা সবাই গেলাম। কী উত্তেজনা- সবাই ঘিরে বসলাম, উঠতেই দিলাম না। অনেক কষ্টে প্রায় রাত্রি আটটার সময়ে সদলে ফিরলেন।

এক সপ্তাহ পরে কর্মীরা খবর দিলে যে স্কন্দাশ্রমে যাওয়ার পথটিও তৈরি হয়ে গেছে- একবার যদি তিনি দেখেন। ভগবান উত্তর দিলেন, ''দেখা যাবে।'' সকালে আমরা সবাই সেখানে যাওয়ার জন্য তাঁকে ধরলাম। তিনি মিষ্টি ক'রে ভোলালেন, ''পরে একদিন 'বনভোজন' করতে যাওয়া যাবে এখন।'' পরে সন্ধ্যাবেলায় প্রায় পাঁচটার সময়ে অভ্যাসমত পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে চুপিচুপি টুক্ করে স্কন্দাশ্রমে চলে গেলেন। যেই না একথা জানাজানি হল, সবাই টর্চ, হ্যারিকেন নিয়ে রাত্রির অন্ধকার অগ্রাহ্য ক'রে ছুটল। যারা ভগবানের ভাব বোঝে না তাদের কথা আলাদা, কিন্তু আমি ভাবলাম এটা ঠিক হবে না, দু-দু'বার প্রথম বাঁক অবধি গিয়ে ফিরে এলাম, তা সত্ত্বেও শেষ অবধি লোভ সামলাতে পারলাম না, ভিড়ের সঙ্গে মিশে গেলাম। যতই শেখানো যাক বাঁদরে যেমন স্বভাব বদলায় না ঠিক তেমনি মনের স্বাভাবিক বৃত্তিই জয়ী হল। পরে আর আক্ষেপ করে কী হবে?

বস্তুতঃ যখন এভাবে তাঁর সকল সন্তান অন্ধকারে স্কন্দাশ্রমে এসে পৌঁছে গেল তখন তাদের বসার জায়গা নেই, খাবার নেই দেখে, ভগবান কতই না মনঃকষ্ট পেলেন। তাই জন্য পরে একদিন 'বন-ভোজনের' ব্যবস্থা হয়েছিল। কী অপূর্ব নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা, তা না হলে কি এত বড় সংসার তিনি সামলাতে পারেন? অখণ্ড শান্তিময় না হলে কি তিনি এত বড় সংসারে থেকেও নির্লিপ্ত হতে পারেন? মনে রেখো, পরম গুরুর অসাধ্য কিছুই নেই।

* * *

29শে ডিসেম্বর, 1945

(15) এচম্মার দেহত্যাগ

27শে বৃহস্পতিবার রাত্রি 2-45 মিনিটে ভগবানের মায়ের মতন এচম্মা মরদেহ ত্যাগ করে ভগবানের চরণকমলে লীন হল। খবর শুনে দুঃখের থেকে স্বস্তি বোধ হল। যখন তার বাড়ি ছেড়ে আশ্রমের কাছে চলে এলাম সে প্রায়ই বলত, ''তোমায় মেয়ের মতো ভালবাসি, ভেবেছিলাম তুমি আমায় সংসার থেকে বিদায় দেবে, তা তুমি দূরে চলে এলে। এখন মরে গেলে তুমি যাবে। শরীরটাকে শ্মশানে পাঠাতে যাবে তো?'' এ কথা বলতে তার চোখে জল আসত, কিন্তু যা বলেছিল তাই হল। অসুখের খবর শুনিনি, একেবারে মৃত্যু খবর পেলাম। একটা কথা আছে না ''বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়'', এখানে সেটা সত্য হল।

মনে আছে, গত 25 তারিখে সে বাড়িতে অতিথির জন্য রান্না করছিল, তুমি আর বৌদিদি তাকে কাপড় দিলে। সেইদিন বিকেলে সে আর উঠতে পারল না, জল চেয়ে খেয়ে চুপ করে শুয়ে রইল। অতিথিরা চলে গেল। তার ভাইঝি আমাকে যা বললে তাই লিখছি। সেই জল খেয়ে আর কথাও বলতে পারলে না, খেতেও পারলে না, একেবারে শয্যাগত হল। পরের দিন ভগবানকে জানানো হল, 27শে অবস্থা আরও খারাপ হল। আত্মীয়দের টেলিগ্রাম পাঠানো হল। সে অজ্ঞান অবস্থায় ছিল তবে নাম ধরে ডাকলে একটু চোখ চাইছিল। বিকালে কতটা জ্ঞান আছে জানার জন্য মেয়েটি ''ওই যা, আজ বোধহয় ভগবানের জন্য খাবার পাঠাতে ভুল হয়ে গেছে'' বললে, যেই 'খাবার' কথাটা শুনলে অমনি সে বড় বড় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চারিদিকে চাইতে লাগল। তার মন শান্ত করার জন্য ভাইঝি বললে, ''না, না পাঠিয়েছি।'' এচম্মা স্বস্তিতে ঘাড় নাড়লে। এই হল সত্যকারের 'ব্রতদীক্ষা', যে মৃত্যুকালেও তার 'কৈঙ্কর্য' (সেবা) ভোলে না, এই মাতৃত্বের সীমা কে পাবে!

এই শেষ, প্রায় আটটার সময়ে মুখ দিয়ে কিছু অস্পষ্ট আওয়াজ বার হল, চোখ ঘোলাটে হয়ে গেল, শ্বাস আরম্ভ হল। তার ভাইপো এসে ভগবানকে খবর দিলে। আশ্রমের ডাক্তার গিয়ে তাকে দেখে আর আশা নেই জানালে, তারপর তারা তার 'জীব প্রায়শ্চিত্ত' করলে। যাই হোক ভগবানের কাছে খবর আসার পর থেকে তার আর কষ্ট হয়নি। শ্বাস সহজ ও মৃদু হল। রাত্রি 2টা 45 মিনিটে চলে গেল। আমি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় খবর পেয়ে ভাবলাম আগামীকাল সকালে দেখতে যাব। যাওয়ার আগে আশ্রমে এসে দুঃসংবাদ পেলাম। ভগবান বললেন, ''ও, সে মারা গেছে নাকি? কবে ও সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পাবে আমি তার অপেক্ষা করছিলাম। যাক সে সব চিন্তার হাত থেকে বাঁচল। বেশ, গিয়ে দেখে এস।''

আর ক'জন ভক্তের সঙ্গে গেলাম। সেই দেহের মুখটি তখনও অম্লান দেখে দুঃখে ভেঙ্গে পড়লাম। নিঃসন্দেহে অসামান্য ব্যক্তিত্ব-সম্পন্না ছিল, আর প্রথম যখন এখানে আসি সে আমার একমাত্র সহায় ছিল। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাড়ি বদল করলাম তবুও আমি অসুস্থ হলে ভগবানের সঙ্গে আমারও খাবার পাঠাত। নির্দেশমত দেহটি গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে বিভূতি লেপে দিয়ে রুদ্রাক্ষের মালা পরিয়ে শেষযাত্রা করিয়ে দিলাম। তার আত্মীয়রা সমাধি না দিয়ে দাহ করার সিদ্ধান্ত নিলে।

যখন দুপুরে আড়াইটার সময়ে ভগবানকে গিয়ে প্রণাম করলাম, ভগবান জানতে চাইলেন, ''সে কীভাবে গেল? ওরা কী করলে?'' বললাম, ''ওরা দাহ করবে। তার শেষ ইচ্ছানুযায়ী দাহ ক'রে দেশের বাড়িতে ভস্মের ওপর একটা বেদি ক'রে তুলসীমঞ্চ স্থাপন করা হবে।'' ভগবান বললেন, ''বেশ, বেশ ঠিক হয়েছে, গণপতি শাস্ত্রী ও অন্যদের বেলাও তাই হয়েছে।'' আমি বসলে যেন সান্ত্বনা দেবার ছলে বললেন, ''কতবার তাকে বলেছি খাবার পাঠানোর জন্য চিন্তা না করতে তা কি শুনবে, এক জেদ যে স্বামীকে না খাইয়ে খাবে না। এমন কি আজও তার ওখান থেকে খাবার এসেছে।'' আমি বললাম, ''আর আসবে না।'' ভগবান বললেন,

''মুদলিয়র বৃদ্ধা এখনও আছে।'' ভগবানের এ কথায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বললাম, ''এচম্মা যখনই কিছু খেতে দিত তৎক্ষণাৎ না খেলে বেজায় রাগ করত।'' আমার চোখ জলে ভরে উঠল, ভগবান ''ঠিক ঠিক'' বলে কথা ঘুরিয়ে দিলেন। একজন ভক্ত যে গত আটত্রিশ বছর ধরে রক্ষাকবচের মতো ব্রত প্রতিপালন করেছে আর ঈশ্বরের উপাসনা করেছে আজ তার পার্থিব জীবনের শেষ।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা- 27শে বেদপারায়ণ ও প্রদক্ষিণের পর যখন ভগবানকে প্রণাম করতে গেলাম, দেখলাম তিনি স্থির হয়ে পদ্মাসনে বসে আছেন গভীর ধ্যানে মগ্ন, হাত দু'টি ঝুলে পড়েছে। চোখ দু'টির কী উজ্জ্বলতা যেন দিব্য জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, মনে হল বিশ্বের আধ্যাত্মিক চেতনা যেন তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। আরও কাছ থেকে অনেকক্ষণ ধরে দেখার ইচ্ছা হল কিন্তু সে চোখের দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে প্রণাম করে চলে এলাম। সারা রাস্তা ভাবলাম, ভগবানের এই গভীর ধ্যানমগ্নতার নিশ্চয় কোন কারণ আছে।

রাত্রে খাওয়ার পর ভগবানের বিছানার কাছে একটুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে কৃষ্ণভিক্ষু তার একজন বন্ধুর সঙ্গে আমার কাছে এল। আশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করলে সে বললে আজ সন্ধ্যা থেকে ভগবান ধ্যানমগ্ন, তাঁর দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর আর সুদূরপ্রসারী, নিশ্চয় কোন অভাবনীয় ঘটনা আছে। আমরা এটা কী হতে পারে এ নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবনা-চিন্তা করলাম। পরে এচম্মার শেষ অবস্থার বিবরণ শুনে জানলাম যে প্রায় 5টা থেকে তার শ্বাস আরম্ভ হয় 9টার সময়ে ভগবানকে জানাবার পর থেকে তার কষ্ট কমে আর সে শান্ত অবস্থায় চলে যায়। তখন আমাদের মনে হল যে তাঁর বিশেষ ভক্তকে পার্থিব জীবন থেকে মুক্তি দিতেই ভগবানের সন্ধ্যাকালীন সেই সমুজ্জ্বল মূর্তি।

* * *

30শে ডিসেম্বর, 1945

(16) প্রথম ভিক্ষা

একদিন দুপুরে সাধারণ কথাবার্তায় ভগবান পূর্বস্মৃতিচারণা করতে করতে আমাদের বলতে লাগলেন–

''গোপুর সুব্রহ্মণেশ্বর মন্দিরে একজন মৌনী সাধু ছিল। একদিন সকালে যখন সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম তখন সে একজন সঙ্গীর সঙ্গে আমার কাছে এল। সে মৌনী আমিও তাই, কোন কথা বা অভিবাদন হল না। তখন প্রায় মধ্যাহ্ন, সে ইঙ্গিতে সঙ্গীকে বললে, 'এ ছেলেটি কে জানিনা, মনে হচ্ছে খুব ক্লান্ত, কিছু খাবার এনে একে দাও।' তারা কিছু খাবার নিয়ে এল। সামান্য একটু আচার ওপরে দিয়ে ঘোল মেশানো গোটা গোটা ভাত। অরুণাচলেশ্বরের কাছ থেকে এই আমার প্রথম ভিক্ষা। আজকাল যা খাই তাতে কিছুই আনন্দ পাই না। সেদিনের সেই ভিক্ষার কাছে পঞ্চভক্ষ্য পরমান্ন কিছুই লাগে না।'' একজন জিজ্ঞাসা করলে, ''এটা কি প্রথম সেদিন ভগবান এখানে এসে পৌঁছেছিলেন সেই দিন?'' ভগবান বললেন, ''না, না, পরের দিন, ঈশ্বরের দেওয়া প্রথম ভিক্ষা মনে ক'রে আমি প্রতিটি দানা ভাত একটি একটি ক'রে খেলাম, ঘোলটুকুও নিঃশেষে পান করলাম। কী যে তৃপ্তি হল সে আমি কোন দিন ভুলতে পারব না।''

আর একজন ভক্ত বললেন, ''শ্রীভগবান যেদিন প্রথম শহরে ভিক্ষায় যান তারও কিছু গল্প আছে না?''

ভগবান বললেন, ''হ্যাঁ, একজন মহিলা ভক্ত ছিল। সে মাঝে মাঝে কিছু খাবার আনত। একদিন সে সব সাধুদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলে আর আমাকেও তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলে। আমি ইঙ্গিতে অনিচ্ছা জানিয়ে ভিক্ষায় যাব বললাম। হয় আমাকে তাদের সঙ্গে পঙ্‌ক্তি ভোজন করতে হয়, নয়তো ভিক্ষায় যেতে হয়। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা

ভেবে ভিক্ষায় বার হলাম। মহিলার সন্দেহ ছিল– আমি সত্যই ভিক্ষায় যাব কি না। সে আমায় অনুসরণ করার জন্য একজন লোক ঠিক করেছিল। উপায়ান্তর না দেখে মন্দিরের বাঁ দিকে এক বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে হাততালি দিলাম। বাড়ির গৃহকর্ত্রী আমার কথা জানত, দেখে চিনতে পেরে 'আহা বাছা, এসো, এসো' বলে ভিতরে ডেকে প্রচুর খাইয়ে বললে, 'আমি একটি ছেলে হারিয়েছি। তোমাকে দেখে ঠিক তার মতন মনে হয়। রোজ এমনি এসো, কেমন?' পরে তার নাম জেনেছিলাম মুথম্মা।''

* * *

31শে ডিসেম্বর, 1945

(17) কী ক'রে জানলে যে তুমি কিছু জানো না?

গত মাসের প্রথম সপ্তাহে একদিন সকালে একজন নিরক্ষর যাত্রী এখানে এল। সে দু'তিন দিন এখানে থেকে প্রবাদ অনুসারে 'সত্র ভোজনং মঠ নিদ্রা' করতে অন্য কোথাও থাকতে খেতে চলে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায়ই ভগবানের দর্শন ও সান্নিধ্যের শান্তি উপভোগ করতে আসত। অবশেষে বাড়ি যাওয়ার আগে একদিন ভগবানের কাছে এগিয়ে গিয়ে খুব কাকুতি মিনতি ক'রে বললে, ''স্বামী, এখানে এরা সব আপনাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করে, আপনিও উত্তর দেন। এসব দেখে আমারও কিছু প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু কী যে জিজ্ঞাসা করব জানি না। তবে আমার মুক্তি কী করে হবে?''

ভগবান তার দিকে চেয়ে মিষ্টি ক'রে হাসতে হাসতে বললেন, ''কী করে জানলে যে কিছু জানো না?'' সে বললে, ''এখানে এসে এদের কথাবার্তা শুনে আর আপনার উত্তর দেওয়া দেখে, এই কথাই মনে হচ্ছে।''

ভগবান বললেন, ''তবে ঠিক আছে। তুমি তাহলে খুঁজে পেয়েছ যে তুমি কিছু জানো না। এটাতেই হবে। আর কী দরকার?'' প্রশ্নকর্তা বললে, ''কেবল এতে কী করে মুক্তি হবে, স্বামী?'' ভগবান বললেন,

''কেন হবে না? একজন তো আছে যে জানে যে, সে কিছুই জানে না। তুমি যদি সেটা কে খোঁজো আর পেয়ে যাও তাহলেই যথেষ্ট হবে। অনেক কিছু জানলে অহংকার বাড়ে। সেটা না ক'রে আমি কিছু জানি না ভেবে, মোক্ষের অনুসন্ধান করা কি ভাল নয়?''

লোকটি বেশ খুশি হয়ে চলে গেল। প্রশ্নকারী ভগবানের বাণীর তাৎপর্য বুঝল কি না জানি না কিন্তু আমরা যারা এখানে আছি তাদের হৃদয়ে এটা মন্ত্রাক্ষর হয়ে অনুরণিত হচ্ছে।

* * *

1লা জানুয়ারি, 1946

(18) চিতাবাঘ ও সাপ

সেদিন ভগবানের পাহাড়ে থাকাকালীন আরও একটা ঘটনার কথা শুনলাম, তোমায় লিখছি। তিনি যখন বিরূপাক্ষ গুহায় ছিলেন তখন নিকটের জলাধারের কাছে একদিন বাঘের ডাক শোনা গেল। ভীত ভক্তেরা বাজাবার জন্য কাঁসি থালা যোগাড় করতে করতে বাঘ পেট ভরে জল খেয়ে আরও একবার ডাক ছেড়ে চলে গেল। ভগবান ভয়-কাতর ভক্তদের মৃদু তিরস্কার করে বললেন, ''এত ভয় পাচ্ছ কেন? বাঘ প্রথম ডাকে আমায় জানালে যে সে এসেছে। আর জল খেয়ে শেষে ডেকে বলে গেল যে সে চলে যাচ্ছে। সে তার নিজের কাজে যাচ্ছে। তোমাদের কোন অসুবিধা করেনি। এত ভয় কিসের? এই পাহাড়টি বন্য জন্তুদের বাসস্থান আর আমরা তাদের অতিথি। তাই যদি হয়, তবে তোমাদের কি তাদের তাড়িয়ে দেওয়া উচিত হবে?'' বোধহয় তাদের ভয় ভাঙ্গাবার জন্য আরও যোগ করলেন, ''এ পাহাড়ে অনেক সিদ্ধ পুরুষ থাকেন তাঁরা অন্যরূপ ধরে বোধহয় আমায় দেখতে আসেন, তোমাদের তাঁদের বিরক্ত করা উচিত নয়।''

এরপর থেকে বাঘটি প্রায়ই সেখানে জল খেতে আসত। যখনই ডাক শোনা যেত ভগবান বলতেন ''ওই দেখ! বাঘটি ওর আগমন জানাচ্ছে।'' আবার বলতেন, ''এবার প্রস্থান জানাচ্ছে।'' এইভাবে তিনি বন্য জন্তুদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতেন।

একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করলে এটা কি সত্য যে পাহাড়ে ভগবানের সাপেদের সঙ্গেও বন্ধুত্ব ছিল, একটা সাপ গায়ে উঠেছিল, অন্য একটা পা বেয়ে উঠেছিল।

ভগবান বললেন, ''হাঁ সত্য, একটা সাপ পোষা সাপের মত পায়ে ওঠার চেষ্টা করত। তার স্পর্শে আমার শরীরে সুড়সুড়ি লাগাতে পা সরিয়ে নিয়েছিলাম ব্যস্। সেটা আপনা ইচ্ছায় আসত যেত।''

* * *

2রা জানুয়ারি, 1946

(19) তুমি কি আমার না বলা কথা শুনবে না?

তুমি জগদীশ্বর শাস্ত্রীকে দেখেছিলে না? তিনি যখন এখানে ছিলেন তখন একটা কুকুর তাঁর সঙ্গে হলঘরে আসত। সে বেশ বুদ্ধিমান ছিল। শাস্ত্রী মহাশয় ও তাঁর স্ত্রী ভগবানের ঘরে এলে সেও বেশ শান্তশিষ্ট ছেলের মত তাঁদের সঙ্গে এসে বসত। ঘরের ভিতর আসাটা তার খুবই পছন্দসই ছিল। লোকেরা তাকে ঘরে ঢুকতে না দেওয়ার যত চেষ্টাই করুক, কোন ফল হত না।

একবার এই বৃদ্ধ দম্পতি কুকুরটিকে অন্য কারও জিম্মায় রেখে পনেরো দিনের জন্য মাদ্রাজে গেলেন। প্রথম চার পাঁচদিন কুকুরটি হলঘর ও তার চারপাশ আরও অন্যান্য জায়গায় খুঁজলে, পরে ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে একদিন সকাল দশটার সময়ে ভগবানের সোফার কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে

অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। সেদিন আমি সামনে বসেছিলাম। ভগবান খবরের কাগজ পড়ছিলেন। কৃষ্ণমূর্তি ও অন্যেরা কুকুরটিকে তাড়াবার জন্য অনেক চেষ্টা করলে। আমিও তাকে যেতে বললাম। কিছু হল না, সে নড়ল না। এসব গোলমালে ভগবানের দৃষ্টি তার দিকে পড়ল। ভগবান কুকুরের চাহনি ও আমাদের উত্তেজনা কিছুক্ষণ দেখলেন, তারপর কাগজ রেখে যেন তার নির্বাক জিজ্ঞাসা বুঝতে পেরে তাকে হাত নেড়ে ডেকে বললেন, ''কী হয়েছে? তুমি জানতে চাও ওঁরা কোথায় গেলেন? ও, এবার বুঝেছি। ওঁরা মাদ্রাজে গেছেন। এক সপ্তাহ বাদে ফিরবেন। ভয় কী? চিন্তা কোরো না। শান্ত হও। ঠিক আছে তো? এবার যাও।''

ভগবানের কথা শেষ হতে না হতে কুকুরটিও পিছন ফিরে বেরিয়ে গেল। তারপরই ভগবান আমায় বললেন, ''দেখলে তো? কুকুরটি আমায় জিজ্ঞাসা করছিল যে ওরা কোথায় গেল, কবে ফিরবে? লোকেরা যতই চেষ্টা করুক আমার উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত ও গেল না।''

আর একবার গৃহকর্ত্রী কুকুরটিকে তার কোন অন্যায়ের জন্য লাঠি দিয়ে মেরে আধবেলা ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল। ছাড়া পেয়ে যেন ভগবানের কাছে নালিশ করতে এল আর চার পাঁচদিন আশ্রমেই রয়ে গেল। ভগবান তার খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন ও মহিলাকে তিরস্কার ক'রে বললেন, ''ওকে কী করেছ? ও তোমার ওপর রাগ করেছে কেন? ও এসে আমার কাছে নালিশ করলে। কেন? কী করেছ?'' মহিলা শেষে দোষ স্বীকার করলে ও অনেক সাধ্য সাধনার পর কুকুরটিকে বাড়ি নিয়ে গেল।

* * *

3রা জানুয়ারি, 1946

(20) কাঠবিড়াল

ভগবানের কাছে কাঠবিড়াল ভাইদের কত স্বাধীনতা, তা কি তুমি জানো? দু'তিন বছর আগে ওদের মধ্যে একটি ভারী চঞ্চল ও দুষ্টু

কাঠবিড়াল ছিল। একদিন সে খেতে এলে ভগবান বই পড়ছিলেন কিংবা ব্যস্ত ছিলেন, খাবার দিতে দেরি হল। সেই দুষ্টুটা ভগবান নিজে হাতে না খাইয়ে দিলে খেত না। দেরি দেখে রেখে গিয়ে ভগবানের হাতে হঠাৎ কামড়ে দিলে তবু ভগবান তাকে খেতে দিলেন না। ভগবান মজা ক'রে বললেন, ''তুমি খুব দুষ্টু, আঙুলে কামড়ে দিয়েছ, আর খেতে দেব না, চলে যাও।'' এই বলে ক'দিন আর খেতে দিলেন না।

সে কি চুপ ক'রে থাকার ছেলে? না তো, সে ভগবানের এদিক ওদিক ঘুর্ ঘুর্ ক'রে ক্ষমা চেয়ে বেড়াতে লাগল। ভগবান জানালায় ও সোফায় বাদাম রেখে ওকে নিজে নিয়ে খেতে বললেন। সে ঐ বাদাম ছুঁলেও না। ভগবান যেন দেখেন নি এইভাবে উদাসীন হয়ে রইলেন। সে তখন ভগবানের পায়ে, গায়ে, কাঁধে উঠে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কত কী করতে লাগল। ভগবান তখন আমাদের বললেন, ''এ ছোকরা কামড়ানোর জন্য ক্ষমা চাইছে আর হাতে ক'রে খাইয়ে দিতে বলছে।''

''দুষ্টু ছেলে! কেন কামড়ালে? আমি আর খাওয়াব না। এটা তোমার শাস্তি। দেখ, বাদাম রয়েছে নিজে নিজে খাও।'' বলে ওকে আরও ক'দিন সরিয়ে দিলেন। কাঠবিড়ালও তার জেদ ছাড়লে না। আরও ক'দিন গেল, তাঁর ভক্তের প্রতি অনুকম্পা তাঁকে হারিয়ে দিলে। তখন আমার মনে হল, এরকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে তবেই মুক্তি লাভ হয়।

কাঠবিড়ালের এই শেষ নয়। আরও সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ঠিক সোফার ওপর কড়িকাঠে বাসা তৈরি করা শুরু করলে। সেখানে খড়কুটো ঢোকাতে লাগল, হাওয়ায় সেগুলো নীচে পড়ত। লোকেরা বিরক্ত হয়ে সব কাঠবিড়াল তাড়াতে লাগল। ভগবানের কিন্তু বেচারিদের কড়িকাঠে স্থানাভাব আর লোকেদের ওদের তাড়ানো খুব খারাপ লাগল। তাঁর জীবজন্তুদের প্রতি দয়া ও স্নেহের গভীরতা সে সময়ে তাঁর মুখ না দেখলে বোঝা যাবে না।

যখন ভগবানকে বললাম যে কাঠবিড়ালের কথা তোমাকে লিখেছি তখন তিনি স্পষ্টই খুশি হয়ে বললেন, ''এদের কাহিনী অনেক বড়।

কিছুদিন আগে ঠিক ওপরে কড়িকাঠে ওদের বাসা ছিল। ছেলেপিলে, নাতিনাতনি নিয়ে বিরাট পরিবার। ওরা সোফার ওপর যখন তখন খেলা ক'রে বেড়াত। আমি বেড়াতে গেলে ক্ষুদে কাঠবিড়ালেরা বালিশের তলায় লুকাত, কখনো কখনো চেপ্টে মারাও যেত। সে দৃশ্য বড়ই অসহনীয় হত তাই মাধব সবাইকে তাড়িয়ে ছাতের ওখানটায় কাঠ মেরে দিয়েছে। লিখতে চাইলে এমন কতই গল্প আছে।''

* * *

4ঠা জানুয়ারি, 1946

(21) ধর্ম ও ধর্মসূদ পৃথক

কখন কখন লোকেরা তিরুচেনদুর, মাদুরাই ও রামেশ্বর থেকে বিভূতি ও কুমকুম প্রসাদ এনে ভগবানকে দেয়। ভগবানও শ্রদ্ধার সঙ্গে সেগুলো গ্রহণ ক'রে বলেন, ''তিরুচেনদুর থেকে প্রভু সুব্রহ্মণ্যম এসেছেন, দেখ মাদুরাই থেকে মা মীনাক্ষী এসেছেন, এই রামেশ্বরের রামলিঙ্গম, এই এ দেবতা, এই ওই ঠাকুর এলেন। অনেকে তীর্থবারি এনে বলে, এটা গঙ্গা, এই গোমতী, এই কাবেরী, ওটা কৃষ্ণার বারি। এরকম তীর্থবারি এলে ভগবান বলেন, ''এই মা গঙ্গা এলেন, এইতো গোমতী, এই দেখ কাবেরী এলেন আর এই যে কৃষ্ণাবেণী।''

প্রথম প্রথম আমার অবাক লাগত। সকল তীর্থের সার-স্বরূপ স্ব-স্বরূপে স্থিত স্বয়ং জ্যোতির্ময় রমণ নিজেই মূর্তিমান পরমাত্মা, তাঁর কাছে তীর্থবারি আর প্রসাদ নিয়ে এসে যেন একটা বিরাট কিছু করলে! লোকেরা পাগল নাকি? আমি ভাবতাম।

কিছুদিন আগে একজন সাগরতীর্থের বারি নিয়ে এল, ভগবান বললেন, ''এতদিন সব নদীরা এসেছেন, সাগর আসেন নি। এই প্রথম সাগর এলেন। বেশ ভাল হয়েছে। দাও, এখানে দাও।''

এই শুনে সমস্ত পুরাণে যে তীর্থ, সাগর ও দেবতাদের রমণের মতন ঋষিদের চরণকমলে শ্রদ্ধা জানাতে আসার কথা লেখা আছে আমার তা মনে পড়ে গেল। আগে ভাবতাম এসব অতিরঞ্জন কারণ পাথর ও জল সত্যই তো আর হেঁটে হেঁটে মহাত্মাদের কাছে আসতে পারে না। কিন্তু এখন দেখছি কারুর বিনা ইচ্ছায় এই জল, বিভূতি বা অন্যান্য জিনিস ভক্তদের দ্বারা আনীত হয় আর ভগবান ''তাঁরা এসেছেন'' বলে গ্রহণ করেন। এখন মহাত্মাদের কাছে হওয়া ঘটনা দেখে বুঝতে পারছি যে শাস্ত্রের নিগূঢ় ব্যাখ্যা আরও মনোযোগ দিয়ে দেখা উচিত। তবেই ধর্ম ও ধর্মসূদ যে পৃথক বোঝা যায়।

যেহেতু ভগবান এইসব তীর্থবারি ও প্রসাদ সানন্দে গ্রহণ করেন সুতরাং তিনি এদের সেবা গ্রহণ করেছেন এরূপ ব্যাখ্যা করা উচিত। সাগর তীর্থ আসাতে এই অন্তর্নিহিত রহস্যটি আমার কাছে খুলে গেল। তোমার মনে আছে, পাহাড়ের গুহায় থাকাকালীন চিতাবাঘের আসা সম্বন্ধে ভগবান বলেছিলেন, ''অনেক সিদ্ধ ছদ্মবেশে আমায় দেখতে আসেন।''

* * *

৪ই জানুয়রি, 1946

(22) মোক্ষ

কয়েকদিন আগে একজন নবাগতা মহিলা বেলা তিনটার সময়ে হলঘরে এসে বসল। সে সব সময় উঠে গিয়ে ভগবানকে কিছু বলার চেষ্টা করছিল। ভগবান তত লক্ষ্য করেন নি, তিনি একটা বই পড়ছিলেন, সেও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে। ভগবান বইটি রাখতেই সে উঠে সোফার কাছে গিয়ে কিছুমাত্র ইতস্তত না ক'রে নির্ভীক ভাবে বললে, ''স্বামী, আমার একটি মাত্র কামনা আপনাকে বলব কি?'' ভগবান সম্মতি দিয়ে ''তোমার কী চাই?'' বললেন। সে বললে, ''আমি মোক্ষ চাই।'' ভগবান মন্তব্য

করলেন, ''ও, তাই নাকি?'' সে বললে, ''হাঁ, স্বামীজী! আর কিছু চাই না, এটি যদি দেন তাহলেই হবে।'' মুখের হাসি প্রায় চাপতে না পেরে ভগবান বললেন, ''হাঁ, হাঁ, তা বেশ, সে বেশ ভাল কথা।'' মহিলাটি বললে, ''পরে দেব বললে হবে না, এটা আমাকে এখুনি এখানেই দিতে হবে।'' ভগবান বললেন, ''বেশ তো।'' সে বললে, ''এখন দেবেন? আমায় যেতে হবে।'' ভগবান ঘাড় নাড়লেন।

সেই মহিলাটি ঘর থেকে চলে যেতেই ভগবান হাসিতে ফেটে পড়ে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, ''ও বলে কেবল মোক্ষ দিলেই হবে, আর কিছু চাই না।'' শুভলদাম্মা আমার পাশেই বসেছিল, সে এই কথার সূত্র ধরে বললে, ''আমরাও সেইজন্যই এখানে বাস করছি। আমরাও আর কিছু চাই না। কেবল মোক্ষ পেলেই আমাদের হবে।'' ভগবান বললেন, ''যদি সব ত্যাগ করো তবে যা থাকে তাই মোক্ষ। অন্যের কী দেওয়ার আছে? মোক্ষ সব সময়ে রয়েছে। সে-ই একমাত্র আছে।'' ''আমরা অত সব জানি না, ভগবানকে আমাদের মোক্ষ দিতেই হবে'' বলে সে ঘর থেকে চলে গেল। ভগবান তাঁর সেবকদের দিকে চেয়ে মন্তব্য করলেন, ''ওরা বলছে আমার ওদের মোক্ষ দেওয়া উচিত। আর কেবল মোক্ষ দিলেই হবে, আচ্ছা এটাও কি একটা কামনা নয়? সমস্ত কামনা ত্যাগ করলে যা থাকে তাই মোক্ষ। কামনা ত্যাগের জন্য সাধনা চাই।''

'মহারত্নমালাতেও ঠিক এই ভাগের একটা শ্লোক আছে–
বাসনাতানবং ব্রহ্ম মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে।
'সম্পূর্ণ বাসনা ক্ষয়ই ব্রহ্ম বা মোক্ষ।'

* * *

16ই জানুয়ারি, 1946

(23) গো-অর্চনা (গোষ্ঠপূজা)

জানো তো, গতকাল 'মট্টু পোঙ্গল' (গোষ্ঠাষ্টমী) ছিল। এদিন সারা দেশে গরুদের সাজানো হয় ও পোঙ্গল (পক্কান্ন) খাওয়ানো হয়। আশ্রমেও অনেক রকম মিষ্টি তৈরি ক'রে মালা গাঁথা হল। গোশালার সামনে রঙিন গুঁড়ো দিয়ে 'যন্ত্র' আঁকা হল, কলা গাছ বসানো হল, আমপাতার মালা টাঙানো হল, সব গরুদের স্নান করিয়ে কপালে সিন্দুরের তিলক পরানো হল, গলায় ফুল ও মিষ্টির মালা পরিয়ে, পোঙ্গল খাইয়ে, নন্দীর পূজা হল। মন্ত্রপাঠ ও নারিকেল ভেঙ্গে পূজা শেষ হল।

বিষ্ণু গরুদের রানি, তাই না? তার শোভা দেখার মতো হয়েছিল। কপালে হলুদ মাখিয়ে তার ওপর সিন্দুরের তিলক পরানো, শিঙে ও গলায় গোলাপ ও অন্যান্য ফুলের মালা তার সঙ্গে মিষ্টি খাবারের মালা, তা ছাড়া পাকাকলা, আখ ও নারিকেলের টুকরো দিয়ে গাঁথা মালাও ছিল। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে গোশালার আধিকারিক বাড়ি থেকে মুরুক্কুর (গজা) মতো মিষ্টি খাবারের একটা মালাও লক্ষ্মীর গলায় দিয়েছিল। শ্রীনিরঞ্জনানন্দস্বামী ওটা কী জিজ্ঞাসা করলে, সে খুব গর্বের সঙ্গে ওটা আমার 'মামুল' (বাৎসরিক ব্রত) বলে উত্তর দিলে। কামধেনুর মতো সজ্জিত লক্ষ্মীর শোভা দেখে আমার গর্ব ও আনন্দের আর সীমা রইল না।

ভগবান 9টা 45 মিনিটে বেরিয়ে 10টা নাগাদ গোশালায় তাঁর সন্তানদের আশীর্বাদ করতে এলেন। তিনি লক্ষ্মীর পাশে একটা চেয়ারে বসে লক্ষ্মীর সাজসজ্জা দেখে আনন্দ করতে লাগলেন আর ভক্তেরা 'ন কর্মণা' ইত্যাদি বেদ মন্ত্র পাঠ ক'রে কর্পূর আরতি করলে। কেউ বললে ফোটো তোলা হবে, তখন ভক্তদের সরিয়ে লক্ষ্মীকে গোশালার মধ্যে ছোট উঠানে নিয়ে যাওয়া হল। লক্ষ্মী সেখানে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু মাথা নাড়তে লাগল। ভগবান উঠে এসে লক্ষ্মীর পাশে দাঁড়িয়ে গায়ে মাথায় হাত বোলাতে

লাগলেন। তিনি ''স্থির হও, লক্ষ্মীটি স্থির হও'', বললে সেও ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করে একেবারে সমাধিস্থ হয়ে গেল। ভগবান বাঁ হাত তার গায়ে রেখে আর ডান হাতে লাঠি ধরে অপরূপ ভঙ্গিতে লক্ষ্মীর পাশে দাঁড়ালেন। ফোটোগ্রাফার দু'তিনটি ছবি নিলে। সেও এক দেখবার মতো দৃশ্য। ভগবান নিজের হাতে তাকে ফল মিষ্টান্ন খাওয়ালেন, তার ছবিও নেওয়া হল। তুমি এখানে এলে সে সব ছবি দেখতে পাবে। গোশালায় লক্ষ্মীর পাশে ভগবানের দাঁড়ানোর সময়ে আমার বার বার শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা মনে পড়ছিল। শুধু তাই নয়, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বলা হয়েছে গোকুলবিহারী কৃষ্ণ পরমাত্মা আর রাধা প্রকৃতি। এ পুরাণের মতে রাধা ও মাধব প্রকৃতি ও পুরুষ– অবিচ্ছেদ্য যুগলমূর্তি। একটু বাঁদিকে হেলে লক্ষ্মীর গায়ে বাঁহাত রেখে ডান হাতে বাঁশির মতো লাঠি ধরে আনন্দসাগরের তরঙ্গের মতো অনবদ্য হাস্যে ও করুণাকৃপা কটাক্ষে ভক্ত ও গোবৃন্দ উদ্ভাসিত ক'রে রমণ–মাধুর্য্য মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, এ দৃশ্য দেখে ত্রিভঙ্গমুরারি বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে পড়া আশ্চর্য নয়। রমণ যদি শ্রীকৃষ্ণ তবে যে জগৎ–সংসার ভুলে মাথা নীচু ক'রে কান ঝুলিয়ে যেন ভগবানের স্পর্শে তুরীয়ানন্দে বিভোর হয়ে রয়েছে সেই আমাদের লক্ষ্মীকে কী বলব? সে কি তবে প্রকৃতির মূর্তমূর্তি শ্রীমতী রাধা? না হলে ভাষা বোঝে কী করে?

সেদিন গোশালায় যে দৃশ্যের অবতারণা হল আর আমরা স্থূল চোখে যা দেখলাম সে যেন কোন এক অপার্থিব দর্শন বললে অতিরঞ্জিত করা হয় না গোকুল ও গোকুলাধীশ, প্রকৃতি ও পুরুষ। তুমি হয়তো আমার অলীক কল্পনা শুনে হাসবে কিন্তু বিশ্বাস করো সত্যই সে এক অপূর্ব দৃশ্য হয়েছিল। প্রতি বছর এই উৎসব হয় কিন্তু এবার লক্ষ্মীর ফোটো নেওয়া হবে বলে ভগবান তার পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের এই আনন্দময় দর্শন দিলেন। কী যে শুভদিন কী বলব! আনন্দের আতিশয্যে না থাকতে পেরে তোমায় লিখলাম।

* * *

17ই জানুয়ারি, 1946

(24) কপোত যুগল

1945 সালে সেপ্টেম্বর কি অক্টোবর মাসে বাঙ্গালোরের এক ভক্ত বেঙ্কটস্বামী নাইডু আশ্রমকে এক জোড়া পায়রা উপহার দিলে। তা দেখে ভগবান বললেন, ''এদের বিড়ালের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে, তাই না? কে করবে? একটা খাঁচা চাই, খাবার দিতে হবে। কে এই সব করবে? ওদের নিয়ে চলে যাওয়াই ভাল।''

ভক্তটি বললে সে সব ব্যবস্থা করবে আর অনুরোধ করলে যে এ দু'টি যেন আশ্রমে স্থান পায়। সে পায়রা দু'টি ভগবানের কোলে দিলে। স্নেহে গদগদ হয়ে ভগবান তাদের আরও কাছে নিয়ে বললেন, ''এসো বাছারা! এসো! যাবে না? এখানে থাকবে? তবে থাকো, একটা খাঁচা পাওয়া যাবে'খন।'' এই বলে তাদের গায়ে হাত বুলাতে লাগলেন, তারাও একেবারে স্থির হয়ে চোখ বুজে যেন সমাধিস্থ হয়ে গেল। সেই দেখে ভগবান হাত বুলান বন্ধ করে করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে মৌন ধ্যানে মগ্ন হলেন।

একটা খাঁচা খুঁজে পেয়ে আনতে প্রায় ঘন্টা খানেক সময় লাগল। আশ্চর্যের বিষয় যে পায়রা দু'টি যেন দু'টি সমাধিমগ্ন যোগীর মতো পুরো একঘন্টা বিন্দুমাত্র নড়াচড়া না ক'রে ভগবানের কোলে বসে রইল। তাদের সৌভাগ্য সম্বন্ধে কী আর বলার আছে? নিশ্চয়ই তাদের পূর্বজন্মে কোন পুণ্য ছিল, না হলে এমন ঋষির কোলে স্থান পেল, মাথা থেকে পা অবধি হাত বুলানো কৃপার প্রসাদে পরমানন্দের আস্বাদ পেল। শুধু তাই নয়, খাঁচা আনা হলে ভগবান আদর ক'রে তাদের খাঁচায় ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, ''লক্ষ্মীটি ঢুকে পড়ো, খাঁচায় নিরাপদে থাকবে।'' পরে বললেন, ''ভাগবতে যদু সংবাদে 'কপোত গুরু'র কথা আছে, অনেকদিন আগে পড়েছি বলে মনে হচ্ছে।''

যখন পায়রারা কোলে ছিল তখন একজন ভক্ত এসে বললে, ''একী?'' ভগবান অনাসক্ত কিন্তু দায়িত্বের সঙ্গে বললেন, ''কে জানে? এরা এসে ফিরে যেতে চায় না। ওরা বলছে এখানেই থাকবে। আরও একটা পরিবার জুটল যেন এমনিতে আমার কিছু কম আছে।''

দাদা, এই সব অদ্ভুত ঘটনা বেশ কৌতুকপ্রদ। বলা হয়, পুরাকালে ভরতরাজা সন্ন্যাস নিয়ে কঠোর তপস্যা করেছিলেন কিন্তু মৃত্যুকালে পোষা হরিণের চিন্তা করার জন্য তাঁকে হরিণ জন্ম নিতে হয়। বেদান্ত, মহাভারত ও ভাগবতে এরকম কাহিনী অনেক আছে। ভগবান আগে আমাদের বলছেন, ''যারা আমার কাছে আসে তারা প্রারব্ধ ক্ষয় করতে আসে, কাউকে আসতে বাধা দিও না।'' ঐ দু'টি পায়রাকে দেখে মনে হয়েছিল, তারা নিশ্চয় যোগভ্রষ্ট, না হলে সাধারণের অপ্রাপ্য ভগবানের কোলে কী করে তাদের অধিষ্ঠান হল? শ্রীমদ্‌ভাগবতের পঞ্চম সর্গে একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে যারা ভারতবর্ষে জন্মায় তারা পুণ্যবান। কারণ শ্রীহরি এখানে অবতার রূপে আবির্ভূত হয়ে শিক্ষা দিয়ে আশীর্বাদ, সহায়তা ও পথ প্রদর্শন করেন। উক্ত ঘটনা কি এই কথার সমর্থক নয়? তুমি কী বলো?

* * *

18ই জানুয়ারি, 1946

(25) শিশু চিতাবাঘ

এক বছর আগে একজন তার পালিত দু'টি চিতাবাঘের বাচ্চা ভগবানের কাছে নিয়ে এল। সবাই তাদের আদর করলে, দুধ খেতে দেওয়া হল। তারা লোকেদের মধ্যে ঘুরে বেড়ালো। আর অবশেষে ভগবানের ডাকে সোফায় উঠে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়ল। একজন আশ্রমিক এই অদৃষ্টপূর্ব দলটির ছবি নিলে। দুপুর একটা থেকে প্রায় তিনটা অবধি ভগবান একপাশে সরে বাচ্চা দু'টিকে সোফায় আরামে ঘুমাতে দিলেন। তারপর তারা উঠে 4টা

অবধি স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করতে লাগল। ভগবানের অভ্যস্ত সান্ধ্য ভ্রমণের আগে আবার চিতাদের সোফায় ও টেবিলে বসিয়ে ছবি নেওয়া হল। পরে সেগুলো 'সান্‌ডে টাইমস্'-এ ছাপা হয়েছিল।

আশ্চর্যের ব্যাপার যে চিতায় বাচ্চারাও ভগবানের স্পর্শে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে সোফায় শুয়ে রইল। যখন তারা শুয়ে ছিল, কাঠবিড়ালেরা এসে বাদাম ও চড়ুইরা এসে ভাঙ্গা চাল অভ্যাসমত খেয়ে চলে গেল। পুরাকালে যখন কোথাও জীবজন্তুরা শত্রুতা ভুলে এক জায়গায় বাস করত লোকে তাকে ঋষির আশ্রম বলত। এরকম ধরণের গল্প পুরাণে আছে। কিন্তু আমরা এখানে এসব প্রত্যক্ষ দেখছি। যখন ভগবানের কাছে গতকালের পায়রার ঘটনা ও গোশালার কথা প'ড়ে শোনালাম তখন তিনি বললেন, ''এরকম অনেক ঘটনা আগেও ঘটেছে কিন্তু তখন লেখবার কে ছিল?''

যখন এই বইটির প্রথম সংস্করণ (তেলুগু) ভগবানের কাছে পড়া হচ্ছিল, এই গল্পটি এলে একজন ভক্ত ভগবানকে উদ্দেশ্য করে বললে, ''আচ্ছা, আপনি যখন পাচিয়াম্মান কোয়েলে (দুর্গামন্দিরে) ছিলেন তখন নাকি কেউ একজন বাঘ দেখে ভয় পেয়ে ছুটে এসেছিল, এ কি সত্য?'' ভগবান বললেন, ''হাঁ, হাঁ আমি যখন সেখানে ছিলাম রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার মাঝে মাঝে আসত। একদিন শৌচের জন্য বাইরে গেলে সে ঝোপের মধ্যে একটা বাঘ দেখে চেঁচামেচি করে তাড়াবার চেষ্টা করলে, বাঘ একটা ডাক দিলে। ডাক শুনে সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নিজের অজ্ঞাতসারে ঊর্ধ্বশ্বাসে 'হে ভগবান! রমণা! রমণা!' বলে চিৎকার ক'রে আমার কাছে ছুটে এল। আমিও কী কাজে বাইরে আসছিলাম সুতরাং দেখা হল। তার ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে কাতরভাবে বললে, 'আইও বাঘ, বাঘ! স্বামী ভিতরে আসুন, মন্দিরে চলুন, দরজা বন্ধ করতে হবে নাহলে ও এখানে এসে পড়বে। আরে, আসছেন না কেন?' আমি হেসে বললাম, 'দাঁড়াও দেখি। বাঘ কোথায়? দেখছি না তো।' ঝোপের দিকে দেখিয়ে বললে, 'ওই ঝোপে।' আমি বললাম 'তুমি অপেক্ষা করো, আমি দেখে আসছি।' আমি গিয়ে বাঘ দেখতে পেলাম না, তবু তার ভয় যায় না।

অনেক বোঝালাম যে ওটা নিরীহ প্রাণী, ভয়ের কিছু নেই, ওর বিশ্বাস হল না। আর একদিন যখন মন্দিরের পুকুরপাড়ে বসে আছি, বাঘটা জল খেতে এসে চারিপাশে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়িয়ে আমার দিকে দেখে নিজের মনে চলে গেল। আয়েঙ্গার মন্দিরে লুকিয়ে থেকে সব দেখলে আর আমার কী হবে ভেবে আকুল হল। বাঘটা চলে যেতে আমি মন্দিরে গিয়ে তার ভয় ভাঙ্গিয়ে বললাম 'দেখ কী নিরীহ জীব। ওকে ভয় দেখালে, ও আক্রমণ করত, না হলে নয়।' তবে ওর ভয় যায়। তারপর আমরা আর ওখানে বেশিদিন থাকিনি।''

* * *

20শে জানুয়ারি, 1946

(26) চিকিৎসা ছাড়া নিরাময়

পায়ের ব্যথার জন্য ডাক্তারেরা ভগবানের সেবকদের তাঁকে বেশি ভিটামিন যুক্ত খাদ্যদ্রব্য দিতে বলে। তারাও যথাসাধ্য করে যাচ্ছিল, তাছাড়া বিশেষ মলম দিয়ে পা মালিশও করছিল। তাদের সাধ্যমত সেবা করছিল। ভগবান পরিহাস ক'রে বললেন, ''একজন অতিথি এসেছে, তুমি যদি উদাসীন হও, সেও তাড়াতাড়ি চলে যাবে আর তুমি যদি খুব আদর যত্ন করো ও সম্মান দেখাও তাহলে আর যাবে না। রোগও তেমনি। তোমরা যেরূপ মনোযোগ দিচ্ছ, ও যাবে কেন? যদি নজর না দাও ও আপনা হতেই চলে যাবে।''

কিছুদিন আগে আশ্রম থেকে এক মাইল দূরে প্রদক্ষিণ করার পথে একজন ছোকরা 'বিভূতি' দিয়ে রোগ সারাবে বলে একটা প্রতিষ্ঠান খুলে বসল। লোকেরা এরকম ব্যাপারে একেবারে মেতে যায়, তাই না? রোগী, ভূতে পাওয়া আরও অনেকেই দলে দলে 'বিভূতি স্বামী'র কাছে যেতে লাগল, পথে আশ্রমে একবার আসত। এ আশ্রমে কী আর আছে? বিভূতি নেই! কবচ-তাবিজ নেই! তারা দর্শন করে চলে যেত। সে সময়ে যদি কোন

সেবক পা মালিশ করত তবে ভগবান বলতেন, ''খুব ভাল হয়েছে। এও একরকম উপকার। ওরা আমায় এভাবে দেখে বলবে, 'এ স্বামী নিজেই পায়ের ব্যথায় অসুস্থ আর অন্যকে দিয়ে মালিশ করাচ্ছেন, ইনি আমাদের জন্য কী আর করবেন?'' এই বলে কাছে না এসে চলে যাবে। এ একরকম ভাল হয়েছে।''

চারদিন আগে ভগবান খবরের কাগজের অতিরিক্ত ভিটামিন খাওয়া ও ইন্‌জেক্‌সান দেওয়ার ফলে একজনের মৃত্যুর খবরটা সব ডাক্তারদের দেখালেন। পরের দিনও অন্য একটা কাগজে এই খবরটা ছিল। ছোট ছেলের মতো সেদিন খবরটা সবাইকে দেখিয়ে বললেন, ''দু'বছর ধরে শরীর ভাল হবে বলে আমাকে অনেক ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে, এতেও খুশি না হয়ে ইন্‌জেক্‌সান দিতেও চেয়েছে। খবরের কাগজের খবর দেখো তো, লোকটার কী হল!'' যোগীপুরুষেরা শিশু কিংবা পাগলের মতো সদানন্দ। সব জেনেও এমন ব্যবহার করেন যেন কিছুই জানেন না। ভগবান ইচ্ছা করলে কি নিজের রোগ সারাতে পারেন না? নিজেকে কি ভাল করতে পারেন না? তিনি অন্যের ওপর ছেড়ে দেন কারণ শরীরটাকে কখনও নিজের মনে করেন না।

দু'তিন বছর আগে ভগবানের যখন ন্যাবা (জন্‌ডিস্‌) রোগ হয়েছিল তখন তিনি কিছুই খেতে পারতেন না। খুব অরুচি হয়েছিল। প্রায় এক সপ্তাহ কি দশদিন কেবল ভুট্টার খই কিংবা ওই রকম কিছু খেতেন। এচম্মা ও মুদলিয়র ঠাকুমা যারা ভগবানকে না খাইয়ে খেত না, এরূপ ব্রতধারীদের যাতে ব্রতভঙ্গ না হয় সে জন্যে তাদের পাঠানো খাবার থেকে কয়েকটি ভাতের দানা তুলে নিয়ে খই-এর সঙ্গে মিশিয়ে কোনরকমে খেতেন। যে কোন অবস্থা হোক না কেন, তাঁর বিবেচনা ও সহৃদয়তার আর তুলনা হয় না। কেউ ক্ষুণ্ণ হয়, কি দুঃখ পায়, এ তাঁর সহ্য হয় না।

অনেক ডাক্তার ন্যাবার ওষুধ দিলে। ভগবান ডাক্তারদের খুশি করার জন্য তাদের ওষুধ আর মহিলাদের সুখী করার জন্য তাদের পাঠানো

খাবার খেয়ে চললেন। একের উপকারিতা আর অন্যের অপকারিতা সমান সমান হয়ে গেল। মাসের পর মাস চলে গেল। রোগ সমান রইল। মাদ্রাজ থেকে একজন নামকরা চিকিৎসক এলেন কিন্তু ফল একই। যখন সবাই এল গেল- কোন ওষুধে কোন কাজ হল না তখন ভগবান নিজেই সন্টি (সুঁট) পিপ্পালু (ইপিকাক) ইত্যাদি আয়ুর্বেদিক গাছ-গাছড়ার ওষুধ খেয়ে অল্পদিনেই ভাল হয়ে গেলেন। কেউ সাহস ক'রে জিজ্ঞাসা করুক তো অসুখ কী করে ভাল হল!

* * *

21শে জানুয়ারি, 1946

(27) ভক্তির স্বাদুগন্ধ

গতকাল তোমায় যখন ভুট্টার খই-এর সঙ্গে ভাত খাওয়ার কথা লিখছিলাম তখন আরও একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। এচম্মার রান্না কোনকালেই ভাল ছিল না আনাজ ও মশলা কখনো পরিমাণ মতো হত না। কিন্তু ভগবানের কাছে তার রান্না স্বাদু হোক বা না হোক অত্যন্ত সুস্বাদু ছিল, কোনদিন অভিযোগ করতেন না।

কিন্তু কেউ কেউ থাকতে না পেরে, ভগবান যখন অতিপ্রত্যুষে আনাজ কুটতেন তখন কথায় কথায় মাঝে মাঝে এটা তুলত। বারবার তাদের অভিযোগ শুনে ভগবান বললেন, ''কী জানি, তোমাদের যদি ভাল না লাগে খেও না, আমার তো মনে হয় ঠিক হয়েছে আমি খেয়ে যাব।''

কিছুদিন আগে প্রায় এক সপ্তাহ কি দশদিন সে (এচম্মা) অন্য কাউকে দিয়ে খাবার পাঠাচ্ছিল, বোধহয় অন্য কোথাও গিয়েছিল কিংবা অসুস্থ ছিল। রাঁধুনি সেই খাবারটা পরিবেশন করতে ভুলে গিয়ে আশ্রমে রাঁধা সব খাবার পরিবেশন করলে। সাধারণতঃ ভগবান সবাইকে খাওয়া শুরু করার ইশারা ক'রে নিজেও খেতে শুরু করতেন। সেদিন বাঁহাত গালে

দিয়ে ডান হাত পাতায় রেখে চুপ ক'রে বসে রইলেন। যারা খেতে বসেছিল তারা এদিক ওদিক চাইতে লাগল। রান্নাঘরের লোকেরা ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে এর কারণ সম্বন্ধে বলাবলি করতে লাগল। হঠাৎ তাদের মনে পড়ে গেল যে, এচম্মার পাঠানো খাবারটা দেওয়া হয়নি। 'ও, আমরা ভুলে গেছি' বলে সেটি পরিবেশন করলে। তখন ভগবান সবাইকে খেতে ইশারা করলেন আর নিজেও খেতে শুরু করলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত সুদামের চিঁড়ে খেয়ে যেমন খুশি হয়েছিলেন ঠিক তেমনি ভক্তরা যদি কাঁচা চিনেবাদামও দেয় তবে ভগবান বড়লোকের দেওয়া মণ্ডামিঠাই ফেলে রেখে অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে খান।

* * *

22শে জানুয়ারি, 1946

(28) ব্রহ্মাস্ত্র

গতকাল কিংবা পরশুদিন একজন সতেরো আঠারো বছরের যুবক সাইকেলে করে এখানে এসেছিল। 15 মিনিট হলে বসে ভগবানের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ''অওঁকার পেরিয়ে কোথায় লয় হতে হবে?'' একটু হেসে ভগবান বললেন, ''ও তাই নাকি? এখন কোথা থেকে আসছ? কোথায় যাবে? কী জানতে চাও? তুমিই বা কে? তুমি যদি, তুমি কে বলতে পারো তবে আমায় ওঁকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পারো।'' ছেলেটি বললে, ''আমি তাও জানি না।'' ভগবান বললেন, ''তোমার অস্তিত্ব যে আছে সেটা তো নিশ্চয়ই জানো। তোমার অস্তিত্বটা কী? এর আগে কোথায় ছিলে? তোমার শরীরটা আসলে কী? প্রথমে এগুলো জানো। এগুলো জানা হলে তখনও যদি তোমার প্রশ্ন থাকে তবে আমায় জিজ্ঞাসা করো। ওঁকার কোথায় লয় হয়, লয় হলে কী হয়, তারপর কী থাকে, এসবের জন্য দুশ্চিন্তা করছ কেন? তোমার কোথায় লয় হয়? কী করে সেখান থেকে ফিরে আসো? প্রথমে তোমার অবস্থা আর আসা যাওয়া

খুঁজে দেখো, পরে অন্য সব ভাবা যাবে।'' ভগবানের এ কথা বলার পর ছেলেটি কিছু উত্তর দিতে না পেরে প্রণাম করে চলে গেল। প্রশ্নকারীর পক্ষে এর থেকে বড় ব্রহ্মাস্ত্র আর কী হতে পারে? এই অস্ত্রটি ব্যবহার করলেই প্রশ্নকারী নীরব হতে বাধ্য।

তুমি জানতে চাইবে যে ভগবানের বাঁধা উত্তর 'তুমি কে? খোঁজো'র ব্রহ্মাস্ত্র নামটা কে দিলে? দু'তিন বছর আগে একজন সন্ন্যাসী বহু শাস্ত্র পাঠ করেছি বলে গর্ব করে ভগবানকে অনেক প্রশ্ন করতে লাগল। তিনি বার বার 'তুমি কে? খোঁজো,' উত্তর দিলেন। তবুও সন্ন্যাসী অনর্থক প্রশ্ন ও তর্ক ক'রে চলল তখন ভগবান দৃঢ়স্বরে বললেন, ''তুমি আমাকে তখন থেকে প্রশ্ন করে চলেছ আর তর্ক করছ। আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তর্ক করো না? তুমি কে? প্রথমে আমার প্রশ্নের জবাব দাও। তারপর আমি তোমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেব। বলো দেখি কে তর্ক করছে?'' সে কোন উত্তর দিতে না পেরে চলে গেল।

কিছুদিন পরে এই ঘটনার ওপর আমি 'দিব্যাস্ত্র' নামে পাঁচটি পদে একটি কবিতা লিখে ভগবানকে দেখাই। তাতে তিনি বললেন, ''অনেকদিন আগে নায়না (গণপতি মুনি) ও কাপালী এখানে ছিল। তাদের যদি কোন প্রশ্ন থাকত তাহলে তারা প্রথমে হাত জোড় করে বলত, 'স্বামী, স্বামী, আপনি যদি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করবেন না বলে আশ্বাস দেন তবে একটা প্রশ্ন করি।' যদি কথায় কথায় 'তুমি কে?' কথাটা আমার মুখ থেকে বেরিয়ে যেত তাহলে তারা বলত 'এই যা, ব্রহ্মাস্ত্র ছুঁড়লেন আর কী বলব?' তারা বলত, 'ব্রহ্মাস্ত্র', তুমি লিখেছ 'দিব্যাস্ত্র'। এরপর থেকে আমিও 'ব্রহ্মাস্ত্র' শব্দটা ব্যবহার করতে আরম্ভ করলাম। সত্যি বল, এই অস্ত্রের কাছে কে না হার স্বীকার করবে?

* * *

23শে জানুয়ারি, 1946

(29) ওটা খেলা, এটা কবিতা (স্পষ্ট)

কিছুদিন আগে কোন একজন ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে ভগবানের 'হংসগীতার' একটি শ্লোক মনে পড়ল। তাতে সিদ্ধের অবস্থার বর্ণনা ছিল। ভগবান উৎসাহের সঙ্গে সেটি তামিল কবিতায় অনুবাদ করলেন। বলরাম রেড্ডী সেখানে বসেছিল, বললে, ''তেলুগুতেই বা নয় কেন?'' ভগবান সেটি তেলুগু 'আতাভেলাদি' ছন্দে অনুবাদ করে ভাবতে লাগলেন যে ঠিক হল কিনা। আমি মৃদুস্বরে বললাম যে 'থেটাগীত' ছন্দে করলে হয়তো আরও ভাল হবে। ভগবান বললেন, ''হাঁ, এটা সেই ছন্দে বদলানো যায়। ওটা আট (খেলা) এটা থেট (স্পষ্ট)।'' কথাটা শুনে আমি অবাক হলাম।

যখন দুপুর আড়াইটার সময়ে গেলাম, ভগবান সেটা 'থেটাগীত' ছন্দে লিখে ফেলেছেন, আমায় দিয়ে বললেন, ''দেখ, ঠিক হয়েছে কিনা।'' যদিও সেটা বেশ সাবলীল মনে হল না তা সত্ত্বেও ভগবান লিখেছেন ভেবে খুশি হয়ে গভীর ভাবে চিন্তা না করেই বললাম, ''ভগবান যেভাবেই লিখুন আমার কাছে সব ভাল।'' ভগবান বললেন, ''আমার মতন অযোগ্যের লেখা একজন ভাল বললেই যথেষ্ট।'' চারিপাশে সবাই হেসে উঠল। তিনি বলছেন যে তিনি বিদ্বান নন আর অন্য সব লেখকেরা বিদ্বান! আমরা যারা নিজেদের খুব পণ্ডিত মনে করি তাদের মৃদু তিরস্কার ছাড়া আর এটা কী?

এইখানেই শেষ হল না। এখানে ভাবটা ঠিক হয়নি ওখানে ব্যাকরণ ভুল হয়েছে বলে বলরাম রেড্ডীর সঙ্গে সেই কবিতাটির আলোচনায় সমস্ত দিন কাটালেন। পরের দিন সকালে পারায়ণের সময়ে গেলে ভগবান আমায় কবিতাটির একটি শুদ্ধ লিপি দিলেন।

বাড়িতে এনে সেটা দেখে মনে হল একটা শব্দ ঠিক হয়নি। আরও একটা ইচ্ছা হল যে এর একটা প্রতিলিপি ক'রে আশ্রমের খাতায় রেখে দেব আর আসল লেখাটা নিজের কাছে রাখব। এই ভেবে কাগজটির

চারিপাশ কাঁচি দিয়ে কেটে পরিষ্কার ক'রে ব্যাগে নিয়ে সকাল ৪টার সময়ে আশ্রমে গেলাম।

যখন প্রণাম করছি তখনই ভগবান অশুদ্ধ শব্দটির কথা পাড়লেন। তিনি বললেন, ''শব্দটা বদলাতে হবে আর অন্য কেউ দেখতে চাইলে দেখাতে হবে, কাগজটা দাও।'' হাঁ, আমার মনে কী হচ্ছে তিনি বুঝতে পারেন। অবাক হলাম।

আগেও এরকম ঘটনা ঘটেছে। ভগবান যখন ছেলেমানুষের মতন তাঁর কাগজ চাইতে লাগলেন তখন আমার মনে, আমার ইচ্ছার কথা ভেবে লজ্জা, পাছে বকুনি খাই সেজন্য ভয়, আর তাঁর জোর করা দেখে মজা, সব ভাবই একসঙ্গে উদয় হল।

আমি ''এই যে, এনেছি'', বলে কাগজটা তাকে দিলাম। তিনি সেটা নিয়ে সযত্নে তুলে রাখলেন যেন কত অমূল্য ধন। সেদিনও সারাদিন ব্যাকরণ ঠিক হয়নি বলতে লাগলেন, আমায় জিজ্ঞাসা করা হলে বললাম, ''ঈশ্বরের বাক্যে ব্যাকরণ কি কোন বাধা হয়?''

ভগবান হেসে বললেন, ''ঠিক আছে,'' আর অবশেষে নিজেই সেটা থেটাগীতে লিখে আমায় স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন যে আমি যেন একটা প্রতিলিপি ক'রে নিয়ে আসল কাগজটা তাঁকে ফেরত দেই। একটা সামান্য জিনিস নিয়ে তিনদিন যেন তিনি আমাদের সঙ্গে খেলা করলেন আর শেষে কবিতাটা থেটাগীত ছন্দে সমাপ্ত করলেন।

ওটা আট (খেলা), এটা থেট (কবিতা বা স্পষ্ট) কথার বোধ হয় এই অর্থ।

থেটাগীত–

ওডলু নশ্বর মদিস্থিতং বুত্থিতং বো
কর্মবশমুন বিডুবড গলয়গলদো।
তন নেরিরংগিন সিদ্ধডু তনুবু গনডু
গুড্ডনু মদিরামদমুন গ্রুড্ডি বলেনে॥

দেহ দ্বারা আত্মজ্ঞান লভি সিদ্ধগণ
নশ্বর শরীর চিন্তা না করে কখন।
প্রারব্ধ বশে ওঠা চলা থাকা খাওয়া
মদিরান্ধ নাহি জানে কোথায় বসন!

* * *

26শে জানুয়ারি, 1946

(30) ক্রোধ

গতকাল একজন নবাগত আন্ধ্র যুবক ভগবানকে ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যের বিষয় বলাতে তিনি উত্তর দিলেন, ''সবই মনের ব্যাপার, মনকে ঠিক করো।'' বেচারি ছেলেটি বললে, ''সে তো ঠিক কথা স্বামী, কিন্তু যতই ক্রোধ দমনের চেষ্টা করি না কেন, বার বার রাগ হয়, আমি কী করব?''

ভগবান বললেন, ''ও! তাই নাকি, তবে রাগের ওপর রাগ করো তাহলে ওটা ঠিক হয়ে যাবে।'' ঘরের সকলে হেসে উঠল। যে জগতের সবার ওপর রাগ করে সে যদি একবার ভাবে ও বিচার করে যে, সে কেন নিজের ক্রোধের ওপর রাগ করে না, তাহলে কি তার ক্রোধ দমন হবে না?

দুই কিংবা তিন বছর আগে যার ভগবানের কাছে অবাধ স্বাধীনতা ছিল এমন একজন ভক্ত, কেউ তাকে গালাগালি করেছে, এই কথা ভগবানকে পাঁচ ছ'বার বলে। ভগবান শুনেও কিছু বললেন না। যখন অনেকবার অনেকভাবে বলেও কোন উত্তর পেল না তখন সে আর না থাকতে পেরে বললে, ''আমায় মিছামিছি গাল দিলে আমারও রাগ হয়। যত চেষ্টাই করি না কেন রাগ দমন করতে পারি না আমি কী করব?''

ভগবান হেসে বললেন, ''তুমি কী করবে? তুমিও তার সঙ্গে যোগ দিয়ে নিজেকে গালাগালি দাও, তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'' সবাই হেসে উঠল।

ভক্তটি কিছু বুঝতে না পেরে বললে, ''এতো বেশ ভাল কথা! আমিও আমাকে গালাগালি দেব?''

''হাঁ, নিশ্চয়! তারা কাকে গালি দেয়, তোমার শরীরকে, তাই না? যত রাগ অভিমানের ভাণ্ডার এই শরীরের থেকে বড় শত্রু আর কে আছে? আমাদের একে ঘৃণা করাই উচিত। তা না ক'রে আমরা অসাবধান হলে, কেউ গালি দিয়ে তারা বরং আমাদের এ বিষয়ে সচেতন করে দেয়। অন্ততঃ তখন আমাদের বোঝা উচিত আর তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে এটাকে হেয় করা উচিত। পাল্টে গালাগালি দিয়ে কী লাভ? যারা আমাদের তিরস্কার করে তারাই আমাদের সত্যকারের বন্ধু। এ রকম লোকের সঙ্গ ভাল। যারা প্রশংসা করে তাদের মধ্যে তুমি ভুল পথে চালিত হও,'' ভগবান বললেন।

1924 সালে জুন মাসে আশ্রমে চোর এসেছিল আর তারা ভক্তদের তো মেরেই ছিল এমনকি ভগবানের পায়েও দু'এক ঘা দিয়েছিল। পরে নিজেদের মধ্যে মারের কথা বলাবলি করার সময়ে ভক্তরা বলেছিল, ''অতি বদলোক তারা ভগবানকেও মারলে।'' ভগবান নাকি উত্তরে বলেছিলেন, ''ও তোমরা ফুল দিয়ে পূজা করো, ওরা লাঠি দিয়ে করেছে। ওটাও একরকম পূজা। যদি তোমাদেরটা নিই তবে ওদেরটাই বা নেব না কেন?'' তিনি বাস্তব উদাহরণ দিয়েই শিক্ষা দেন। এটাও কি সেইরকম একটা দৃষ্টান্ত নয়?

* * *

27শে জানুয়ারি, 1946

(31) দেবী অম্বার বেশভূষা

গতবছর নবরাত্রির (দুর্গাপূজা) সময়ে, মাতৃভূতেশ্বর মন্দিরের দেবীমূর্তির প্রথম দিনের বেশভূষা তুমি দেখেছ। এই ন'দিন প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন বেশভূষা হয়। পুরাণের কাহিনী অনুসারে এর মধ্যে একদিন শিবের বিচ্ছেদ সহ্য না করতে পেরে অম্বার তপস্যা করতে যাওয়া আছে। সেই

অনুসারে অম্বার মূর্তিকে সাজিয়ে একটি গাছের তলায় রাখা হল। সান্ধ্য ভোজনের পর ভগবানকে সেখানে নিয়ে গিয়ে সজ্জিত দেবীমূর্তি দেখানো হল।

পরেরদিন সকালে অরুণাচলেশ্বর আর এখানের মন্দিরের সাজসজ্জা ও বসনভূষণের কথায় ভগবান বললেন, ''গতকালের সাজ হওয়া উচিত ছিল পার্বতীর তপস্যা। শিবের বিরহ অসহনীয় হওয়ায় তপস্যারত পার্বতীকে সিল্কের শাড়ি, সোনা ও ফুলের গহনা পরে গাছের তলায় কেতাদুরস্ত হয়ে বসে আছেন দেখানো হল। এ দেশে সবাই এইরকম করে। তপস্যার অর্থ ধ্যানের সঙ্গে আত্মসংযম ও শারীরিক কৃচ্ছ্রতা, তাই না? কাহিনীতে বলা হয়েছে, অম্বা পরিহাস করে দু'হাত দিয়ে শিবের চোখ চাপা দিয়েছিলেন। সেই দোষ স্খালনের জন্য শিব তাঁকে তপস্যা করতে বলেন। সুতরাং দেবী এক নির্জন স্থানে গিয়ে দেহজ্ঞান ভুলে কঠোর তপস্যা করে দুর্বল হয়ে যান। দেখ দেখি, অম্বাকে কীভাবে সাজিয়ে কাহিনীটি দেখানো হয়! তাঁর পরনে সিল্কের শাড়ি, গায়ে হীরে-চুনিপান্নার জড়োয়া গহনা আর ফুলের সাজ, যেন মহারানি বসে আছেন।''

* * *

30শে জানুয়ারি, 1946

(32) আভৈয়ারের (বৃদ্ধা চারণকবি) গীত

গত চারদিন ভগবান সদ্য ছাপাখানা থেকে আসা তেলুগু 'শ্রীরমণলীলা' বইটি দেখছেন। এতে আভৈয়ারের গীতের অনুবাদ দেখে বললেন যে সেটা ঠিক হয়নি। অনুবাদটা ছিল-

''ও জঠর! তুমি একদিন না খেয়ে থাকতে পারো না। দু'দিনের খাওয়া একবারেও খেতে পারো না। তোমার জন্য আমার কত কষ্ট তা জানো না। ও হতভাগ্য জঠর! তোমার সঙ্গে পারা অসম্ভব।''

তিনি বললেন যে এটা ঠিক হয় নি, অনুবাদটা এইরকম হওয়া উচিত–

''তুমি একদিনও উপবাস করো না। দু'দিনে একবার খাওনা কেন? আমার কষ্ট তুমি একদিনও বোঝো না। সুতরাং জীব বলছে 'হে জঠর! তোমার সঙ্গে থাকা অসম্ভব।''

আমাদের মতো লোকেরা মরতে ভয় পায়। কেন? কারণ আমাদের দেহাত্মবোধ এখনও যায় নি। যারা আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব জানে তাদের কাছে শরীরটাই একটা ভার। যতক্ষণ এ দু'টি একসঙ্গে আছে ততক্ষণ খাওয়া শোওয়ার জন্য কিছু পরিশ্রম করতেই হবে। এবং এগুলো সেই পরমানন্দ অনুভবের বাধা, ঠিক যেমন গরমকালে কাপড় জামা অসহ্য মনে হয়। এ অবস্থায় তাঁদের সেবা করার অর্থ দাঁড়ায় যে, তাঁরা যখন যা প'রে আছেন সেগুলো গরমের জ্বালায় খুলে ফেলতে পারলে বাঁচেন, তখন তাঁদের তা না করতে দিয়ে আরও সাজ–পোশাক করতে বলা। জীব বলছে উদয়ের সঙ্গে থাকা অসম্ভব। এর পরিবর্তে ভগবান একটা নূতন ব্যাখ্যা করলেন, তাঁর মতে উদরই জীবকে (অহংকার) বলছে যে তোমার সঙ্গে থাকা যায় না। ভাবটা দেখ, ''ও জীব (অহংকার) তুমি আমাকে (উদরকে) এক মুহূর্ত শান্তি দাও না। আমার কষ্ট বোঝো না। তোমার সঙ্গে থাকা যায় না।'' তার অর্থ জীব মুহূর্তের জন্যও খেতে ভোলে না তাই উদর বলছে তার সঙ্গে থাকা যায় না।

আমি চিঠিটা ভগবানকে পড়ে শোনালে একজন তামিল ভক্ত সব শুনে বললে, ''আভৈয়ারের গানটা সবার জানা কিন্তু ভগবানের ব্যাখ্যাটি অভিনব। উদরের প্রতি এত দরদ আর কেউ দেখায়নি। ভগবান কোন্ পরিবেশে এটা লিখেছেন জানা নেই।'' ভগবান হেসে বললেন, ''এক বৈশাখি পূর্ণিমায় আমরা ভরপেট মিষ্টান্ন ইত্যাদি খেয়েছিলাম। সেদিন অন্য দিনের থেকে খেতে দেরি হওয়ায় সবাই খুব ক্লান্ত। আমাদের মধ্যে সোমসুন্দরস্বামী মাটিতে শুয়ে পেট চাপড়াতে চাপড়াতে আভৈয়ারের

গানটা গাইলে। আমি পরিহাসচ্ছলে একটা লালিকা (ব্যঙ্গ কবিতা) তৈরি করে গাইলাম। এ দু'টি গানের অর্থের কথাই এতক্ষণ পড়া হচ্ছিল।''

* * *

31শে জানুয়ারি, 1946

(33) সূদপথ- উচ্চলোকসমূহ

আজ সকালের খবরের কাগজে সূর্যলোক ও অন্যান্য লোকের পথ সম্বন্ধে একটা বিবরণ প'ড়ে ভগবান বললেন, ''এরা সূর্যলোক ও অন্যান্য শান্তিময় লোকের পথ সম্বন্ধে কত কী লেখে। সব লোকই এই জগতের মতন। তারা এর থেকে কিছু পরম রমণীয় নয়। দেখ, রেডিওতে একটা গান আসছে, এই মাদ্রাজ থেকে আসছিল, এখন তিরুচিরাপল্লী থেকে আসছে, আবার রেডিওটা ঘুরিয়ে দিলে মহীশূর থেকে ধরা যাবে। অল্প সময়ের মধ্যে সব জায়গাই তিরুভণ্ণামলই-এ এসে গেল। অন্যান্য লোকও সেই রকম। তোমার মনকে তাদের সঙ্গে যুক্ত করলেই হয়। এক মুহূর্তেই তাদের দেখতে পাবে। কিন্তু দেখে কী লাভ, মিছামিছি ঘুরে ক্লান্ত হবে আর শেষে বিরক্ত হবে। শান্তি কোথায়? যদি শান্তি চাও তবে শাশ্বত সত্যকে জানতে হবে। তা না হলে মন শান্তিতে ভরে না।''

অনুরূপভাবে আগেও একজন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ''লোকে বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, ইন্দ্রলোক ইত্যাদির কথা বলে, তারা কি সত্যই আছে?'' ভগবান বললেন, ''নিশ্চয়। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো যে তারা সব আছে। সেখানেও এমনি একজন স্বামী সোফায় বসে আছেন আর ভক্তেরা চারিপাশে বসে আছে। তারা প্রশ্ন করছে আর তিনিও উত্তর দিচ্ছেন। প্রায় এই রকমই সব। তাতে কী হবে? যদি চন্দ্রলোক দেখো ইন্দ্রলোক দেখতে ইচ্ছা হবে, ইন্দ্রলোকের পর বৈকুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠ দেখলে কৈলাস, এইরকম পর পর মন কেবল ঘুরেই বেড়ায়। শান্তি কোথায়? যদি

শান্তি চাও তবে সেটি পাওয়ার সব থেকে প্রকৃষ্ট উপায় আত্মানুসন্ধান। আত্মানুসন্ধান থেকে আত্মজ্ঞান লাভ হওয়া সম্ভব। আত্মজ্ঞান লাভ হলে দেখা যায় যে সব লোকই নিজের আত্মায়। সব কিছুর মূল নিজের আত্মা আর আত্মজ্ঞান হলে আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই। তখন আর এসব কোন প্রশ্নই উঠবে না। বৈকুণ্ঠ বা কৈলাস থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে, কিন্তু তুমি যে আছ সেটা তো স্থির সিদ্ধান্ত, তাই না? তুমি এখানে কীভাবে আছ? কোথায় আছ? এগুলো জানা হলে তারপর অন্য লোকের কথা ভাবতে পারো।''

* * *

1লা ফেব্রুয়ারি, 1946

(34) বই

1944 সালে একদিন সকালবেলা একজন ভক্ত ভগবানের কাছে মিনতি করে বললে, ''ভগবান, আমি বই প'ড়ে মুক্তির পথ খুঁজতে চাই কিন্তু আমি পড়তে জানি না, আমি কী করব? কী করে মুক্তি পাব?'' ভগবান বললেন, ''তুমি পড়তে জানো না, তাতে কী হয়েছে? তুমি যদি তোমার আত্মাকে জানো তা হলেই হবে।'' সে বললে, ''এখানে সবাই বই পড়ে, কিন্তু আমি তো কিছু পড়তে পারি না, আমি কী করব?''

ভগবান হাতটি নেড়ে সব ভক্তদের দেখিয়ে বললেন, ''বই এদের কী শেখাচ্ছে, বলো তো? তুমি আগে নিজেকে দেখো তারপর আমায় দেখো। বই পড়া প্রায় আর্শিতে নিজেকে দেখার মতন। মুখে যা আছে আর্শি তাই দেখায়। যদি মুখ ধুয়ে দেখো তবে মুখটি পরিষ্কার দেখাবে। নইলে আর্শি বলবে ময়লা রয়েছে, মুখ ধুয়ে এসো। বইও তাই করে। যদি আত্মজ্ঞান লাভ ক'রে বই পড়ো– তবে সব বুঝতে পারবে। আর যদি না লাভ ক'রে পড়ো– তাহলে অসংখ্য দোষ দেখবে। বই বলবে, 'আগে নিজেকে ঠিক

করো তারপর আমায় দেখো।' এই তো। প্রথমে নিজেকে দেখো। পঠিত বিদ্যার জন্য নিজেকে উদ্বিগ্ন করছ কেন?''

ভক্তটি সন্তুষ্ট হল আর অনুপ্রাণিত হয়ে চলে গেল। আর একজন ভক্ত যে এই সব ব্যাপারে খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করতে সাহস করত সে এই কথার সুত্র ধরে বললে, ''ভগবান, আপনি ওকে একটা অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিলেন।'' ভগবান বললেন, ''অদ্ভুত কী হল? সব সত্য। কম বয়সে আমি কি বই পড়েছিলাম? অন্যের কাছেই বা কী শিখেছিলাম? সব সময়ে ধ্যানে মগ্ন থাকতাম। কিছুদিন পরে পলনীস্বামী বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে বই এনে পড়ত। পড়তে তার অনেক ভুল হত। সে বয়স্ক ও তত শিক্ষিত ছিল না। তা সত্ত্বেও বই পড়াতে তার খুব আগ্রহ ছিল। খুব ধৈর্য ও বিশ্বাসের সঙ্গে পড়ত। সেজন্য আমার খুব আনন্দ হত। সুতরাং যখন নিজে পড়ে দেখে তাকে বলার জন্য বইগুলো পড়তে লাগলাম, দেখি যে যা যা লেখা আছে সবই আমার অনুভব হয়ে গেছে। আমার আশ্চর্য লাগল। 'একী? এ যে আমার কথাই সব লেখা রয়েছে।' এরকম সব বই সম্বন্ধেই। যেহেতু সবই আগে অনুভব হয়ে গেছে তাই বই-এ যা লেখা ছিল পড়লেই বুঝতে পারতাম। যে বই পড়তে তার কুড়ি দিন লাগত আমার দু'দিনেই হয়ে যেত। সে সেটা ফেরত দিয়ে আবার অন্য বই আনত। এইভাবে বই-এ কী আছে জেনেছিলাম।''

একজন ভক্ত বললে, ''এইজন্যই বোধহয় শিবপ্রকাশ পিল্লাই ভগবানের জীবনীর প্রারম্ভে ভগবান সম্বন্ধে লিখেছেন, একজন ব্রহ্মজ্ঞানী যে 'ব্রহ্ম' শব্দটিও জানে না।'' ভগবান বললেন, ''হাঁ, হাঁ, ঠিক তাই। তাই বলা হয় আগে নিজেকে জানো তারপর বই পড়ো। এটি করলে দেখা যায় যে, যা অনুভব হয় তারই সংক্ষিপ্তসার বই-এ লেখা আছে। নিজেকে না জেনে বই পড়লে অনেক অসঙ্গতি আছে মনে হয়।'' আর একজন বললে, ''সবাই কি আর ভগবান হতে পারে? বই পড়লে অনেক সময়ে ভুল-

ত্রুটিগুলো ধরা পড়ে।'' ভগবান বললেন, ''তা ঠিক। আমি এ কথা বলছি না যে বই কোন সাহায্য করে না। কেবল বলতে চাই যে নিরক্ষরেরা যেন এ ভেবে হতাশ না হয় যে, না পড়ার জন্য তাদের মোক্ষ লাভ হবে না। দেখ, লোকটি যখন প্রশ্ন করছিল তখন সে কী রকম নিরুৎসাহ বোধ করছিল। যদি ভালভাবে বুঝিয়ে না বলা হত তবে আরও হতাশ হয়ে যেত।''

* * *

2রা ফেব্রুয়ারি, 1946

(35) ব্যাধি

দু'বছর আগে যখন আমাদের বড়দাদা আশ্রমে এসেছিলেন তখন অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীমান্নে বেঙ্কটারামায়াও এখানে ছিলেন। কিছুদিন আগে তিনি অসুস্থ হয়েছিলেন। সে সময়ে যদিও তিনি আগের থেকে একটু ভাল তাহলেও সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন না। ভোরবেলা থেকে রাত্রি সাড়ে আটটা পর্যন্ত তাঁর অসুখের বৃত্তান্ত শুনে ভগবান বললেন, ''তা তো ঠিক! শরীরটাই একটা ব্যাধি। শরীরের যদি ব্যাধি হয় তবে বুঝতে হবে ব্যাধির ওপর আরও একটা ব্যাধি হয়েছে। যদি সত্যই ভাল হতে চাও তবে আগেকার ব্যাধিটা যাতে ভাল হয় তার চিকিৎসা করা উচিত, তবে না ব্যাধির ব্যাধি আর ভোগাবে না। প্রাথমিক রোগের নিরাময়ের চেষ্টা না ক'রে আনুষঙ্গিক ব্যাধির জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে লাভ কী? নূতন রোগটাকে আপনা হতে ভাল হতে দাও, মূল ব্যাধির চিকিৎসার জন্য চিন্তা করো।''

এর দৃষ্টান্তস্বরূপ সম্প্রতি একটা ঘটনা ঘটেছে। ভক্তদের দ্বারা অনুরুদ্ধ ও উৎসাহিত হয়ে বিশ্বনাথস্বামী সংস্কৃত 'ত্রিশূলপুরম্ মাহাত্ম্য' তামিল গদ্যে অনুবাদ করেছে। যখন অনুবাদ শেষ হল তখন বোধহয় ভগবানের শরীর একটু অসুস্থ ছিল। বই যদিও ছাপাখানায় যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গিয়েছিল তবু পাছে ভুল সংশোধন করতে গিয়ে ভগবানের অত্যধিক পরিশ্রম হয় তাই এ কথাটা তাঁকে জানানো হয়নি। সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার আগেই একদিন

বিশ্বনাথকে দেখে ভগবান তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''মাহাত্ম্যের অনুবাদ কতদূর হল?'' মিথ্যা কথা বলতে অনিচ্ছুক হয়ে সে বললে যে অনুবাদ শেষ হয়ে গেছে। ভগবান বললেন, ''আননি কেন?'' বিশ্বনাথ বললে যে ভগবান অসুস্থ ছিলেন সেজন্য আনোনি। তাতে ভগবান বললেন, ''ও, তাতে কী হয়েছে! যদি শরীর ভাল না থাকে তাতে আমার কী? তার ভোগ তাকে ভুগতে দাও। আমি ও নিয়ে ভাবি না। আমি ভাল আছি। নিয়ে এসো, পড়ে দি। শরীরের সেবার প্রয়োজন হলে এরা সবাই দেখবে। বইটা নিয়ে এসো।'' আর কোন উপায়ান্তর না দেখে বিশ্বনাথ বইটা এনে দিলে আর ভগবান তৎক্ষণাৎ সেটি দেখতে শুরু করলেন। এমন কি রাত্রেও অল্প আলোতে পড়ে সংশোধনের কাজ শেষ করলেন। তাঁর শারীরিক অসুস্থতা কাজের কোন বাধা হল না।

* * *

5ই ফেব্রুয়ারি, 1946

(36) কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ

সম্প্রতি ছেপে আসা 'শ্রীরমণলীলা' বইটি ভগবান প্রায়ই দেখছেন। গতকাল রঙ্গস্বামী এর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, ''গামছার গল্পটা কি এতে আছে?'' গল্পটা বইতে ছিল না। ভগবান আমাদের শোনালেন–

''চল্লিশ বছর আগে, বোধহয় 1906 সালে যখন 'পাচিয়াম্মান কোয়েলে' ছিলাম তখন আমার একটা মালয়ালাম গামছা ছিল। কেউ দিয়েছিল। কাপড়টা পাতলা ছিল, দু'মাসের মধ্যে জাল জাল হয়ে গেল, দু'এক জায়গায় ছিঁড়েও গেল। পলনীস্বামী তখন শহরে ছিল না। আমায় তখন রাঁধাবাড়া সাংসারিক কাজও করতে হত। হাত পা মুছতাম, গামছা রঙবেরঙের হয়ে গিয়েছিল। গায়ে চাপা দিলে পাছে সবাই গামছার অবস্থা দেখে ফেলে সেজন্যে দলা পাকিয়ে হাতের কাছে রাখতাম। আমার আর কী? কাজ তো চলে যাচ্ছিল। স্নানের পর শুকিয়ে বেশ যত্ন করে লুকিয়ে

রাখতাম পাছে কেউ দেখে ফেলে। একদিন শুকাবার সময়ে একটি দুষ্টু ছেলে সেটা দেখে ফেললে আর বললে, 'স্বামী, স্বামী, রাজ্যপালের এই গামছাটা চাই। তিনি আমায় নিয়ে যেতে বলেছেন। দয়া ক'রে আমায় দিন।' এই বলে দুষ্টামি ক'রে হাত পাতলে। আমি বললাম, 'হায় ঈশ্বর, এই গামছা। না, আমি দিতে পারব না, তুমি চলে যাও।'

''ক্রমশঃ গামছাটা আরও ছিঁড়ে গেল। পাছে শেষ আইয়ার বা অন্য কেউ দেখে ফেলে সেজন্য শতচ্ছিদ্র গামছাটা আর সঙ্গেও রাখতাম না। স্নান ক'রে শুকিয়ে মন্দিরের একটা গাছের কোটরে লুকিয়ে রাখতাম। একদিন আমি অন্য কোথাও গেলে শেষ আইয়ার আর অন্যেরা কিছু খুঁজতে গিয়ে গাছের কোটর থেকে গামছাটাও পেয়ে গেল। গামছার অবস্থা দেখে নিজেদের অবহেলার জন্য খুবই আক্ষেপ হল আর আমি ফিরে এলে বার বার ক্ষমা চাইতে লাগল। আমি 'কী হল?' জিজ্ঞাসা করলে তারা বললে, 'এই শতচ্ছিন্ন গামছা দিয়ে আপনি স্নানের পর গা মোছেন! ছি, ছি, এই কি আমাদের সেবা! আমরা এইটুকুও দেখতে পাইনি!' এই বলে তারা কয়েক গোছা গামছা এনে দিল।

''এর আগেও কিছু ঘটেছিল। আমার কৌপীন ছিঁড়ে গিয়ে ছিল। সাধারণতঃ আমি নিজের জন্য কিছু চাই না। যাই হোক শালীনতা তো বজায় রাখতে হবে। কৌপীন সেলাই করার জন্য ছুঁচসূতা কোথায় পাব? শেষে একটা কাঁটার পিছনে ফুটো ক'রে আর কৌপীন থেকে একটা সূতা নিয়ে সেটা সেলাই করলাম আর এমনভাবে পরতাম যে সেলাইটা যেন দেখা না যায়। এই ভাবে দিন কেটে যেত। আমাদের আর প্রয়োজন কতটুকু? সে সবদিন এই রকম ছিল!'' ভগবান শেষ করলেন।

তিনি বেশ সহজভাবে গল্প বললেন কিন্তু আমরা যারা শুনলাম দুঃখে অভিভূত না হয়ে পারিনি। এই গল্পগুলো শুনে কিছুদিন আগে মুরুগনার একটা কবিতা লেখে, তার মূলভাবটা এই রকম–

ও বেঙ্কটরমণ! বৃক্ষের কণ্টকে যার কৌপীন সীবন,
সহস্রাক্ষ ইন্দ্র, গাত্রমার্জনী হয়ে যারে করিল সেবন॥

* * *

20শে ফেব্রুয়ারি, 1946

(37) সশরীরে মোক্ষ লাভ

সপ্তাহ খানেক আগে আশ্রমে নবাগত একজন জানতে চাইলে ''সশরীরে কি মোক্ষ লাভ হয়?'' ভগবান বললেন, ''মোক্ষ কী? কে লাভ করে? বন্ধন থাকলে, তবেই তো মোক্ষ? কার এই বন্ধন?'' প্রশ্নকারী বললে, ''আমার'', তাতে ভগবানের উত্তর হল, ''সত্যকারের তুমিটা কে? তোমার বন্ধন হল কী করে? আর কেন-ই বা হল? তুমি যদি প্রথমে এগুলো জানো তারপর আমরা সশরীরে মোক্ষ লাভ হয় কি না ভেবে দেখব।'' এ প্রশ্নের উত্তর না দিতে পেরে সে চুপ করে রইল আর কিছুক্ষণ বাদে চলে গেল।

সে চলে যেতে ভগবান করুণাপূর্ণ নয়নে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, ''অনেকেই এরকম প্রশ্ন করে। তারা এই শরীরেই মোক্ষ পেতে চায়। আজকাল বলে নয়, আগেও এরকম সঙ্ঘ ছিল যারা 'কায়কল্প ব্রত' বা এইরূপ কিছু করত যাতে শরীর বলবান ও অবিনশ্বর হয়। শিষ্যদের শিক্ষা দিত, বই লিখত, এসব বলে কয়ে, এইসব করে আর এ সম্বন্ধে গাদা গাদা বই লিখে তারাও সময় হলে মারা গেল। গুরু যিনি চির-যৌবন সম্বন্ধে বললেন, প্রচার করলেন তাঁরই যদি এই অবস্থা তাহলে শিষ্যদের আর কী হবে? আমরা যা দেখছি সেটার পর-মুহূর্তে কী হবে তাই জানি না। আত্মজ্ঞানের দ্বারা আমি শরীর নই বোধ আর বৈরাগ্যের দ্বারা তার ওপর মমতা না কেটে গেলে শান্তি হয় না। শান্তি লাভ করাই মোক্ষ। যেখানে শরীরটাকেও আত্মা অনুভব না হলে শান্তি হয় না সেখানে কেবল

শরীরটাকে অনন্তকাল রাখার চেষ্টা আরও বন্ধনেরই সৃষ্টি করে। এ সব ভ্রম।''

* * *

21শে ফেব্রুয়ারি, 1946

(38) চিরঞ্জীবী

বাদবল্লী রামশাস্ত্রী সেদিন এসেছিল, সে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলে, ''স্বামী, লোকে বলে যে আত্মা কোটি সূর্যের মতো উজ্জ্বল, এ কি সত্য?'' ভগবান বললেন, ''নিশ্চয়! ধরে নিলাম যে এর প্রভা কোটি সূর্যের মতো কিন্তু কী দিয়ে দেখবে? এই চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ একটিমাত্র সূর্যও দেখা যায় না তবে কোটি সূর্য দেখবে কী করে? তাহলে বলতে হয় অন্য চক্ষু আর দৃষ্টিও অন্য। যখন সেই চোখ দিয়ে দেখবে তখন কোটি সূর্য, কোটি চন্দ্র যা ইচ্ছা নাম দিতে পারো।''

কিছুদিন আগে আর একজন এই রকম প্রশ্ন করেছিল, ''অশ্বত্থামা বিভীষণ আরও কয়েকজন চিরঞ্জীবী। আর তাঁরা কোথাও আছেন বলা হয়, এ কি সত্য?'' ভগবান বললেন, ''হাঁ, সত্য। চিরঞ্জীবী বলতে তুমি কী বোঝ? যারা নিজেদের অমর অবস্থাটা জানে তাদের জন্মই বা কোথায় আর মৃত্যুই বা কোথায়? তারা সর্বস্থানে ও কালে চিরঞ্জীবী হয়ে থাকে। আমরা এখন তাদের কথা বলছি তারা এখানেই রয়েছে। যখন কাউকে অমর বলা হয় তার অর্থ এই নয় যে তাদের পাঞ্চভৌতিক দেহটা থাকে। যখন ব্রহ্মকল্পও (ব্রহ্মার যুগ) খেলা ঘরের মতো ভেঙ্গে যায় তখন শরীর আর চিরস্থায়ী কী করে হয়?''

* * *

26শে ফেব্রুয়ারি, 1946

(39) উমা

এই চিঠিগুলো লেখা আরম্ভ করার আগে একদিন সকালে পুরাণ সম্বন্ধীয় কথায় একজন ভক্ত পার্বতীর 'উমা' নাম হওয়ার বিষয়ে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করে। ভগবান আমার দিকে চেয়ে বললেন, ''লাইব্রেরিতে একটা তেলুগু অরুণাচল পুরাণ আছে না?'' আমি বললাম, ''হাঁ, আছে নিয়ে আসব?'' ভগবান বললেন, ''হাঁ, হাঁ!'' আমি তৎক্ষণাৎ বইটা এনে তাঁকে দিলাম।

বইটা খুলে ভগবান বললেন, ''এই যে গল্পটা। শিবের পত্নী, দক্ষের কন্যা সতী দক্ষযজ্ঞে অপমানিতা হয়ে দেহত্যাগ করেন। পরে তিনি হিমবন্ত (হিমালয়) ও মেনকার ঘরে জন্ম নেন। শিবকে স্বামী- রূপে পাওয়ার কামনায় তিনি তপস্যা করতে যান। মেনকা তাঁকে তপস্যা করতে বারণ ক'রে বলেছিলেন উ (না) মা (ত্যাগ কর)। এই থেকে 'উমা' নাম হয়।'' এইটুকু পড়ে তিনি বইটা আমায় দিলেন। আমি বইটার পাতা ওল্টাতে লাগলাম, ভগবান মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। কারণটা আমি বুঝলাম না, কিছুক্ষণ পরে তিনি নিজেই বললেন-

''দেখ, এর মধ্যে আরও একটা কাহিনী আছে। মেনকার বারণ করা সত্ত্বেও পার্বতী তপস্যা শুরু করলেন। যখন কিছুতেই কিছু হল না, হিমবন্ত তাঁকে, শিব যেখানে দক্ষিণামূর্তিরূপে ছিলেন সেই তপোবনে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'এই মেয়েটি তপস্যা করতে চায়, আপনি একে আশ্রয় দিন।' পার্বতীকে দেখে শিব বললেন, 'এত অল্প বয়সে তপস্যা করার কী প্রয়োজন? বাবার সঙ্গে বাড়ি চলে গেলেই তো হয়?' পার্বতী বললেন, 'না, আমি যাব না।' শিব তাঁকে নিবৃত্ত করার জন্য বোঝালেন, 'আমি আমার প্রকৃতি জয় করেছি তাই তপস্যায় মন দিতে পারি। তুমি প্রকৃতির অত্যাচারে কষ্ট পাবে, বাড়ি যাও।' পার্বতীও সমান বিচক্ষণা, উত্তর দিলেন,

‘প্রভু, আপনি প্রকৃতি জয় করেছেন। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে কিছু সম্বন্ধ না থাকলে তপস্যা করেন কী ক’রে? এই যে এখন কথা বললেন– প্রকৃতি ছাড়া এটাই বা হয় কী করে? চলাফেরাই বা কী করে করেন? আপনার অজ্ঞাতে প্রকৃতি আপনার হৃদয়ে রয়েছে। যদি কেবল তর্কের খাতিরে না হয় আর যদি সত্যই আপনি প্রকৃতির ঊর্ধ্বে তবে আমার এখানে থাকাতে আপনার আপত্তি কেন?’ শিব এতে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, ‘ইঙ্গিতজ্ঞা, মধুরবচনী, আচ্ছা থাকো’, এই বলে হিমবন্তকে ফেরত পাঠালেন। গল্পটির বিস্তারিত বিবরণ এ বই–এ আছে।’’

আমি বললাম, ‘‘দাক্ষায়ণীর কাহিনী ভাগবতে আছে কিন্তু এ কথোপকথনটি নেই, এটি বেশ ভাল।’’ ভগবান হাসতে হাসতে বললেন, ‘‘ঠিক, ঠিক আমি কোথাও আর একটা কাহিনী পড়েছিলাম, সেখানে বলা হয়েছে যে মদন দহনের পর পরমেশ্বর শিব ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এসে পার্বতীকে প্রেম নিবেদন করেন ও বিবাহ করেন। হিমবন্ত জামাতার জাতি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হন। কিন্তু কী করবেন? যাকেই জিজ্ঞাসা করেন সবাই অজ্ঞতা প্রকাশ করে, কেউ তাঁকে বলতে পারলে না যে শিবের কী জাতি। সুতরাং তিনি চুপ করে রইলেন। পরে পার্বতী একদিন পরিহাস করে পরমেশ্বরের চোখে হাত চাপা দেন তার ফলে জগতে বিশৃঙ্খলা হয়, পরমেশ্বর তাঁর তৃতীয় নয়ন দিয়ে জগৎ রক্ষা করেন। পার্বতী নিজের অপরাধ বুঝে তপস্যা শুরু করেন। নানা স্থানে তপস্যা ক’রে অবশেষে এখানে আসেন আর তপস্যা ক’রে অরুণাচলেশ্বরকে সন্তুষ্ট ক’রে অর্ধনারীশ্বরত্ব লাভ করেন। হিমবন্ত একথা শুনে বলেন, ‘ও, তাই তো, জামাই দেখি অন্য জাতি নয়, আমাদেরই স্বজাতি’ আর বেশ সন্তুষ্ট ও খুশি হন। অরুণাচল একটি পাহাড় আর হিমবন্তও একটি পাহাড়।’’

* * *

11ই এপ্রিল, 1946

(40) অস্তি, ভাতি ও প্রিয়ম্

গতকাল 10টা কি 11টার সময়ে একজন পার্সি ডাক্তার একটা কাগজে কিছু লিখে ভগবানকে দিলে। ভগবান সেটা একজন ভক্তকে দিয়ে পড়ালেন ও পড়ে বললেন, ''ও প্রশ্ন ক'রে নিজেই তার উত্তরও লিখেছে। আমার আর কী বলার আছে?'' লেখাটি ইংরাজিতে হওয়ায় ঠিক বুঝতে পারি নি। পাঠকারী ভক্ত ভগবানের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ''এতে 'অস্তি, ভাতি ও প্রিয়ম্' লেখা আছে। এদের অর্থ কী?'' ভগবান বললেন, ''অস্তির অর্থ সত্য যা 'আছে'। ভাতির অর্থ প্রকাশ আর প্রিয়মের অর্থ আনন্দ। এর অর্থ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। সচ্চিদানন্দকেই অস্তি-ভাতি-প্রিয়ম্ বলা হয়। দু'টি পদগুচ্ছেরই অর্থ এক।''

সেই ভক্তটি বললে, ''আত্মার নাম রূপ না থাকায় 'জ্ঞানাতীত' ভক্তি অর্থাৎ জ্ঞানের থেকে উচ্চ ও উত্তম ভক্তির দ্বারা কি এর ধ্যান করতে হবে?'' ভগবান বললেন, ''যদি বল তুমি ধ্যান করবে তাহলে একটা দ্বৈতভাব আসে না কি? তার অর্থ একজন ধ্যান করে আর একটা ধ্যেয় বস্তু আছে কিন্তু আত্মা নাম রূপের অতীত। তাহলে নিরাকার ও নির্বিষয় বস্তুর কী ভাবে ধ্যান হওয়া সম্ভব? 'জ্ঞানাতীত' ভক্তির অর্থ হল আপন আত্মা, নামরূপরহিত কেবল সাক্ষীস্বরূপ। আপন আত্মাই চক্ষু আর এই চক্ষু সর্বব্যাপী। একমাত্র চক্ষু। তবে কী-ই বা ধ্যান করার আছে আর কে-ই বা ধ্যান করছে। এই নয়ন সর্বব্যাপী, তাকেই অস্তি ভাতি ও প্রিয়ম্ বা সচ্চিদানন্দ বলে। নাম বহু হতে পারে কিন্তু বস্তুটা এক।''

* * *

15ই এপ্রিল, 1946

(41) প্রদক্ষিণের বৈশিষ্ট্য

আজ আমাদের কী শুভদিন জানো? আজ ভগবান আমাদের একটা অপূর্ব জিনিস শেখালেন। যবে থেকে এখানে এসেছি প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় তিনবার হলঘরটি প্রদক্ষিণ ক'রে ভগবানকে প্রণাম করা আমার অভ্যাস।

আজ সকালে যখন অভ্যাসমত প্রদক্ষিণ করছিলাম বংশীধ্বনির মতন ভগবানের মুখ থেকে দৈববাণী হল। আশ্চর্য হয়ে জানলা দিয়ে সোফার দিকে চাইলাম। প্রভাতি সূর্যের আলোকে এক অদ্ভুত দ্যুতিময় তাঁর শরীর। ডাঃ শ্রীনিবাস রাও একটা মলম দিয়ে তাঁর পা মালিশ করছেন। একটা হাল্কা হাসি তাঁর মুখে। ''ও কে নাগম্মা! আমি ভেবেছি অন্য কেউ,'' ভগবান বললেন। মনে হল তিনি আমায় আরও কিছু বলবেন, তাই ঘরে ঢুকে প্রণাম করলাম। হেসে বললেন, ''বেশ! তুমিও অন্যদের মতো প্রদক্ষিণ করা শুরু করেছ, তাই না? ক'বার প্রদক্ষিণ কর?'' ক'বার জিজ্ঞাসা করাতে আমি বেশ আশ্চর্য হলাম, বললাম, ''তিনবার।'' ''তাই নাকি? তোমার দেখাদেখি অন্যরাও করে। সেই তো বিপদ। তাদের বারণ করেছি। তোমাকেও বলছি। তুমি কী বল?'' ''আমি আর কী বলব? যদি বারণ করেন তবে আর করব না,'' বলে বসে পড়লাম। আমার দিকে চেয়ে ভগবান বললেন, ''দেখ, এরা হলঘর প্রদক্ষিণ করেই চলেছে, তার আর শেষ নেই। গতকাল এদের বারণ করেছি। এরা বলবে 'নাগম্মাও প্রদক্ষিণ করে তাহলে তাকেও কি বলতে হবে না?' তোমাকে প্রদক্ষিণ করতে দেখে নবাগতেরা ভাববে লোকে মন্দিরে যেরূপ করে এখানেও সেরূপ করা উচিত। তাই জন্য তোমায় বলছি।'' তারপর আমাদের সবাইকে বললেন–

''প্রদক্ষিণের তাৎপর্য কী? শঙ্কর বলেছেন–

পরিভ্রমন্তি ব্রহ্মাণ্ডাঃ সহস্রাণি মহেশ্বরে।
কূটস্থাখিল রূপেহস্মিন ইতি ধ্যানং প্রদক্ষিণম্।

''অখিল রূপের অন্তরে যে মহেশ্বর রয়েছেন, তাঁকে সহস্র ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করছে, এইরূপ ধ্যানই প্রকৃত প্রদক্ষিণ।''

''এই ভাবটি আরও বিস্তারিতভাবে ঋভুগীতার তামিল অনুবাদে আছে'' বলে ভগবান বইটি আনিয়ে প'ড়ে সবাইকে বললেন–

''হে ঈশ্বর! তোমায় প্রদক্ষিণ করতে জগৎ ভ্রমণ করলাম, দেখি যে তুমি পূর্ণরূপে সর্বত্র বিরাজমান তবে আর কী করে পরিভ্রমণ হবে? তাই তোমায় 'কূটস্থা অখিলরূপে' উপাসনা করি। এই তোমার প্রদক্ষিণ। নমস্কারের অর্থও তাই। মনকে আত্মায় মিলিয়ে দেওয়াই নমস্কার। যেতে আসতে যখন তখন হাঁটু গেড়ে বসে মাটিতে মাথা ঠেকালেই নমস্কার করা হয় না।''

ডাঃ শ্রীনিবাস রাও বললেন, ''আপনি যে প্রদক্ষিণ ও নমস্কারের কথা বললেন সেটা 'অতীতস্থিতি' অর্থাৎ যারা অতি উচ্চ অবস্থায় রয়েছেন তাদের জন্য কিন্তু আমাদের মতো লোকেরা কি গুরুকে প্রণাম করবে না? বলা হয়েছে তিন লোকে অদ্বৈতভাব হলেও গুরুর কাছে নয়।''

ভগবান বললেন, '''হাঁ, তা ঠিক। অদ্বৈত ভাবের অর্থ এ নয় যে তুমি নমস্কার ইত্যাদি করবে না। বাড়াবাড়ি করবে না। অদ্বৈত কেবল ভাবে, মনের ভাবে, সাংসারিক বিষয়ে অদ্বৈত ভাব হলে চলবে না। সমদৃষ্টিতে সবকিছু দেখতে বলা হয়েছে তা বলে কুকুর যা খায় আমরা কি তা খেতে পারি? একমুঠো চালে পাখিদের হয়, আমাদের কি হবে? আমরা যা খাই তাতে কি একটা হাতির হবে? সুতরাং অদ্বৈত কেবল মনের ভাবে কিন্তু অন্য বিষয়ে সংসারে আর পাঁচজন যেমন চলে তেমন। জ্ঞানীর কোন সুখ দুঃখ নেই কিন্তু অন্যদের জন্য তিনি সবই করে যান। তাঁদের ভাব অনেকটা

যারা পয়সা নিয়ে বুক চাপড়ে চিৎকার ক'রে কান্নাকাটি করে তাদের মতো। ব্যস্। এতে তাঁদের কিছু হয় না।''

একজন জিজ্ঞাসা করলে, ''পয়সা নিয়ে বুক চাপড়ে কাঁদা কী রকম?'' ভগবান বললেন, ''আগে এরকম প্রথা ছিল। মনে কর, একজন বয়স্ক লোক মারা গেল তার জন্য কেউ শোক প্রকাশ করতে চায় না, তখন কী হবে? মারা গেলে কারও তো শোক প্রকাশ করা উচিত। এটাই রীতি। তখন ভাড়া করা কাঁদুনে পাওয়া যেত যাদের এটাই ব্যবসা। তাদের ডাকলে তারা আত্মীয়-স্বজনদের থেকে সুষ্ঠুভাবে কান্নাকাটি করতে পারত। যেমন লোকে কত রকম ভাবে ভজন গায়, তেমনি বুক চাপড়ে হয় অনেক অভ্যাসের ফলে কিংবা চোখে পেঁয়াজের রস দিয়ে অঝোরে কেঁদে পালাটা শেষ করত। এই মতো জ্ঞানীও পরের ইচ্ছায় কাজ করেন। যেমন সুর বাজানো হয় জ্ঞানী সেইমত তাল দিয়ে যান। তিনি পূর্ণ অভিজ্ঞ বলে তাঁর কাছে কিছুই নূতন নয়। যে ডাকে সেখানে যান। যা সাজতে হয় তাই সাজেন। তাঁর কোন ইচ্ছা না থাকায় সবই পরের জন্য। লোকেদের কামনা অনুসারে তাঁদের কাজ হয়। অতএব কোন্ কাজটা ভাল আর কোন্টা মন্দ বেশ ভাল ক'রে ভেবে দেখা উচিত।''

আগে ভগবান যখন অন্তরঙ্গ ভক্তদের ''এটা কেন হল? ওটা কেন হল না?'' বলতেন তখন আমার মনে খুব আক্ষেপ হত কই ভগবান আমাকে তো কখনো এরকম ঘরোয়া ভাবে কিছু বলেন না! আজ ক্ষোভ মিটল। শুধু তাই না, আমি একটা উপদেশ বা দীক্ষা লাভ করলাম। শ্রীভগবানের বাণী যেন বলছে, ''যখন আমি পূর্ণরূপে সর্বত্র বিরাজিত রয়েছি তখন প্রদক্ষিণ করো কী করে? আমি কি মন্দিরের পাথরের মূর্তি যে তুমি বার বার প্রদক্ষিণ করে চলেছ?''

* * *

20শে এপ্রিল, 1946

(42) অভয়ম্ সর্বভূতেভ্যঃ

আজ সকালে ভগবান যখন পাহাড়ে বেড়াতে যান তখন পাহাড়ে ওঠার সিঁড়ির কাছে গাছ থেকে আম পাড়া হচ্ছিল। কর্মীরা গাছে উঠে একটি একটি ক'রে আম না পেড়ে বাঁশ দিয়ে ঠেঙ্গিয়ে আম পাড়ছিল। ঠেঙ্গানোর চোটে গাদা গাদা পাতাও পড়ে ছিল। গাছ ঠেঙ্গানোর শব্দ শুনে সোফায় বসেই ভগবান লোক দিয়ে বারণ করে পাঠালেন। পরে যখন সেই পথে বেড়াতে গেলেন সেই পাতার স্তূপের করুণ দৃশ্য দেখে না থাকতে পেরে কঠোর স্বরে কর্মীদের বললেন, ''খুব হয়েছে! এখন যাও! ফল পাড়তে হবে বলে কি গাছ ঠেঙ্গিয়ে সব পাতাও ঝরাতে হবে? ফল দেওয়ার বদলে গাছেদের এইরকম মার দেওয়া? কে তোমাদের এ কাজ দিয়েছে? এরকম না ঠেঙ্গিয়ে কেটে ফেললেই হয়। আর আম পাড়তে হবে না, চলে যাও!''

ভগবানের বজ্রকঠোর কণ্ঠস্বর সবার কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, সবাই ভয়ে কাঁপতে লাগল। গাছ থেকে বাঁশগুলো নামিয়ে মাটিতে রাখা হল। কর্মীরা হাত জোড় ক'রে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। তাদের গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। প্রকৃতির প্রতি করুণার প্রতিমূর্তিকে রুদ্ররূপে দেখে আমার বুক দুর্ দুর্ করতে লাগল, চোখে জল এসে গেল। যিনি গাছের পাতা ভাঙ্গা দেখে এত বিচলিত হন তিনি আমাদের দুঃখ কষ্টে না জানি কত কষ্ট পান? সত্যই ভগবান রমণ 'করুণাপূর্ণ সুধাব্ধি'– কারুণ্যামৃত পারাবার।

গোশালার দিক থেকে ফিরে আসার আগেই ভক্তরা সব পাতা জড়ো করলে আর অপরাধ করার জন্য ভগবানের কাছে ক্ষমা চাইলে। ভগবান ঘরে যেতে যেতে বললেন, ''কী নিষ্ঠুর! দেখ কীরকম ঠেঙ্গিয়েছে, কত পাতার গাদা হয়েছে! ও হো!''

ভগবান যখন বিরূপাক্ষ গুহায় ছিলেন, এচম্মা নিজের ঘরে ভগবান ও শেষাদ্রিস্বামীর ছবি প্রতিষ্ঠা ক'রে একলক্ষ তুলসীপাতা দিয়ে অর্চনা করার সংকল্প ক'রে ভগবানকে জানালে। পঞ্চাশ হাজার হতে না হতে গ্রীষ্মকাল এসে গেল, সব পাহাড় খুঁজেও আর তুলসীপাতা পেল না। ক্লান্ত হয়ে ভগবানের কাছে দুঃখ নিবেদন করলে। ভগবান বললেন, ''পাতা না পেলে নিজেকে চিমটি কেটে পূজা করো না?'' সে বললে, ''ব্যথা লাগবে না!'' ভগবান বললেন, ''চিমটি কাটলে ব্যথা লাগে আর পাতা ছিঁড়লে গাছের লাগে না?'' তার মুখ শুকিয়ে গেল, সে বললে, ''স্বামী, আগে বলেন নি কেন?'' তিনি উত্তর দিলেন, ''চিমটি কাটলে লাগে জানো আর গাছের পাতা ছিঁড়লে গাছের লাগে জানো না? সেটাও কি আমায় বলে দিতে হবে?''

গাছের পাতা ছেঁড়া যে উচিত নয় তা 'দেবিকালোত্ত'র স্তোত্রের জ্ঞানাচার বিচার পটলেও লেখা আছে–

ন মূলোৎপাটনং কূর্যাৎ পত্রচ্ছেদং বিবর্জয়েৎ।
ভূত পীড়াং ন কূর্বীত পুষ্পানাং ন নিকৃন্তনম্॥

(মূল উৎপাটন করো না। পত্রচ্ছেদ করো না। প্রাণীর পীড়া উৎপাদন করো না। পুষ্পচয়ন করো না।)

* * *

23শে এপ্রিল, 1946

(43) যা আছে তা এক

আজ অপরাহ্নে একজন মুসলমান যুবক তার দু'তিন জন বন্ধুর সঙ্গে এখানে এসেছিল। সে যেভাবে এসে বসল তাতে মনে হচ্ছিল কিছু জিজ্ঞাসা করবে। কিছুক্ষণ পরে সে তামিলে প্রশ্ন শুরু করলে, ''আল্লাকে কী করে জানা যাবে? তাঁকে দেখাই বা যাবে কী করে?'' এই তার প্রশ্নের

সারমর্ম। অভ্যাসমত ভগবান বললেন, ''প্রথমে যে প্রশ্ন করছে তাকে জানলে তারপর আল্লাকে জানতে পারবে।''

যুবকটি আবার বললে, ''আমি যদি এই লাঠিকে আল্লা ভেবে ধ্যান করি, আল্লার দেখা পাব? কী করে আল্লার দেখা পাব?'' ভগবান বললেন, ''যা অবিনশ্বর সত্য তাকেই আল্লা বলা হয়। প্রথমে নিজের প্রকৃত স্বরূপ খুঁজে পেলে আল্লার প্রকৃত পরিচয়ও প্রকাশ পাবে।'' ছেলেটিকে থামিয়ে দেওয়ার পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। সে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে প্রস্থান করলে। তারা চলে যেতেই, ধারেপাশে যারা ছিল তাদের দিকে চেয়ে ভগবান মন্তব্য করলেন, ''দেখ, ও আল্লাকে দেখতে চায়! এই চোখ দিয়ে কি দেখা যায়? এ চোখ কী করে দেখবে?''

গতকাল একজন হিন্দু জিজ্ঞাসা করেছিল, ''অওঁকার কি ঈশ্বরের নাম?'' ভগবান বললেন, ''অওঁকারই ঈশ্বর, ঈশ্বরই ওঁকার। তার অর্থ ওঁকারই স্বরূপ। আবার কেউ বলে স্বরূপই ওঁকার। কেউ শক্তি নাম দেয়, কেউ বলে ঈশ্বর, কেউ যিশু আর কেউ আল্লা। যে যাই বলুক বস্তুটা কিন্তু এক।''

চার পাঁচদিন আগে, পূর্বে বলা কোনো উত্তর স্মরণ ক'রে একজন আশ্রমিক জিজ্ঞাসা করলে, ''আপনি বলেন আনন্দও লয় হয়ে যায়, তবে ধ্যান, সমাধি ও সমাধানের অর্থ কী?'' ভগবান বললেন, ''লয় শব্দের কী অর্থ? আনন্দ লাভ করে থামলে চলবে না। সেটি উপভোগ করার জন্যও কেউ থাকে। তাকে জানতে হবে না? সেটা না জানা পর্যন্ত ধ্যান হয় কী করে? যে আনন্দ উপভোগ করে তাকে যদি জানো, সেই আত্মা। যখন একজন স্বময় হয়ে যায়, তখন ধ্যান হয়। ধ্যানের অর্থ একজনের নিজের আত্মা হয়ে যাওয়া। সেই সমাধি। তাকেই সমাধান (ধ্যেয় বস্তুতে অর্থাৎ পরমাত্মাতে পূর্ণরূপে তাদাত্ম্য হওয়া) বলে।''

* * *

27শে এপ্রিল, 1946

(44) কালো গরু

তিনদিন হল গোশালার কালো গরুটি অসুস্থ, তাকে বাছুরদের চালার কাছে একটা গাছের তলায় বেঁধে রাখা হয়েছে। যদিও গরুটি তিনদিন অসুস্থ তবু ভগবান তাকে দেখতে যাননি। গতকাল তার শেষ সময় ঘনিয়ে এল। সকাল থেকেই খারাপ ছিল কিন্তু বেলা পাঁচটার আগে প্রাণ বেরুল না। ভগবান বিকাল 4টা 45 মিনিটে নিয়মমত গোশালার পিছনে (শৌচালয়ে) যাওয়ার জন্য উঠলেন। ফেরার পথে ঘুরে যেদিকে গরুটি রয়েছে সেই চালার দিকে গেলেন আর একটুক্ষণ তার মৃত্যু যন্ত্রণা দেখলেন। তার অবস্থা দেখে করুণাঘনমূর্তি ভগবানের হৃদয় বিগলিত হল। তিনি যেন দৃষ্টি দিয়ে গরুটির বন্ধনমুক্তিরূপ কৃপা করলেন আর ফিরে এসে অভ্যাসমতো সোফায় বসলেন।

তাঁর কৃপা-কটাক্ষ পড়ার পর গরুটির প্রাণ আর মাত্র পাঁচ মিনিট ছিল। যেন এতক্ষণ এই দৃষ্টিটুকুর অপেক্ষায় ছিল। যেই সেটি পেল অমনি চলে গেল। কথিত আছে, মৃতুকালে ঈশ্বর স্মরণ হলে মুক্তি হয়। আহা, গরুটি কী ভাগ্যবতী, মৃত্যুকালে সে শ্রীভগবানের কৃপাময় পুণ্যদৃষ্টি লাভ ক'রে বন্ধন মুক্ত হল! ভগবান আমাদের অনেকবার বলেছেন যে অনেক জীবজন্তু কয়েকদিন কষ্ট পেলেও তাঁর তাদের দেখবার কথা মনে হয় না, আবার কখন কোন ক্ষেত্রে তাদের মৃত্যু সময়ে হঠাৎ তাদের দেখবার কথা মনে হয়েছে। আর সেই সব ক্ষেত্রে জীবটি একটু পরেই শান্তিতে প্রাণ ত্যাগ করেছে। এরূপ একটা ঘটনা আমি এখন দেখলাম।

* * *

2রা মে, 1946

(45) পরাৎপর রূপম্

আজ অপরাহ্নে কয়েকজন আন্ধ্র স্ত্রীলোক ও পুরুষ কিছুক্ষণের জন্য ভগবানের সান্নিধ্যে থেকে চলে গেল।

তাদের মধ্যে একজন হাতজোড় ক'রে ভগবানকে বললে, ''স্বামী, আমরা রামেশ্বর ও অন্যান্য অনেক তীর্থের দেবদেবী দর্শন ক'রে এলাম। আমরা 'পরাৎপর রূপ'টি কী জানতে চাই। দয়া করে আপনি আমাদের বলুন।''

ভগবান হেসে বললেন, ''তাই নাকি? যা বললে তাই। তোমরা নিজেরাই বলছ যে সব দেবদেবী দর্শন ক'রে এসেছ। যিনি সবার মধ্যে এক এবং তাদেরও ছাপিয়ে, সেটিই 'পরাৎপর রূপ'। তার অর্থ– পরমের রূপ। এত মন্দির দেখে তোমাদের মনে হয়েছে যে এসব দেবদেবীর মূল উৎস কী? যদি তোমরা সব মন্দির না দেখতে তাহলে কি এই প্রশ্ন জাগত?'' ভগবানের মুখের দিকে চেয়ে মনে হল 'পরাৎপর রূপটি' যেন তাঁর মুখে খেলছে। সেই আনন্দময় দিব্যদ্যুতি দেখার মতো! যদিও কথাগুলো ছেলেটির হৃদয়ঙ্গম হল না তবু ভগবানের করুণাঘন দৃষ্টিতে সে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রে সদলে চলে গেল।

তারা চলে গেলে ভগবান উৎসাহ ভরে কাছের একজন ভক্তকে বললেন, ''দেখ, প্রকৃত অর্থটি কথার মধ্যেই আছে। 'পরাৎপর রূপম্'– এর অর্থ সেই রূপ বা আকার যা পরম হতে পরমতম, শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠতম। প্রশ্নের অর্থই জানা নেই। অর্থ জানা থাকলে প্রশ্নতেই উত্তর রয়েছে।''

* * *

11ই মে, 1946

(46) সামাজিক অবস্থানের নীতি

গতকাল সকাল 9টা 45 মিনিটের সময়ে ভগবান বাইরে থেকে ফিরে আসছেন, সে সময়ে আশ্রমের একটা কুকুর বাইরের অন্য একটা কুকুরকে দেখে খুব ঘেউ ঘেউ করছিল আর তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। সবাই যখন কুকুরটাকে থামাবার চেষ্টা করছিল তখন ভগবান হাল্কাসুরে বললেন, ''এ ব্যবস্থা সব জায়গায়, যারা আগে তারা নবাগতদের ওপর কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করে। এই কুকুরটা সেই চেষ্টা করছে।'' এই বলে আশ্রমের কুকুরের দিকে চেয়ে বললেন, ''চেঁচাচ্ছ কেন? চলে যাও।'' সেও যেন কথা বুঝলে আর চলে গেল।

আজ সকাল 10টার সময়ে ডাঃ অনন্তনারায়ণ রাও ও তাঁর স্ত্রী রমাবাঈ তাঁদের বাগানের কিছু ভাল আম এনে ভগবানকে দেওয়ার সময়ে বললেন, ''বাঁদরে সব আম নিয়ে যাচ্ছে তাই এগুলো তাড়াতাড়ি পেড়ে নিয়ে এসেছি।'' ভগবান হেসে বললেন, 'ও তাই নাকি, বাঁদর ওখানেও যাচ্ছে?'' তারপর সবার দিকে চেয়ে বললেন, ''হাঁ, বাঁদর নিলে একটা একটা করে নেয় আর মানুষে সব এক সঙ্গে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, এটা কেন তবে বলবে এটা তাদের অধিকার। বাঁদরেরা যদি চুরি করে তো মানুষ করে ডাকাতি। এ কথা না ভেবে তারা আবার বাঁদর তাড়ায়।''

* * *

28শে মে, 1946

(47) কোনটা গাড়ি?

আমাদের দাদার ছেলেমেয়ে স্বর্ণ ও বিদ্যা আদি অপ্পামলই দুর্গাম্বা ও অন্যান্য মন্দির দেখতে চাইল। তাই গতকাল সকালে ভগবানের অনুমতি নিয়ে আমরা সবাই যাত্রা করলাম। গ্রীষ্মের গরমে দশ বারো বছরের বাচ্চারা

প্রদক্ষিণের সবটা পথ হাঁটতে পারবে কি না ভেবে একটা গরুর গাড়ি ঠিক করেছিলাম। গাড়ি দেখে আরও কয়েকজন সমবয়স্ক কিংবা ছোট ছেলেমেয়ে আমাদের সঙ্গে চলল। আমরা প্রদক্ষিণের রাস্তায় সব দর্শনীয় দেখে বেলা সাড়ে এগারোটার সময়ে ফিরে এলাম।

বিকাল তিনটার সময়ে হলঘরে গেলে ভগবান জানতে চাইলেন, ''কখন ফিরলে?'' বললাম সাড়ে এগারোটার সময়ে, তাতে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ''বাচ্চারা হাঁটতে পারল?'' আমি বললাম গরুর গাড়িতে গিয়েছিলাম। ভগবান পরিহাস করে বললেন, ''ও, তাই নাকি, গাড়িতে গিয়েছিলে? পুণ্যটা কার হল, গাড়ির না বলদদের না ছেলেমেয়েদের?'' আমি উত্তর দিতে পারলাম না। ভগবান বললেন, ''এই শরীরটা একটা গাড়ি। গাড়ির জন্য আবার একটা গাড়ি আর সেই গাড়ির জন্য বলদ জোতা হয়। এরকম কাজ ক'রে (প্রদক্ষিণ করে) লোকে বলে 'আমরা ক'রে এলাম', সবই এই রকম। লোকে ট্রেনে করে মাদ্রাজ থেকে এসে বলে 'আমরা এলাম', শরীর সম্বন্ধেও তাই। আত্মার গাড়ি শরীর। পা দু'টি হাঁটার কাজ করে, লোকে বলে 'আমি হাঁটলাম, আমি এলাম', আত্মাটা কোথায় গেল? আত্মা কিছুই করে না তবু সব কাজগুলো নিজেতে আরোপ করে।'' এই বলে জানতে চাইলেন, ''তারা কি কিছুটা অন্ততঃ হেঁটেছিল?'' বললাম তারা গৌতম আশ্রম অবধি ভজন গাইতে গাইতে গিয়েছিল তারপর রৌদ্রের তেজের জন্য আর যেতে পারে নি। ভগবান বললেন, ''যা হোক কিছুটা অন্ততঃ হল, তবু তো কিছুটা হেঁটেছিল।''

তুমি তো জানো, বিদ্যার দুষ্টামি আছে। যখন থেকে এসেছে কেবল ভগবানের সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রে যাচ্ছে, ''ভগবানদাদু কোথাও যান না? কেন যান না?'' আমার উত্তরে খুশি না হয়ে 24শে সে নিজেই ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলে কেন তিনি কোথাও যান না। তুমি তো জানো ভগবান ছোটদের সঙ্গে কথা বলতে কত ভালবাসেন। তার দিকে স্নেহমাখা দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, ''তুমি আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে চাও? তোমার

এই ইচ্ছা তাই না? সে তো বেশ কথা কিন্তু আমি গেলে এরা সবাই আমার সঙ্গে যাবে আর রাস্তায় কত লোক তাদের বাড়ি নিয়ে যেতে চাইবে। আমি যদি না যাই, তারা কি শুনবে? না, জোর ক'রে ধরে নিয়ে যাবে। আবার সেখান থেকে অন্যেরা শুরু করবে। তুমি কি সবাইকে নিয়ে যেতে পারবে? কেবল লোকেরা নয়, আমি যদি যেতে আরম্ভ করি সব অরুণাচল পাহাড়ও চলতে শুরু করতে পারে? তুমি এদের কী করে নিয়ে যাবে? দেখ, আমাকে কয়েদ করে রাখা হয়েছে, তুমি যদি আমায় নিয়ে যেতে শুরু কর রাস্তায় আরও অন্য কেউ আবার অন্য একটা কয়েদখানায় ভরবে। আমি কী করতে পারি? কী করে যাই, বলো? এরা কি আমায় যেতে দেবে? তুমি কী বলো?'' বিদ্যা উত্তর দিতে পারলে না। সেদিন থেকে ভগবানও বলতে লাগলেন, ''এ মেয়েটি আমাকে তার ওখানে নিয়ে যেতে চাইছে।''

গতকাল পৌনে দশটার সময়ে বাইরে যাওয়ার পথে ছেলেমেয়েরা বাড়ি ফিরে যাবে শুনে আর বিদ্যাকে দরজার কাছে দাঁড়ানো দেখে ভগবান তার হাতটি ধরে বললেন, ''খুকি, তুমি আমায় তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে? একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে যাও।'' যাওয়ার আগে বিদ্যা ভগবানের একটা ফোটো নিয়ে গিয়ে তাঁকে দেখাল। ফোটো দেখে ভগবান বললেন, ''তুমি তো আমায় নিয়েই যাচ্ছ। ভাল ক'রে বেঁধে গাড়িতে চাপিয়ে দাও।'' কাছে যারা ছিল সবাই শুনে খুশি হল, বিদ্যাও মহানন্দে নাচতে লাগল আর বলতে লাগল, ''এই দেখ, আমি ভগবানদাদুকে নিয়ে চলে যাচ্ছি।''

কে? কোথায় কে যায়? গাড়িই বা কী? কয়েকদখানা-ই বা কী? সব পাহাড় যদি চলতে আরম্ভ করে তবে কী করে তাকে থামানো যাবে? এসবই সমস্যা!

* * *

3রা জুন, 1946

(48) জপ, তপ ও অনুরূপ বিষয়

গতকাল একজন ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ এসেছিলেন। তাঁর চেহারা ও গলার রুদ্রাক্ষের মালা দেখে মনে হল তিনি মন্ত্র জপ করেন। তিনি ভগবানের বিরূপাক্ষ গুহায় থাকাকালে একবার তাঁকে দর্শন করেছিলেন বললেন। আজ ভগবানের কাছে গিয়ে বললেন, ''স্বামী, অখণ্ড 'পঞ্চাক্ষরী' বা 'তারক নাম' জপ করলে কি মদ্যপান বা ওইরূপ পাপস্খালন হয়?'' ভগবান বললেন, ''তোমার কী ধারণা?'' ব্রাহ্মণ আবার একই কথা জিজ্ঞাসা করলেন, ''ওই সব জপ করলে, ব্যাভিচার, চুরি ও মদ্যপান ইত্যাদির পাপ কি স্খালন হয়, কিংবা পাপ তাদের লেগেই থাকে?''

ভগবান বললেন, ''যদি 'আমি জপ করছি' বোধটা না থাকে, তবে পাপ লেগে থাকবে না। আর যদি 'আমি জপ করছি' বোধটা থাকে তবে অন্যায় কাজের পাপ লেগে থাকবে না কেন?'' ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন, ''একটা পুণ্য কাজ পাপ দূর করবে না?'' ভগবান বললেন, ''যতক্ষণ 'আমি করছি' বোধ রয়েছে ততক্ষণ ভাল মন্দ যে কোন কাজ হোক না কেন তার ফল ভোগ করতে হবে। একটা কাজ অন্য একটা কাজ দিয়ে কী করে মিটবে? যখন 'আমি করছি' বোধ চলে যাবে তখন আর কিছু ভোগ হবে না। যতক্ষণ না আত্মজ্ঞান হয় ততক্ষণ 'আমি কর্তা' বোধ কিছুতেই যাবে না। আর যার আত্মজ্ঞান হয়েছে তার আর জপের কী দরকার? তপস্যারই বা কী প্রয়োজন? প্রারব্ধবশে জীবন চলে যায়, তার আর কোনো ইচ্ছা থাকে না। প্রারব্ধও তিন প্রকারের– ইচ্ছা, অনিচ্ছা ও পরেচ্ছা। আত্মজ্ঞান হলে ইচ্ছা প্রারব্ধ নেই, কেবল অনিচ্ছা ও পরেচ্ছা থাকে। যা করে কেবল অন্যের জন্য। অন্যদের জন্য যদিও তাকে কোনো কিছু করতে হয় তবু তার ফল ভোগ করতে হয় না। কাজ যাই হোক না তাতে তাদের পাপ বা পুণ্য কিছুই হয় না। তা সত্ত্বেও তারা সংসারের প্রচলিত রীতি অনুসারেই কাজ করে যায়– আর কিছু নয়।''

যদিও ভগবান প্রশ্নকারীকে বললেন যে আত্মজ্ঞানীর ইচ্ছা প্রারব্ধ নেই কেবল অনিচ্ছা ও পরেচ্ছা প্রারব্ধ, এ সম্বন্ধে তাঁর সাধারণ মত সদ্‌বিদ্যা চত্বারিংশতে বলা আছে–

সঞ্চিত, আগামী কর্ম জ্ঞানীর নাই
প্রারব্ধ ভোগমাত্র করেন সদাই।
কথাচ্ছলে বলা কথা সত্য কোথায়?
স্বামীর মৃত্যু হলে, কে বিধবা নয়?
বহুপত্নীক হলে কে সীমন্তিনী রয়?
অহংকার সাথে সব কর্ম ক্ষয়॥

সদ্‌বিদ্যা অনুব্ধ– 33

* * *

9ই জুন, 1946

(49) সমাধি কী?

আজ অপরাহ্নে ভগবান ভক্তদের সঙ্গে নানা আলোচনার মাঝে অদ্বৈত শিক্ষা দিয়ে অনেক সময় কাটালেন। কথা আর থামে না দেখে একজন নবাগত উঠে জিজ্ঞাসা করলে, ''ভগবান, আপনি কখন সমাধিস্থ হবেন?'' সব ভক্তেরা জোরে হেসে উঠল। কিছুক্ষণ পরে ভগবান বললেন, ''ও, তোমার সন্দেহ হচ্ছে? আমি সন্দেহ মিটিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু আগে বলো তো সমাধির প্রকৃত অর্থটা কী? কোথায় গিয়ে আমরা সমাধিস্থ হব? পাহাড়ে না গুহায়? কিংবা আকাশে? সমাধি কী রকম হবে? বলো দেখি?

বেচারি লোকটি কিছু বলতে না পেরে চুপ করে বসে রইল। একটু পরে সে বললে, ''লোকে বলে, ইন্দ্রিয় ও হাত পা স্থির না হলে সমাধি হয় না। আপনার এরূপ সমাধি কখন হবে?'' ''তুমি এই জানতে চাও? তুমি ভাবছ, 'একী? এ স্বামী সর্বদা কথা বলছেন, ইনি কী রকম জ্ঞানী?' এই তো তোমার ধারণা? যদি পদ্মাসনে বসে, হাত জোড় করে, নিঃশ্বাস না

বন্ধ করা হয় তবে সমাধি হয় না। কাছে একটা গুহা থাকবে, তার ভিতর যেতে হবে, আবার বেরিয়ে আসতে হবে তবেই না লোকে বলবে, 'কী বড় সাধু'। আমাকে ওরা সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে আর বলে, 'এ কী রকম স্বামী, সব সময়ে ভক্তদের সঙ্গে কথা বলছেন আর নিত্য নিয়মিত সব করে যাচ্ছেন?' কী করা যায়? এরকম আগেও দু-একবার হয়েছে। যারা আমাকে প্রথমে 'গুরুমূর্তম' গুহায় দেখেছিল তারা পরে স্কন্দাশ্রমে সবার সঙ্গে কথা বলা ও সংসারের কাজ করা দেখে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে বলেছিল, 'স্বামী, স্বামী, দয়া ক'রে আপনার পূর্ব অবস্থায় দর্শন দিন।' তাদের ধারণা হয়েছিল যে আমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছি। আমি কী করতে পারি? সে সময়ে (গুরুমূর্তমে) ওইভাবে থাকতে হত। এখন এইভাবে থাকতে হয়। যা ঘটবার তাই ঘটে। কিন্তু তাদের মতে, না খেলে আর না কথা বললে ঠিক আছে। তাহলেই 'স্বামীত্ব' স্বতঃসিদ্ধভাবে এসে যাবে। লোকেদের এই রকম সব ভ্রম থাকে'', ভগবান বললেন।

* * *

5ই জুলাই, 1946

(50) সর্বম্ কী(সর্বভূতে আত্মদর্শন হয় কী করে?)

একজন নবাগত যুবক গত তিনদিন ধ'রে অযথা নানা প্রশ্ন ক'রে ভগবানকে ব্যতিব্যস্ত করছে। ভগবানও ধৈর্যের সঙ্গে বিশদভাবে সেগুলোর উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। আজ সকাল 9টায় সে আবার আরম্ভ করলে, ''আপনি বলেন সবই নিজের আত্মা? কী ক'রে সবই নিজের আত্মা বলে অনুভব হবে?'' ভগবান একটু বিরক্তির সুরে বললেন, ''সব বলতে কী বোঝো? তুমি কে? যদি তুমি বলতে পারো তুমি কে তারপর আর সবের কথা ভাবা যাবে। তুমি কয়েকদিন ধ'রে আমায় ক্রমাগত প্রশ্ন করে যাচ্ছ কিন্তু আমার প্রশ্ন 'তুমি কে'-র জবাব একবারও দাওনি। আগে আমায় বলো তুমি কে তারপর 'সর্বম্' কী জিজ্ঞাসা করো। তাহলে আমিও উত্তর

দেব। যদি তুমি তুমিটাকে খোঁজার চেষ্টা করো তবে এ সকল প্রশ্ন আর উঠবে না। এ চেষ্টা না করে কেবল যদি এর পর কী প্রশ্ন করব ভাবতে থাকো তাহলে এটা আবহমান কাল ধরে চলবে। প্রশ্নের আর শেষ কোনোদিনই হবে না। আত্মানুসন্ধান করে সত্য লাভ করলেই শান্তি, মনের প্রশান্তি হবে তা না ক'রে যদি কেবল এটা কী ওটা কী প্রশ্ন ক'রে যাওয়া যায় তাতে কী লাভ? এ সব ব্যর্থ চেষ্টা।''

যুবকটি আবার বললে, ''আত্মজ্ঞান লাভের জন্য গুরু ও সাধনা চাই তো?'' ভগবান বললেন, ''তোমার গুরু বা সাধনার কী প্রয়োজন? তুমি বলছ তুমি সব জানো। তবে গুরুর কী দরকার? তোমায় যা করতে বলা হচ্ছে তা তুমি করতে চাও না। গুরু কী করবেন? তুমি যদি তাঁর নির্দেশ অনুসারে চলো তবেই গুরুর সাহায্য পাওয়া যায়। তুমি সাধনার কথা বলছ। কিসের জন্য? কী ধরণের সাধনা? কত প্রশ্ন? একটা পথ ধ'রে চলতে হয়। হাজারটা সংশয় নিয়ে কী হবে? তুমি নিজে খেলে তবেই তো তোমার পেট ভরবে, না অন্যে খেলে হবে? এর কথা, ওর কথা, এ বিষয় সে বিষয় জানার জন্য সময় নষ্ট করে কী লাভ? নিজেকে ভুলে আকাশ-পাতাল খুঁজছ আর জিজ্ঞাসা করছ 'সুখ কী?' তোমার উচিত প্রথমে জিজ্ঞাসা করা, 'যে আমিটা ঘুরছে আর জিজ্ঞাসা করে বেড়াচ্ছে, সেটা কে?' কেউ যদি নিজের সম্বন্ধে এরূপ অনুসন্ধান করে তবে আর কোন প্রশ্ন জাগে না।''

ইতিমধ্যে আরও একজন প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলে, ''জীবের কর্ম এল কী করে?'' ভগবান বললেন, ''আগে জীবটা কে তা জানো তারপর তার কর্ম কী করে এল জানা যাবে। জীবের কর্ম হল কী করে? কর্ম জীবের সংশ্লিষ্ট না তার থেকে পৃথক? এ সবই চিন্তা। যদি এই বহির্মুখীন ক্রিয়াশীল মনকে অন্তর্মুখী ক'রে অন্তরে অনুসন্ধানে লাগানো যায় তবে এত সংশয়ের একটিও থাকবে না।''

* * *

12ই জুলাই, 1946

(51) মাধবস্বামীর দেহত্যাগ

প্রায় চারদিন আগে ৪ই কিংবা ৯ই সকাল সাড়ে সাতটায় ভগবানের কাছে গেলাম। প্রণাম ক'রে উঠলে ভগবান বললেন, ''মাধব চলে গেছে।'' তার মাঝে মাঝে আশ্রম ছেড়ে তীর্থ করতে যাওয়ার অভ্যাস ছিল তাই জিজ্ঞাসা করলাম, ''কোথায়?'' ভগবান হেসে বললেন, ''কোথায়? শরীরটা এখানে রেখে সেই জায়গায়।'' আমি চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করি, ''কখন?'' উত্তর দিলেন, ''পরশু সন্ধ্যা ছ'টায়'', তারপর কৃষ্ণস্বামীর দিকে চেয়ে বললেন, ''আচার্যস্বামী ওখানে ছিল, এখানে এসে মারা গেল আর যে এখানে ছিল সে ওখানে গিয়ে মারা গেল। ভাগ্যে যা আছে তাই হয়। অনেকদিন থেকে মাধবের কারও কর্তৃত্বাধীনে না থেকে স্বাধীনভাবে থাকার ইচ্ছা ছিল। যাক তার ইচ্ছা অবশেষে পূর্ণ হল। যাই হোক লোকটি ভাল ছিল। কুম্ভকোনামের আচার্যস্বামী মারা গেলে কথাচ্ছলে মাধবকে বলেছিলাম যে ওই মঠে কেউ নেই, সে কি যাবে? তার এ ধারণাটা ভালই লাগল, সে গেল আর ইচ্ছাটা পূর্ণ করল। দেখ, কী ভাবে ঘটনা ঘটে। আমি যখন একটা ছোট খাতায় তেলুগু দ্বিপদ ও অন্যান্য পদ মালয়ালাম লিপিতে লিখেছিলাম সে তেলুগুভাষীর মত সেগুলো পড়ত। তার কিছু তেলুগু সংস্কার ছিল। মাঝে মাঝে দেখবে ব'লে সেই খাতাটি নিয়ে গেছে। সেটি পাওয়া গেলে ওদের নিয়ে আসতে বলো। আইয়াস্বামীও ঐরকম করেছিল। সেও একটা খাতা প'ড়ে দিয়ে যাবে বলে নিয়ে গেল। সে নিজেই আর কোনদিন ফিরলে না। এর বেলায়ও ঠিক তাই ঘটল'', এই বলে তিনি কথা ঘোরালেন। একজন অতি নম্র ও ভদ্রলোক যে ছায়ার মত বারো বছর ভগবানের সঙ্গে থেকেছে তার অন্য স্থানে গিয়ে হঠাৎ মারা যাওয়াতে আশ্রমের সবারই চোখে জল এল।

কুঞ্জস্বামী মাধবের সমাধির ব্যবস্থা করতে এখান থেকে গিয়েছিল। সে আজ ৪টায় ফিরে এসে ভগবানকে প্রণাম ক'রে বললে, ''মাধবস্বামী

মনের শান্তির জন্য অনেক ঘুরে শান্তি না পেয়ে লোকেদের বলত যে তার আর বাঁচার ইচ্ছা নেই, শেষে কুম্ভকোনাম মঠে এল। তার হঠাৎ একদিনের জন্য পেটের অসুখ করে। সোডার জল পান করতে গিয়ে শ্বাসের কষ্ট হ'লে তাকে শুইয়ে দেওয়া হয়। তারপর তার আর জ্ঞান ফেরেনি– মঠের লোকেরা আমায় এই কথা বললে। তারা আমি না যাওয়া পর্যন্ত দেহটা রেখেছিল। তিনদিন হয়ে গেলেও দেহের কোন বিকৃতি হয়নি। সমাধি দিয়ে এলাম। ছোট খাতাটি কোথাও পাওয়া যায়নি।''

সে চলে যেতে কৃষ্ণস্বামীর দিকে চেয়ে ভগবান বললেন, ''মাধব বেশ ভাল লোক ছিল। তাই সবার দুঃখ হচ্ছে। তার জন্য দুঃখ না ক'রে আমাদের কবে যেতে হবে এই ভাবনাই করা উচিত। জ্ঞানী সব সময়ে কবে দেহের বন্ধন ত্যাগ ক'রে এটি ফেলে স্বাধীন হতে পারবে সেই দিনের প্রতীক্ষা করে। একজন মুটে কখন গন্তব্য স্থানে পৌঁছাবে সেই চিন্তাই করে। বাবু বাড়ি পৌঁছে মোটটা নামাতে বললে, মোট নামিয়ে তার স্বস্তি হয়। সেরূপ জ্ঞানীর পক্ষে এই শরীরটা একটা ভার। জ্ঞানী সব সময়ে ভাবে, ও চলে গেল, আমার কবে শরীর থেকে ছুটি হবে। এই একটুখানি প্রাণ চলে গেলেই শরীরটা বইতে চারজন লাগে। প্রাণটি থাকলে কোন ভারই নেই চলে গেলে শরীরের মত দুর্বহ আর কিছু নেই। এমন যে শরীর তার জন্য 'কায়কল্পব্রত' আরো কত কি ক'রে লোকে ভাবে যে সশরীরে মোক্ষ লাভ করবে। আবার তারাও সময় হলে চলে যায়। কেউ কখনো চিরকাল শরীরে থাকতে পারে না। একবার প্রকৃত অবস্থা জানা হলে, কে এই নশ্বর শরীর চায়? এই ভার ফেলে মুক্ত হওয়ার দিনটিই তারা কামনা করে।''

মাধবস্বামী মালয়ালি ছিল। তার জন্মস্থান পালঘাটের কাছে একটি গ্রামে। সে ব্রহ্মচারী ছিল। কুড়ি বছর বয়সে প্রায় পনেরো বছর আগে এখানে এসেছিল। ভগবানের সেবক ছিল। কিছুদিন থেকে তার তীর্থ ভ্রমণের ইচ্ছা হয় তাই মাঝে মাঝে চলে যেত ও আবার ফিরে আসত। ভগবানের আর একজন ভক্ত আচার্যস্বামী যার জন্য কুম্ভকোনামের মঠটি প্রতিষ্ঠিত হয়

তিনি এখানে এসে মারা যান, মাধব সেখানে মঠাধিপতি হয়ে গিয়েছিল। আর অতি অল্পকালের মধ্যে চলে গেল।

* * *

22শে জুলাই, 1946

(52) ''অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্''

আজ সকাল সাড়ে 10টার সময়ে সন্তি রামমূর্তি তার স্ত্রী, ভাই ও কয়েকজন বন্ধু নিয়ে এসেছিল। সেই সময়ে একজন ভক্ত একটা বই প'ড়ে জিজ্ঞাসা করলে, ''এ বই-এ লেখা আছে আমরা অন্ন খাই, অন্নও আমাদের খায়। তা কী করে হয়? আমরা অন্ন খাই এটা ঠিক কিন্তু অন্ন আমাদের খায়, এর অর্থ কী?'' ভগবান চুপ করে রইলেন।

প্রায় দশ মিনিট নীরবে অপেক্ষা করার পর রামমূর্তি বললে যে, সে দশ বছর আগে একবার ভগবানকে দর্শন করেছে, এবার তার ভাই ভগবানের দর্শনের জন্য ব্যাকুল হওয়ায় এখানে এসেছে আর আগের ভক্তের আলোচনার সূত্র ধরে মন্তব্য করলে- ''সকল প্রাণী অন্নে জন্মায়, জীবিত থাকে আর অন্নেই লয় হয় তাই অন্নকে ব্রহ্ম বলা হয়। সেই ব্রহ্ম সর্বব্যাপক। সব কিছু ব্রহ্মের ছায়া আর এই ছায়াকেই অন্ন বলা হয়, সেজন্য অন্ন আমাদের খায় বলা হয়েছে। অর্থটা এই, তাই না?'' ভগবান বললেন, ''হাঁ''।

সে ও তার ভাই ভগবানকে বিজ্ঞান, পারমাণবিক বোমা ইত্যাদি সম্বন্ধে ইংরাজিতে অনেক কিছু বললে। আমি ইংরাজি জানি না তাই সব বুঝতে পারি নি। ভগবান কিন্তু তেলুগুতে উত্তর দিলেন। তাদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে সব বক্তব্য শেষ হলে, ভগবান শেষ কালে বললেন ''নিশ্চয়ই। কিন্তু এ সবের একটিও নিজের আত্মা থেকে পৃথক নয়, তাই না? নিজের পরই এ সব আছে। কেউ এ কথা বলে না যে, সে নেই। একজন নাস্তিকও স্বীকার

করে যে, সে আছে। সুতরাং যা কিছু আসছে সেটা নিজের ভিতর থেকেই আসছে আর নিজেতেই লয় হবে। নিজের আত্মা থেকে কিছুই আলাদা নয় 'অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্' শ্রুতি বাক্য অনুসারে আত্মা অণু হতেও সূদ আবার মহৎ হতেও মহান।'' রামমূর্তি বললে, ''তাহলে অণু ও মহতে পার্থক্য হয় কেন?'' ভগবান বললেন, ''শরীরের জন্য।'' রামমূর্তি বললে, ''আমরা জগতে এত বিভিন্ন শক্তি দেখি কী করে?'' ভগবান বললেন, ''এর জন্য দায়ী মন। এই মনই শক্তির পার্থক্য দেখায়। এ জন্মালেই আর সব জন্মায় । একবার মন জন্মালেই পঞ্চভূত ও তাদের অতীত শক্তি, আর যা কিছু হোক না কেন, তাদেরও অতীত শক্তি, সবই রূপ নেয়। মন লয় হলে, এ সবই লয় হয়ে যায়। মনই এ সবের মূল।''

* * *

28শে জুলাই, 1946

(53) স্বপ্ন ঃ ভ্রান্তি

কিছুদিন আগে একজন উত্তর ভারতীয় এখানে কয়েকদিন ছিল। একদিন বিকাল সাড়ে তিনটায় সে ভগবানের কাছে এসে একজন তামিল ভক্তের সাহায্যে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলে, ''স্বামী, গতকাল আমি অতিথিভবনে ঘুমাচ্ছিলাম, ঘুমের মধ্যে আপনি আমার সঙ্গে কথা বললেন। কিছুক্ষণ পরে ঘুম ভেঙ্গে গেল তখনও আপনি আমার সঙ্গে কথা ব'লে চলেছেন। এ কী রকম?'' ভগবান বললেন, ''তুমি ঘুমাচ্ছিলে, তাই না? তবে কথা আর কার সঙ্গে বলবে?'' সে বললে, ''তাহলে নিজের সঙ্গেই বলেছি।'' সবাই হেসে উঠল।

ভগবান বললেন, ''তুমি বলছ, তুমি ঘুমাচ্ছিলে। তবে যে ঘুমাচ্ছে তার আর কথা বলা হয় কী করে? তবু তুমি বলছ কথাবার্তা হচ্ছিল। তার অর্থ তোমার শরীরটা ঘুমাচ্ছিল, তুমি জেগেছিলে। এবার সেই তুমিটাকে খোঁজো। এটি হলে, তারপর ঘুমের মধ্যে কথাবার্তার কথা বিবেচনা করা

যাবে।'' এর পর আর কোন উত্তর হল না। সবার দিকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি বললেন, ''মাত্র দু'টি জিনিস আছে সৃষ্টি ও ঘুম। ঘুমেতে কিছুই নেই। আর জাগলেই সব কিছু। যদি জেগে ঘুমাতে শেখো তবে সাক্ষীর মতো হতে পারবে। সেইটিই প্রকৃত সত্য।''

কিছুদিন আগে ঠিক এই ভাবে সুব্রামায়া ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ''অস্পর্শ রূপ কী?'' ''এর অর্থ দেখা যায় অথচ ছোঁয়া যায় না এমন বস্তু। সে বললে, ''ছায়ারূপের অর্থ কী?'' ভগবান বললেন, ''একই অর্থ। যা ছায়ার মতো দেখায়। ভাল ক'রে দেখলে কিছুই নেই। একে ঈশ্বর, শয়তান, স্বপ্ন, অলৌকিক দর্শন, প্রত্যাদেশ যা ইচ্ছা নাম দিতে পারো। যদি দেখার জন্য কেউ থাকে তবেই এগুলো থাকে। যদি যে দেখে তাকে খুঁজে পাও তাহলে আর এগুলো থাকবে না। যেটা নেই মনে হচ্ছে, সেটা সব কিছুর উৎস, সেটাই আত্মা। নিজের সত্তাকে না দেখে মানুষের অন্য বস্তু দেখে কী লাভ?''

সম্প্রতি একজন ভগবানকে বললে যে তার এক বন্ধু সূদ শক্তির সীমা দেখতে পায়, সে মহাপুরুষদের শক্তির সীমা দেখেছে। শ্রীঅরবিন্দের সূদ শক্তির জ্যোতি সাত ফারলং, ভগবানের তিন মাইল অবধি দেখেছে আর তারপর কতদূর গিয়েছে ঠিক ধরতে পারেনি, বুদ্ধ ও অন্যান্যদের অতদূর যায়নি। তার সব কথা ধৈর্যের সঙ্গে শেষ অবধি শুনে ভগবান হেসে বললেন, ''দয়া ক'রে তাকে বলো যে, সে যেন অন্যের শক্তির বিচ্ছুরণের সীমা না খুঁজে নিজেরটা খোঁজে। সূদ শক্তির সীমা, তার বিচার, এসব কী? যদি মানুষ নিজের দিকে দেখার চেষ্টা করে তবে এসব আজগুবি চিন্তা মাথায় আসে না। যারা আত্মোপলব্ধি করে তাদের কাছে এসব অতি তুচ্ছ।''

* * *

6ই আগস্ট, 1946

(54) শুদ্ধাভক্তিই প্রকৃত সেবা

আজ একজন ভক্ত ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলে, ''স্বামী, আপনার পাহাড়ে থাকাকালে আমলকীর গল্পটা কী?'' তখন তিনি বললেন, ''যখন বিরূপাক্ষ গুহায় ছিলাম, কোষ্ঠ পরিস্কারের জন্য রোজ রাত্রে একটা আমলকী খেতাম। একদিন এমন হল যে আর একটিও নেই। পলনীস্বামী বাজারে যাওয়ার কথা ভাবছিল তাই তাকে শেষ আইয়ারকে কিছু আমলকী পাঠাবার কথা বলতে বললাম। সে বললে পথে শেষ আইয়ারকে বলে যাবে। পর মুহূর্তে শেষ আইয়ারের গ্রাম থেকে একজন দর্শনার্থী এল। সে মাঝে মাঝে আসত। সে একটুক্ষণ থেকে চলে গেল। পলনীস্বামীও বাজারে যাওয়ার জন্য তৈরি হল, এর মধ্যে লোকটি ফিরে এসে বললে, 'স্বামী, আপনার আমলকী চাই?' আমি বললাম, 'থাকলে দু'একটা দিতে পারো।' সে একটা বড় থলি এনে সামনে রাখলে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত কোথা থেকে এল?' সে বললে, 'আপনাকে দর্শন ক'রে একটা গরুর গাড়িতে পাশের গ্রামে কাজে যাচ্ছিলাম। সামনে একটা আমলকীর থলি ভর্তি গাড়ি চলে গেছে। একটা থলি ফুটো ছিল তার থেকে এগুলো পড়েছিল। হয়তো আপনাদের কাজে লাগবে ভেবে আমি কুড়ালাম। স্বামী, এগুলো রেখে দিন।' আমি তিন চার সের রেখে বাকি ফিরিয়ে দিলাম। এরকম প্রায়ই হত। ক'টাই বা মনে আছে। মা যখন এলেন আর রান্না আরম্ভ করলেন, তিনি বলতেন একটা লোহার হাতা হলে ভাল হয়। আমি হয়ত বললাম, দেখা যাক। রের দিন কি দিন দু'য়েক পরে একজন চার পাঁচটা হাতা নিয়ে হাজির। রাঁধবার পাত্র সম্বন্ধেও এরকম হত। মা বলতেন এটা হলে হত, ওটা হলে হত আর আমি উত্তর দিতাম 'তাই নাকি?' তারপর সেদিন কি পরের দিন একটার বদলে দশটা সেই পাত্র এসে পৌঁছাত। আমার মনে হল ঢের হয়েছে! কে এদের খবরদারি করবে? এরকম কত হয়েছে।''

আর একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করলে, ''আচ্ছা, আঙুর নিয়ে যেন কী হয়েছিল?'' ভগবান বললেন, ''হাঁ, ওগুলোও আমলকীর মত ব্যবহার হত। একদিন সব ফুরিয়ে গেছে। পলনীস্বামী জিজ্ঞাসা করলে বাজারে গেলে কাউকে বলবে কি না। আমি বললাম তাড়া নেই আর ভাববার দরকার নেই, দেখা যাক, ব্যস্। কিছুক্ষণ পরে গম্ভীরম্ শেষয়্যারের ভাই এল, হাতে একটা বড় ঠোঙ্গা। জিজ্ঞাসা করা হলে বললে, 'আঙুর'। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'সে কী! এই মাত্র আমাদের আঙুর ফুরিয়ে যাওয়ার কথা হচ্ছিল। তা তুমি কী করে জানলে?'' সে বললে, 'আমি কী করে জানব স্বামী? এখানে আসার আগে খালি হাতে আসব না ভেবে বাজারে গেলাম। আজ রবিবার হওয়ায় একটা ছাড়া সব দোকান বন্ধ। দোকানিকে বললাম, 'ভগবানের কাছে যাচ্ছি, তোমার কী আছে?' সে বললে যে কেবল আঙুর তাও এইমাত্র এসেছে। সে ঠোঙ্গায় বেঁধে দিলে। আমিও নিয়ে এলাম। স্বামী, এই একটুক্ষণ আগে এ কথা মনে হল।' মিলিয়ে দেখা গেল যে আমাদের কথা আর ওর চিন্তা একই সময়ে হয়েছে। এরকম ঘটনা আইয়াস্বামীর বেলায় প্রায়ই হত। আমরা যখনই একটা বিশেষ জিনিস হ'লে ভাল হয় ভাবতাম, ঠিক সেই সময়ে তার মনে হত যে সেই জিনিস ভগবানের কাছে নিয়ে যেতে হবে। যদি আমরা জিজ্ঞাসা করতাম 'তুমি কী করে জানলে?' আইয়াস্বামী বলত, 'স্বামী, কী করে আর জানব? আমার এমনি মনে হল যে এই বিশেষ জিনিসটা ভগবানের কাছে নিয়ে যাই। তাই নিয়ে এলাম, ব্যস্। আপনি বলছেন যে আপনি এই জিনিসের কথা ভেবেছিলেন। এসব অদ্ভুত ঘটনার কথা আপনিই জানেন।' আসলে সে মনটি শুদ্ধ রাখত তাই আমরা যা ভাবতাম আর্শিতে ছায়া পড়ার মত তার মনে উদয় হত।''

আমাদেরও যে মনকে শুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক রাখতে হবে সে কি আরও বিশেষ ভাবে বলতে হবে? আইয়াস্বামীর জীবন একটা দৃষ্টান্ত, তাই না?

* * *

৪ই আগস্ট, 1946

(55) গুরিই (একাগ্রতা) একমাত্র গুরু

গতকাল সকালে যোগী রামিয়া ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলে, ''স্বামী, সাঁইবাবার কয়েকজন ভক্ত তাঁর ছবি পূজা করে আর বলে, এটি তাদের গুরু সে কী করে হয়? তারা সে ছবিকে ইষ্টদেবতা ভাবতে পারে কিন্তু গুরু বলে পূজা ক'রে কী লাভ করবে?'' ভগবান উত্তর দিলেন ''তারা এভাবে একাগ্রতা লাভ করে।'' যোগী বললে, ''সে ভাল কথা সেটা স্বীকার করছি। এতে কিছুটা একাগ্রতার সাধনা হতে পারে। কিন্তু একাগ্রতা লাভের জন্য গুরুও তো চাই?'' ভগবান বললেন, ''নিশ্চয়ই, গুরুর অর্থই গুরি (একাগ্রতার তেলুগু প্রতিশব্দ)।'' যোগী বললে, ''একটি প্রাণহীন ছবি কী করে গভীর ধ্যানের শিক্ষা দেবে? একজন জীবন্ত গুরুই কেবল নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে শিক্ষা দিতে পারেন। ভগবান হয়ত সাক্ষাৎ গুরু ছাড়াই পূর্ণতা লাভ করতে পারেন কিন্তু আমাদের মত লোকের কি তা হওয়া সম্ভব?''

ভগবান বললেন, ''সে কথা সত্য। তাহলেও, ছবি পূজা করলেও খানিকটা মনের একাগ্রতা হয়। কিন্তু আত্মানুসন্ধানের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ না করলে সেই একাগ্রতা স্থায়ী হয় না। অনুসন্ধানের জন্য গুরুর সাহায্য প্রয়োজন সেইজন্যই মহাজনেরা বলেন যে কেবল দীক্ষা নিলেই অনুসন্ধানের শেষ হয় না। যাই হোক যদি শেষ হয়েও যায় তাহলেও দীক্ষা নেওয়া ব্যর্থ হয় না। কখনো না কখনো ফল দেবে। কিন্তু এই দীক্ষা যেন ভণ্ডামি না হয়। যদি মনটি শুদ্ধ হয় তবে কালে সুফল প্রসব করে, তা না হলে ঊষর জমিতে বীজ বোনার মত সবই বিফলে যায়।''

যোগী বললেন, ''জানি না স্বামী, আপনি একশ' বার কিংবা হাজার বার এ কথা বলতে পারেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আপনার মতো একজন গুরু নিশ্চয়ই প্রয়োজন। একটি প্রাণহীন ছবিকে কী ক'রে সাক্ষাৎ গুরুর সমান মর্যাদা দেওয়া যায়?'' হাসিমাখা মুখে ঘাড়টি নেড়ে ভগবান

''ঠিক, ঠিক'' বলে মৌন হলেন। দাদা, সেই হাসি আর সেই মৌন যেন পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, কী বলে বর্ণনা করি?

* * *

10ই আগস্ট, 1946

(56) সিদ্ধ(যাদের অষ্টসিদ্ধি আছে)

আজ ভগবানের কাছে সিদ্ধদের সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। অনেক কথার মধ্যে একজন বললে যে, কেউ একজন চেষ্টা ক'রে সিদ্ধি লাভ করেছে। অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে সব কথা শুনে ভগবান বিরক্তভাবে বললেন, ''তোমরা সিদ্ধের কথা বলো। তোমরা বলো যে তারা কোথাও থেকে কিছু পায়। সেই উদ্দেশ্যে তারা তপস্যা ও সাধনা করে। এই যে আমরা নিরাকার হয়েও হাত-পা, চোখ, মুখ, নাক, কান সমেত একটা শরীর পেয়েছি আর তাই দিয়ে এটা ওটা ক'রে বেড়াচ্ছি, এটাও কি একটা সিদ্ধি নয়? আমরা সবাই সিদ্ধ। আমরা খেতে চাইলে খাবার পাই জল চাইলে জল পাই দুধ চাইলে দুধ পাই। এগুলো কি সিদ্ধি নয়? যখন সব সময়ে ভূরি ভূরি সিদ্ধি লাভ হচ্ছে তখন আর সিদ্ধির জন্য চেঁচামেচি করো কেন? আর কী চাই?''

প্রায় দু'বছর আগে বিধান সভার সভ্য ও জ্ঞানেশ্বরী গীতার অনুবাদক মনু সুবেদার দর্শনার্থী হয়ে এসেছিল। সে ভগবানকে কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিল যে আমরা সব বই-এ সিদ্ধদের কথা পাই কিন্তু সাধকদের সম্বন্ধে কিছু পাই না সাধক সম্বন্ধে লেখা কোন বই আছে কি না। ভগবান বললেন, ''তামিল ভক্তবিজয়মে জ্ঞানেশ্বর ও তার বাবা বিঠোবার কথোপকথন আছে। এটি সিদ্ধ ও সাধকের আলাপ আলোচনা'', এই বলে আশ্রম লাইব্রেরি থেকে বইটি আনিয়ে সেই অংশটা প'ড়ে অনুবাদ ক'রে শোনালেন ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করলেন। বাড়ি ফিরে গিয়ে মনু সুবেদার সেই কথিকাটি চেয়ে পাঠাল। ভগবান তার ইংরাজি অনুবাদ করিয়ে পাঠালেন। সে তার 'জ্ঞানেশ্বরীর' তৃতীয় সংস্করণের অনুবন্ধে এটা ছাপিয়েছে। সম্প্রতি

সেই কথিকাটি আমি তেলুগুতে অনুবাদ করি। গত পূর্ণিমায় যখন তুমি এসেছিলে, মনে পড়ে, কথায় কথায় ভগবান বললেন যে জ্ঞানেশ্বর সিদ্ধ ছিল আর বিঠোবা সাধক ছিল! তাই কথিকাটির 'সিদ্ধ সাধক সংবাদ' শিরোনাম দিলাম।

ভগবান প্রায়ই বলেন, ''নিজেকে জানা আর নিজের কাছে ঠিক থাকাই সিদ্ধি, আর কিছু না। যদি আত্মানুসন্ধানে মন লেগে থাকে তবে কোন না কোন দিন সত্য লাভ হবেই। এটিই সর্বোত্তম সিদ্ধি।

ভগবান তাঁর 'সদ্‌বিদ্যা চত্বারিংশতে' সিদ্ধি সম্বন্ধে যা বলেছেন তার অনুবাদ দিলাম–

নিত্য স্থিত, সত্যের অনুস্মৃতি
তাতেই স্থিতি, এই পরম প্রাপ্তি।
আর যাহা লাভ, স্বপ্ন লব্ধ তাহা
নিদ্রাভঙ্গে কোথা অস্তিত্ব তাহার?
মায়ামুক্ত ব্রহ্মস্থিত যারা
সিদ্ধির কুহকে পড়ে না তারা॥

সদ্‌বিদ্যা– 35

* * *

11ই আগস্ট, 1946

(57) কর্তুরাজ্ঞয়া প্রাপ্যতে ফলম্‌(সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় ফল লাভ)

প্রায় দশমাস আগে কৃষ্ণভিক্ষু আমায় লিখেছিল যে, সে ভাবছে যে তার সম্পত্তি ভাইদের লিখে দিয়ে সন্ন্যাস নিয়ে পরিব্রাজক হবে তাহলে বোধহয় মনে শান্তি পাবে আর ভগবান এ বিষয়ে কী বলেন তাও ভাবছে। আমি এ চিঠির কথা ভগবানকে বললাম। ভগবান বললেন, ''তাই নাকি? সে কি ঠিক করে ফেলেছে?'' আর একটু পরে বললেন, ''সবই কর্মফল অনুসারে হয়।''

আমি কৃষ্ণভিক্ষুকে এটা লিখলাম, সে উত্তর দিলে ''বলা হয় 'কর্তুরাজ্ঞয়া প্রাপ্যতে ফলম্' সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় ফললাভ। তাহলে সৃষ্টিকর্তার কী হল?'' আমার আর ভগবানকে এটা বলতে ইচ্ছা হল না, ভাবছিলাম কী উত্তর দেব। এরমধ্যে একজন ভক্ত ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলে, '''কর্তুরাজ্ঞয়া প্রাপ্যতে ফলম্'-এ কর্তা কে?'' ভগবান বললেন, ''কর্তা ঈশ্বর। তিনি প্রত্যেকের কর্ম অনুসারে ফল দেন। তার অর্থ এটি সগুণ ব্রহ্ম। পূর্ণব্রহ্ম নির্গুণ তাঁর বিক্ষেপ নেই। সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর। তিনি কর্মফল দান করেন। তার অর্থ ঈশ্বর যেন প্রতিনিধি (মুৎসুদ্দি), যে যেমন কাজ করে তাকে তেমন প্রাপ্য মিটিয়ে দেন। ব্যস্। ঈশ্বরের সেই শক্তি ছাড়া কর্ম হয় না। তাই কর্মকে জড় বলা হয়।''

এ ছাড়া আর কৃষ্ণভিক্ষুর চিঠির কী উত্তর হতে পারে? সুতরাং তাকে এইভাবে লিখলাম। বিক্রমার্ক তার খড়মের আশ্চর্য শক্তির বলে ব্রহ্মলোকে গিয়েছিলেন। ব্রহ্মা তাকে দেখে খুশি হয়ে বর চাইতে বললেন। বিক্রমার্ক বললে, ''প্রভু, শাস্ত্রে বলে যে আপনি সৃষ্টি করার সময়ে পূর্বজন্মের কর্ম অনুসারে প্রত্যেকের ভবিষ্যৎ কর্ম তার কপালে লিখে দেন। এখন বলছেন বর দেবেন। তবে কি আগের লেখা মুছে দেবেন কিংবা তার ওপর লিখে দেবেন?'' ব্রহ্মা তার বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে খুশি হয়ে হেসে বললেন, ''নতুন কিছুই করা হয় না। যা আগে থেকেই জীবের কর্মানুসারে কপালে লেখা আছে তাই আমার মুখ থেকে বার হবে। আমরা এমনি বলি 'হাঁ, এরকম বর দিলাম।' ব্যস্। নতুন কিছু দেওয়া হয় না। এসব না জেনে লোকে বর লাভের জন্য তপস্যা করে। তুমি বুদ্ধিমান বলে রহস্যটা ধরতে পারলে। আমি খুব খুশি হয়েছি'' এই বলে তাকে 'ব্রহ্মাস্ত্র' দিয়ে বিদায় দিলেন। আমি ছোট বেলায় এই গল্পটা পড়েছিলাম।

ভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের নন্দ মহারাজাকে ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করার সনির্বন্ধ অনুরোধেও এই ভাবটি আছে।

* * *

11ই আগস্ট, 1946

(58) সর্বসমত্বম্

গত গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যাবেলায় ভগবানের বাইরে বসার সুবিধার জন্য হলঘরে পাশে একটা শামিয়ানা খাটানো হয়েছিল। শামিয়ানার পশ্চিমে খসখসের টাটি ঝোলানো ছিল। ভগবানের সোফাটা টাটির কাছেই ছিল। ভক্তেরা পশ্চিম মুখে বসত আর ভগবান দক্ষিণামূর্তির মতো দক্ষিণমুখে বসতেন। আমরা পায়ের দিকে বসতাম। সামনে দেখলে ভগবানের চরণকমল দর্শন হত, একদিকে চমৎকার ফুলের বাগান আর অন্যদিকে অরুণাচলের চূড়া দর্শন হত। আমাদের সৌভাগ্যের কথা আর কী বলব?

একদিন পৌনে 4টার সময়ে ভগবান পাহাড়ে বেড়াতে গেছেন। সেবকেরা মেঘলা থাকার জন্য টাটিগুলো তুলে দিয়েছে। ভগবানের ফিরে আসার দশ মিনিটের মধ্যে চড়া রোদ উঠল। যদিও পড়ন্তবেলা তাহলেও গ্রীষ্মের প্রখর তাপে সবারই কষ্ট হচ্ছিল। ভগবানের খালি গায়ে রোদ পড়তে দেখে, না থাকতে পেরে সেবক বৈকুণ্ঠবাস ধীরে ধীরে ভগবানের পিছনের টাটিটা নামিয়ে দিলে। সে ভাবলে ভগবান জানতে পারেন নি। তখন বেদপারায়ণ হচ্ছিল তাই ভগবান যেন বুঝতে পারেন নি এইভাবে চুপ করে রইলেন।

পারায়ণ শেষ হলে ভগবান একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, ''লোকেদের কাণ্ড দেখ! ওরা আমার পিছনের টাটিটাই নামাল। বোধহয় ভাবে যে অন্যেরা মানুষ নয়! ভগবানের রোদ না লাগলেই হল, অন্যদের লাগে লাগুক! কেবল স্বামীর জন্য বিশেষ কিছু করতে হবে! যাই হোক স্বামীর মর্যাদা তো থাকল! বেচারা! এভাবে সেবিত না হলে বোধহয় ওদের মতে স্বামী হওয়া যায় না! স্বামীর যেন রোদ, হাওয়া, আলো না লাগে, স্বামী যেন না নড়েন, না কথা বলেন তিনি কেবল একটা হাত সোফার ওপর রেখে

আর অন্য হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন। এই স্বামীগিরি! সবার থেকে পৃথক করে বিশেষ কিছু করলেই 'স্বামীত্ব' বজায় থাকে।''

দেখেছ, ভগবান কোন পার্থক্য সহ্য করতে পারেন না। তিনি সমত্বের ওপর সব সময়ে জোর দেন। বেচারি সেবক ভয় পেয়ে টার্টিটা তুলে দিলে। অস্তগামী সূর্যের আলোর ঝল্‌কানি ভগবানের ওপর প'ড়ে তাঁর চোখের জ্যোতির সঙ্গে মিশে গেল। ধূপের ধোঁয়ায় সব দিক ছেয়ে গেল। মনে হল সেই সৌরভ যেন সান্ধ্য বায়ুর সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে পাখার বাতাসে তাঁর চরণ ছুঁয়ে সকল ভক্তের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল।

* * *

13ই আগস্ট, 1946

(59) যথেচ্ছা

আমার এখানে আসার প্রথমদিকে একটি বৈশ্য ছেলে এখানে থাকত। তার মাথার চুল অযত্নে জটা বেঁধে গেছে সে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করত আর অরুণাচল মন্দিরে রাত কাটাত। তার মা আশ্রমে এসে তাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলে সে পাণ্ডারপুর পালিয়ে গেল। সে তাদের একমাত্র ছেলে। তাদের অনেক বিষয় সম্পত্তি ছিল। ছেলেটি একরকম ভবঘুরে বৈরাগী। কে জানে সে কিছু খুঁজছে কি না! তার মা নিজের দুঃখের কথা ব'লে ভগবানের সাহায্য চাইলে, ভগবানও মা'র কথা শোনার জন্য দু'চার বার তাকে বোঝালেন। সে তো শুনলই না উপরন্তু পালিয়ে গেল।

গত মাসে সে আবার এল। একটু আলাদা থাকত, হলঘরের এক কোনায় বসত। তুমি একে সাধনা বা যা ইচ্ছা বলতে পারো। একমাত্র চুলে জটা না থাকা ছাড়া তার চেহারা বা চালচলনে আর কোন পরিবর্তন হয়নি। ভগবান তাকে লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন। সে কোন কথা বলত না। দিন পনেরো পরে, যে রাজাগোপাল আইয়ার চাকরি থেকে অবসর নিয়ে

আবার তার লাইব্রেরির কাজে যোগ দিয়েছে সে কোন কাজে হলে এসে বৈশ্য ছেলেটিকে দেখে ভগবানকে বললে, ''ছেলেটি পাণ্ডারপুর থেকে ফিরে এসেছে দেখছি। ওর মা ঠিকানা রেখে গেছে আর ছেলেটি ফিরে এলে জানাতে বলেছে, তাই না?''

ভগবান বললেন, ''হাঁ, ও ফিরেছে। তা প্রায় দিন পনেরো হল। আমি ওকে লক্ষ্য করছি ও তো কথা বলে না সুতরাং কী করে ওকে জিজ্ঞাসা করব, 'পাণ্ডারপুর কেমন? প্রসাদ কোথায় ইত্যাদি?' অন্যদের মনে কী হচ্ছে বুঝেই আমাদের চলতে হবে। আমরা এইভাবে মানিয়ে নিতে বাধ্য।'' বুদ্ধিমান লোকেরা তাদের মনকে বিচার করে। অন্যের মনে কী হচ্ছে জানা যায় না। ভগবান বলছেন যে তাঁকেও অন্যদের ইচ্ছা ও অভিরুচি মানতে হবে। দেখ দেখি কত বড় শিক্ষা!

* * *

15ই আগস্ট, 1946

(60) কর্মসূচী

নিরঞ্জনানন্দস্বামী একমাস আগে মাদুরাই হয়ে মাদ্রাজ গিয়েছেন। টি. কে. দুরাইস্বামী মাদ্রাজ থেকে এসে, মাদ্রাজের কর্তাব্যক্তিদের তৈরি 1লা সেপ্টেম্বরের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের কর্মসূচী ভগবানের হাতে দিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন।

তাতে সকাল 7টা থেকে সন্ধ্যা 7টা অবধি কর্মসূচীর বিস্তারিত বিবরণ লেখা ছিল। হাইকোর্টের বিচারপতিবৃন্দ ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বক্তা বলে গণ্য করা হয়েছে। মুসিরি সুব্রহ্মণ্য ও বুডালুর কৃষ্ণমূর্তি শাস্ত্রীর গান ও অন্যান্য অনেক কিছু এই কর্মসূচীতে ছিল। বেশ ভাল করে প'ড়ে ভগবান একটু হেসে বললেন, ''ওহো, কী ঠাসা কর্মসূচী! যাই হোক আমার কী? তাদের যা ইচ্ছা করুক। কেবল আমাকে একটু বাইরে যেতে দিলেই হল। এখানে বলা হয়েছে বড় বড় লোকেরা ভাষণ দেবেন। কিসের ওপর?

বলার কী-ই বা আছে? যা আছে তা মৌন। মৌন কী করে কথায় ব্যাখ্যা করা যায়? ইংরাজি, সংস্কৃত, তামিল, তেলুগু ভাষার ছড়াছড়ি! গণ্যমান্য লোকেরা এত ভাষায় বক্তৃতা দেবেন। বেশ তো। আমার কী ভাবনা! আমায় কিছু না বলতে বললেই হল।''

সেই ভক্তটি হাত জোড় করে শ্রদ্ধাভরে জানালে যে, ভগবান যদি কোন একটি বিষয় বাদ দিতে চান তবে তাও করা হবে। ভগবান হেসে বললেন, ''ওহো, তাই নাকি? আমি কি এর কোন একটাও করতে বলেছি যে এখন বারণ করব? যা ইচ্ছা করো। এ-তো বক্তৃতার মেলা! আমি যেমন সোফায় বসি, বসে থাকব। তোমাদের যা ইচ্ছা করো।'' ''হাঁ, স্বামী, সে কথা সত্য। ভগবানের সামনে কে সাহস করে কথা বলবে? এগুলো আমাদের পরম সৌভাগ্যের আনন্দ প্রকাশ'', এই বলে ভগবানকে প্রণাম করে ভক্তটি চলে গেল।

* * *

16ই আগস্ট, 1946

(61) একজন অজানা ভক্ত

আশ্রমে আসা আজকের চিঠি-পত্রের মধ্যে একজন অজানা ভক্তের ইংরাজিতে লেখা একটা চিঠি চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে এসেছে। চিঠিটা দেখে ভগবান স্নেহভরে আমাদের চিঠির কথা বললেন ও পড়িয়ে সবাইকে শোনালেন। চিঠির সারাংশ- ''যদিও আমার শরীরটা অরুণাচল থেকে বহুদূরে তথাপি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সেটি ভগবানের চরণেই রয়েছে। আমার মনে হয় আগামী 1লা সেপ্টেম্বর যুবক রমণের তিরুভণ্ণামলই আসার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হবে। এইটি ভগবানের প্রকৃত জন্মদিন বিশ্বাস ক'রে সেটি পালনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করি। আমি অসীম ভক্তি, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আমার মনকে ভগবানের চরণধূলায় মিশিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টায় ও হৃদয়কে ভগবানের বাণীতে স্থাপন ক'রে এই দিবস উদ্‌যাপন করব।''

আমরা যখন চিঠির বিষয় শুনে আনন্দ প্রকাশ করছিলাম তখন করুণামাখা মুখে ভগবান বললেন, ''আমরা ও যে কে জানি না নামও জানি না কোথায় জন্মেছে তাও জানি না। ও এখানে কখনো আসেও নি। ও কী ক'রে জানলে যে আমার এখানে আসার ঠিক পঞ্চাশ পূর্ণ হয়েছে? সে একটা ভক্তিপ্লুত চিঠি লিখেছে। যা লিখেছে তা দেখে মনে হচ্ছে যে ও আমার জীবনী পড়েছে আর বুঝেছে। ভক্তেরা ডঃ রাধাকৃষ্ণণের একটা প্রবন্ধের জন্য অপেক্ষা করছিল কিন্তু সেটা এখনও এসে পৌঁছায় নি। সেটি পেলে তাকেই স্মারক সংখ্যার মুখবন্ধ করে ছাপাবার ইচ্ছা ছিল। যখন দুরাইস্বামীকে মুখবন্ধ লিখতে বলা হল, সে বললে 'ও বাবা, আমি পারব না। আমি নীরব থাকতে চাই। ডি. এস. শাস্ত্রীও তাই বললে। এ চিঠিটা অপ্রত্যাশিতভাবে এসে পড়ল। এমনি সব ঘটনা ঘটে। এরা সবাই প্রবন্ধের জন্য অপেক্ষা করছে বিশেষ করে রাধাকৃষ্ণণের। দেখ কী আশ্চর্য! কোথায় চেকোশ্লোভাকিয়া আর কোথায় তিরুভণ্ণামলই? যখন আমায় কখনো না দেখেও এরূপ লেখে তখন আর বলার কী আছে?''

* * *

18ই আগস্ট, 1946

(62) এক অক্ষরম্(একটি বর্ণ ও এক অবিনশ্বর)

দু'চার দিন আগে বোম্বাই আগত কয়েকজন গুজরাটি আশ্রমের ক'টি বই ও ভগবানের ছবি কিনে বই-এর ওপর ভগবানকে তাঁর নাম লিখে দিতে বলে। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ''কী নাম লিখব?'' তারা বললে, ''আপনার নাম।'' ভগবান বললেন, 'আমার কী নাম?'' তারা বললে, ''আপনার নাম 'রমণ মহর্ষি', তাই না? ভগবান বললেন, ''অনেকে এরকম বলে বটে। প্রকৃত পক্ষে কী-ই বা আমার নাম, কোথায় বা জন্মস্থান? নাম থাকলে তো লিখব।'' গুজরাটিরা আর কিছু না বলে চলে গেল।

তোমার মনে আছে 1945 সালে জানুয়ারি মাসে, যখন তুমি তোমার ব্যাঙ্কিং-এর ওপর লেখা বই-এ ভগবান যেন কৃপা ক'রে 'অওঁ' বা 'শ্রী' লেখেন ব'লে অনুরোধ করেছিলে তখন ভগবান অস্বীকার করলেন। তার পরিবর্তে সোমসুন্দরস্বামীর অনুরূপ অনুরোধে লেখা একটি তামিল পদের তেলুগু অনুবাদ ক'রে একটা ছোট কাগজে লিখে আমায় দেন। তোমায় কাগজটি পাঠালে তুমি সেটি ভগবানের উপদেশ, গুরুর আদেশ মনে করে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলে। পরে তিনি সেই পদের সামান্য কিছু অদলবদল করেন। আরও পরে মুরুগনারের অনুরোধে তিনি এটা সংস্কৃতেও অনুবাদ করেন।

একমক্ষরং হৃদি নিরন্তরম্।
ভাসতে স্বয়ং লিখ্যতে কথম্॥
হৃদয়ে জ্বলিছে সদা এক অক্ষর।
কে আছে তার লিপিকার॥

গুজরাটিরা একই প্রকার অনুরোধ ক'রে প্রত্যাখ্যাত হলে আমার এ সবই মনে পড়ে গেল।

প্রায় দশমাস আগে ভিজিয়ানাগ্রামের 'মহারাজা কলেজে'র তেলুগু পণ্ডিত পন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ শাস্ত্রী এখানে এসেছিলেন। প্রথমে মুখে মুখে কবিতা রচনা ক'রে ভগবানের প্রশস্তি ক'রে পরে তিনি মিনতি ক'রে বললেন, ''আজকের ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন রূপে এই হতভাগ্যকে আশীর্বাদ ক'রে কিছু দিন।'' ভগবান বললেন, ''কী দেব?'' তিনি বললেন, ''আপনার যা খুশি, উপদেশ রূপে অন্ততঃ একটি অক্ষর দিন।'' ভগবান, ''যা অ-ক্ষর, তা কী ক'রে দেব?'' বলে আমার দিকে চাইলেন। আমি বললাম, ''আপনি 'একমক্ষরম্' শ্লোকটি বললে বোধহয় হবে।'' শাস্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, ''কী শ্লোক?'' আমি শ্লোকটা পড়লাম। ভগবান বললেন, ''দ্বিপদটা কোথায়?'' আমি সেটাও পড়লাম। শাস্ত্রী আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেলেন, মনে হল না জানি কী অমূল্য রত্ন পেলেন আর শ্লোক

ও দ্বিপদ দুটোই লিখে নিলেন। যখন তাঁকে এ-দু'টি কী ভাবে লেখা হয় বললাম তখন তিনি খুব খুশি হয়ে ভগবানকে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন। ভগবান যখন গুজরাটিদের বলছিলেন, ''আমার কী-বা নাম কোথায় বা জন্মস্থান?'' তখন সবই আমার মনে পড়ে গেল। শুধু তাই নয় মা ঘরের কাজ করতে করতে একটা গান গাইতেন তাও মনে পড়ল, যার অর্থ অনেকটা এরূপ-

রামনাম ভুবনভরা
কী নাম, রূপ ক্রিয়া তার?
চন্দ্র সুরয অগ্নি জিনি'
অপরূপ জ্যোতি খানি॥
রমণের নামও ঠিক সেরূপ।

* * *

19শে আগস্ট, 1946

(63) সন্তোষ

ভগবান সদ্য ছাপাখানা থেকে আসা 'তামিল সদবিদ্যা চত্বারিংশতের' যে প্রুফ কপি পাওয়া গিয়েছিল সেগুলো রাজাগোপাল আইয়ারকে চারটি বই করে বাঁধাতে বললেন। দুপুর আড়াইটার সময়ে গিয়ে দেখি যে বইগুলো বাঁধানো হয়ে গেছে কেবল বাইরে একটা মলাট দিতে যা বাকি আছে। সবাইকে বইগুলো দেখিয়ে হেসে হেসে পাশে দাঁড়ানো বৈকুণ্ঠবাসকে ভগবান বললেন, ''দেখ, আমরা যদি প্রুফগুলো কাজে লাগাতে পারি তাহলে আরও চারখানা বই পেয়ে যাব। এ ছাড়া আর কী করে চারটে বই পাওয়া যাবে? কে আমাদের দেবে? বই-এর দোকান থেকে কিনতে হবে। আমরা পয়সা কোথায় পাব?'' আমাদের মজা লাগছিল, বৈকুণ্ঠবাস হেসে উঠল। ভগবান বললেন, ''হাসছ কেন? আমি কি চাকরি করি, মাসে শ'

শ' টাকা আনি? না, ব্যবসা ক'রে লাখ টাকা কামাই? আমি টাকা কোথায় পাব? আমার কী স্বাধীনতা আছে? তৃষ্ণা পেলে তোমাদের কাছে জল চাইতে হয়। যদি রান্নাঘরে গিয়ে জল চাই তারা বলবে, 'দেখেছ, স্বামী আমাদের ওপর হুকুম চালাচ্ছেন।' আমায় মুখ বন্ধ ক'রে থাকতে হয়। আমার কি স্বাধীনতা আছে?''

আমাদের মিষ্টি ক'রে বকা ছাড়া এ সব বলার আর কী অর্থ হয়, তিনি তো জগতের সব কিছু থেকে পূর্ণ স্বাধীন? শুধু এই নয়। আমরা সব সময়ে আমাদের ইচ্ছামতো কাজ করি। আমরা এটা চাই, ওটা চাই আর কামনার দাস হয়ে থাকি। আমরা আমাদের কামনা, হয় চেয়ে কিংবা হুকুম ক'রে পুরণ করি। ভগবান কেবল যে আদেশ করাটার নিন্দা করলেন তা নয় এমন কি চাওয়াও যে ভাল নয় তাও বললেন। আরও একটা দৃষ্টান্ত আছে। দু'তিন বছর আগে একদিন সকালে হলে ঢুকছি, দেখি ভগবান কৃষ্ণস্বামীকে কী একটা প্রশ্নের উত্তরে বলছেন–

''যখন বিরূপাক্ষ গুহায় ছিলাম, সুন্দরেশ আইয়ার শহরে ভিক্ষা ক'রে খাবার নিয়ে আসত। কোনোদিন এমন হত যে কোন তরকারি নেই, চাটনিও নেই। খাওয়ার লোক অনেক কিন্তু খাবার কম। তখন আমরা কী করি? আমি তখন সব খাবার মেখে গরম জল ঢেলে দিতাম, ঘন মাড়ের মতো হত, সবাইকে এক এক গেলাস দিয়ে, নিজেও এক গেলাস নিতাম। কখনো কখনো মনে হত, একটু নুন হলে ভাল হয়। কিন্তু নুন কেনার পয়সা কোথায়? আবার কারও না কারও কাছে চাইতে হবে। যদি একবার নুন চাইতে শুরু করি তবে ডাল চাইবার ইচ্ছা হবে, আর ডাল চাইলেই পায়েস, এরূপ সব কিছুই। সুতরাং ঠিক করেছিলাম যে কিছুই চাইব না সেই মাড়ই চুমুক দিতাম। আর তাই খেয়ে কী আনন্দ! খাওয়াটা খুব সাত্ত্বিক হত, কোন মশলা এমনকি নুন পর্যন্ত নেই, শরীরের পক্ষে উপকারী তো বটেই, মনেও শান্তি থাকত।''

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ''তবে নুনও কি উত্তেজক?'' ভগবান বললেন, ''হাঁ, তাতে আর সন্দেহ কী? একটা বই-এ তাই লেখা আছে

না? দাঁড়াও, দেখে বলছি।'' আমি বললাম, ''আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট নয় কি? আবার বই কেন?''

আমরা নুন তো ছাড়িই না বরং মনে করি যে লঙ্কা হলে ভাল হত। আমাদের খাওয়ার অভ্যাস এই নিয়মেই চলছে। মহাত্মারা বাঁচার জন্য খান আর জগতের উপকার করেন আর আমরা খাওয়ার জন্য বাঁচি। এই তফাৎ। যদি বাঁচার জন্য খাই তাহলে আর স্বাদের কোন প্রশ্ন থাকে না। আর যদি খাওয়ার জন্য বাঁচি তবে স্বাদের আর সীমা সংখ্যা নেই। আর তার জন্য কত না দুঃখ দুর্দশা!

* * *

19শে আগস্ট, 1946

(64) আত্ম-প্রদক্ষিণ

গত মে মাসে বিরূপাক্ষ গুহায় থাকাকালে ভগবানের জন্য যে সুন্দরেশ আইয়ার ভিক্ষা ক'রে খাবার আনত, সে এসে প্রণাম করলে। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ''পাহাড়টা ঘুরে প্রদক্ষিণ করেছিলে?'' ভক্ত বললে, ''না''। আমার দিকে চেয়ে ভগবান বললেন, ''গত রাত্রে পূর্ণিমা হওয়ায় সবাই যখন গিরিপ্রদক্ষিণে যাচ্ছিল, এও যাবে ভেবেছিল। পরে ভেবে দেখলে যে পুরো প্রদক্ষিণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সবাই যখন আমাকে বলে যাত্রা করলে এ চট্ করে আমাকে একবার প্রদক্ষিণ করলে। এরূপ করল কেন জিজ্ঞাসা করলে, সে বললে, 'মনে হয় গিরি-প্রদক্ষিণ করতে পারব না তাই ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে নিলাম।' 'নিজেকে প্রদক্ষিণ করো। তাহলেই আত্মপ্রদক্ষিণ হবে' আমি বললাম'', এই বলে ভগবান হাসতে লাগলেন।

একজন ভক্ত বললে, ''তাহলে বিনায়ক (গণেশ) একবার যা করেছিল এও তাই করলে।'' আর একজন বললে, ''গল্পটা কী?'' তারপর ভগবান গল্পটা বলতে শুরু করলেন। ''কোন এক সময়ে ভগবান

পরমেশ্বর তাঁর ছেলে ভগবান সুব্রহ্মণ্যমকে (কার্তিক) কিছু শিক্ষা দেবেন ঠিক করলেন। সে নিজেকে খুব জ্ঞানী ভাবছিল। সুতরাং পরমেশ্বর একটা ফল হাতে নিয়ে পার্বতীর সঙ্গে কৈলাসে বসলেন। ফলটি দেখে গণপতি আর কার্তিক দু'জনেই চাইলে। তাতে পরমেশ্বর বললেন, 'যে সর্বপ্রথম সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করে আসতে পারবে, সে এটি পাবে।' তার জয় সুনিশ্চিত ভেবে কার্তিক গর্বের সঙ্গে তার প্রিয় বাহন ময়ূরের পিঠে চড়ে তৎক্ষণাৎ রওনা দিল আর মাঝে মাঝে গণপতি পিছু ধাওয়া করছে কি না দেখতে লাগল। বেচারি গণপতি তার এতবড় পেট নিয়ে কী করে? আবার তার বাহনটাও হয়েছে একটা ইঁদুর। ভেবে দেখলে যে কার্তিকের সঙ্গে দৌড়ে কাজ নেই সে বাবা-মাকে প্রদক্ষিণ ক'রে প্রণাম ক'রে ফলটি চাইলে। যখন, জিজ্ঞাসা করা হল সে কি ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে এসেছে, গণপতি বললে, 'সমস্ত জগৎ তো আপনাদের মধ্যে সুতরাং আপনাদের প্রদক্ষিণ করাই জগৎ প্রদক্ষিণ করা।' তার উত্তরে খুশি হয়ে পরমেশ্বর ফলটি তাকে দিলেন। গণপতিও বসে সেটি খেতে লাগল।

''এদিকে জয় নির্ঘাত জেনে কার্তিক ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে এসে দেখে গণপতি শিবপার্বতীর সামনে বসে ফলটি খাচ্ছে। সে দৌড় জেতার পুরস্কার চাইলে পরমেশ্বর বললেন, 'এই যে তোমার দাদা বসে খাচ্ছে।' এ কী রকম হল বলে সে ব্যাপারটা জানতে চাইলে তাকে ঘটনাটা বলা হল। নিজেকে জ্ঞানী বলে অহংকার করাটা যে কত ভুল বুঝে কার্তিক প্রণাম ক'রে ক্ষমা চাইলে। এই গল্প। তাৎপর্য হল ঘূর্ণিঝড়ের মতো যে অহংকার ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটা নষ্ট হতে হবে আর আত্মাতে মিশে যেতে হবে। সেটাই আত্মপ্রদক্ষিণ'', ভগবান বললেন।

* * *

20শে আগস্ট, 1946

(65) নরকাসুর- দীপাবলী

রামচন্দ্র আইয়ার সম্প্রতি মাদ্রাজ থেকে এসেছে। একদিন সে হলে বসে একটা পুরাতন খাতা নিয়ে তার তারিখ ও ক্রমিক সংখ্যা সংশোধন করছিল। এই দেখে ভগবান ওটা কী জিজ্ঞাসা করলেন। সে উত্তর দিলে, ''এটা ভগবানের লেখা একটা পুরাতন খাতা। আমি এর তারিখ ও ক্রমিক সংখ্যা দেখে ছাপা বইতে টুকছি।'' ''আমাকে দাও'', বলে সেটা নিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ভগবান আমাকে বললেন ''এতে ক'টা দীপাবলীর কবিতা আছে। শুনেছ?''

আমি শুনিনি বলাতে, তিনি সেগুলো পড়ে তার অর্থ ব্যাখ্যা করে শোনালেন, ''যে নিজেকে শরীর বলে চিন্তা করে সেই নরকাসুর। দেহের সঙ্গে একাত্মবোধই নরক। যার এরূপ বোধ রয়েছে সে মহারাজ হলেও তার জীবন নারকীয়। দেহাত্মবোধ ত্যাগ হ'য়ে আত্মার স্বতঃপ্রকাশই দীপাবলী।'' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ''এগুলো কি 'নুল থিরাট্টু'তে (ভগবানের তামিলে লেখা কবিতা সংগ্রহ) আছে?'' ভগবান বললেন, ''এগুলো মুহূর্তের প্রেরণায় মুখে মুখে রচনা, এগুলো আর বই-এ থাকবে কেন?''

প্রথম ছাপা হ'লে বইটি ভগবানের সামনে পড়া হল তাতে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ''এ কবিতাগুলো কেন লেখা হয়েছিল জানো?'' আমি জানি না বলাতে তিনি বললেন, ''তাই নাকি? এক দীপাবলীর দিনে মুরুগনার আমায় দীপাবলীর সম্বন্ধে কবিতা লিখতে বলে। আমি বললাম, 'তুমি লেখ না কেন? আমি কেন লিখব?' সে বললে আমি লিখলে সেই লিখবে। আমি রাজি হলাম আর কবিতাগুলো লিখলাম। কোন কারণ ছাড়া কিছু লেখা হয়নি। যা কিছু কবিতা লিখেছি সবগুলোর পিছনে এক একটা গল্প আছে'', এই বলে তামিলে লেখা কবিতা দেখালেন-

বৃত্তম–

দেহই নরক, দেহাত্মবোধ যার
নরকের রাজা সেই– নরকাসুর।
সেই নারায়ণ যবে জ্ঞান দৃষ্টি শরে
কে নরক করি স্থির, বধ করে তারে
শুভ দিন নরক চতুর্দ্দশী বলি তারে॥

বেন্‌বা–

নরকসম দেহরূপ গৃহে অহংকার
এই আমি বিশ্বাস, সাক্ষাৎ নরকাসুর।
দীপাবলী– আত্মার প্রকাশ, ভ্রম করি দূর॥

* * *

21শে আগস্ট, 1946

(66) পাহাড়ি দিনের কিছু কাহিনী

গতকাল বিকালে অন্যদিনের থেকে একটু দেরিতে হলঘরে গিয়েছিলাম। তখন বোধহয় বেলা তিনটা। ভক্তদের অনুরোধে ভগবান তাঁর পাহাড়ে থাকাকালীন জীবনের কিছু কাহিনী শোনাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন বিরূপাক্ষ গুহায় থাকার সময়ে প্রথমে কীরূপ মাটির পাত্রে, পরে একটা এলুমিনিয়ামের পাত্রে তারপর পিতলের পাত্রে অবশেষে টিফিন কেরিয়ারে ক'রে খাবার আনা হত কেমন করে এভাবে বাসনপত্র জুটল আর ভক্তেরা তাঁর কথা না শুনে রান্নাবান্না আরম্ভ করে দিল। ভগবান হেসে হেসে আরও একটা ঘটনা বললেন, ''একবার আমি যখন বিরূপাক্ষ গুহায় তখন রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার গম্ভীরম্‌ শেষায়া, একজন বৈশ্য আর একজন রেড্ডী সেখানে ছিল। একদিন তাদের রান্না করতে ইচ্ছা হল আর মহা উৎসাহে রান্না শুরু করে দিলে। রেড্ডীর ছাড়া সবার যজ্ঞোপবীত ছিল। 'ওর

কেন থাকবে না?' বলে তাকেও একটা পরিয়ে দিলে। খুব মজা হল আর খুব আনন্দ ক'রে খাওয়া-দাওয়া হল।'' রাজাগোপাল আইয়ার জিজ্ঞাসা করলে,''এই সময়ে কি ঠাকুমা এলেন?'' তিনি বললেন, ''হাঁ, তিনি সেই সময়ে এসেছিলেন আর নিজে রান্না ক'রে খাওয়া ঠিক করলেন। আমরাও আর একটা ছোট গুহায় তাঁর রান্নার ব্যবস্থা করে দিলাম। তিনিও রাজি হয়ে রান্না আরম্ভ করলেন আর আমায় বললেন, 'বেঙ্কটরমণ, আজ আমি রান্না করছি, অন্য কোথাও খেও না।' আমি বললাম 'আচ্ছা', তারপর তিনি চলে গেলে সবার সঙ্গে যেমন খাই খেলাম। গুহাটা একটু দূরে ছিল, মা কী করে জানবেন? মার রান্না হলে সেখানেও খেলাম। উনি ভাবলেন তাঁর কাছে ছাড়া আর কোথাও খাইনি।'' ভগবান বলে চললেন, ''আমাদের আত্মীয়দের মধ্যে একজন ঠাকুরদাদা ছিলেন। তিনি খুব গালমন্দ করতেন, তা সত্ত্বেও সবাই তাঁর রগুড়ে গালাগালি শোনার জন্য তাঁকে নিমন্ত্রণ করত। তিনি লোক ভাল ছিলেন, তাঁর কোন অসদভিপ্রায় ছিল না। আমি বিরূপাক্ষ গুহায় থাকা কালে একবার আমায় দেখতে আসেন। এসেই ঠাট্টা ক'রে বললেন, 'কি বেঙ্কটরমণ! তুমি নাকি মস্ত বড় সাধু হয়েছ! দেখি, মাথায় শিঙ বেরিয়েছে কি না?' মা যখন কাশী গিয়েছিলেন তখন এই সব হয়েছিল।'' ভগবানের মুখভঙ্গি ক'রে আর গলার স্বর অনুকরণ ক'রে এই গল্প বলা সত্যই বেশ উপভোগ্য হয়েছিল।

* * *

22শে আগস্ট, 1946

(67) অর্পণ

একজন অনেক দিনের নিয়মিত দর্শনার্থী ভক্ত এক সপ্তাহ আগে একটা তামিল বই 'তিরুবায়মোড়ি' (সহস্রগীতি) নিয়ে এসেছে। সে ভগবানকে বৈষ্ণব রীতিনীতির কথা বলতে লাগল। মনে হয়, সে সম্প্রতি 'সমাশ্রয়নম্' (দীক্ষা) নিয়েছে। সে একথা বললে ভগবান তাঁর একটা অভিজ্ঞতার কথা বললেন-

''যখন পাহাড়ে ছিলাম, তখন কয়েকজন বৈষ্ণব দেখা করতে আসত। জানো তো, বৈষ্ণবদের দু'টি দল 'বডগলই' ও 'টেন্‌গলই'। আমিও তাদের সঙ্গে যার যে মত সেই অনুসারে কথা বলতাম আমার এতে কিছুই ক্ষতি ছিল না। যাই হোক দলে ভিড়ে গেছি ভেবে তারা দীক্ষা নেওয়ার জন্য বললে অস্বীকার করতাম। তাদের বিশ্বাস দীক্ষা না নিলে বৈকুণ্ঠে ঢোকা নিষিদ্ধ। আমি জিজ্ঞাসা করতাম 'সশরীরে বৈকুণ্ঠে গিয়েছে এমন একজনকেও দেখাও দেখি?' তাদের মতানুসারে তারা সাযুজ্য (মিশে যাওয়া) মানে না। তারা বলে, 'মহাবিষ্ণু বৈকুণ্ঠে আছেন, মুক্ত পুরুষেরা তাঁকে ঘিরে বসে আছে ও সেবা করছে।' কী করে সবার স্থান হবে? ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে বসে বোধ হয়? ওরাই ভাল জানে। কেবল এই নয়। দীক্ষার সময়ে একটা মন্ত্র আছে যাতে তারা তাদের সর্বস্ব গুরুকে সমর্পণ করে। মন্ত্রটি কেবল বললেই আর গুরুকে দক্ষিণা দিলেই যথেষ্ট হবে। সমর্পণ হয়ে গেল তারপর যা ইচ্ছা করো, বৈকুণ্ঠে একটা বসার স্থান ভাড়া হয়ে গেল। আর কী চাই? অনেকের এইরূপ মত। অর্পণকে এত হাল্কা ভাবে নেওয়া একটা ছলনা। অর্পণের অর্থ মন আত্মায় মিশে গিয়ে এক হয়ে যাবে। তার অর্থ সকল বাসনা শূন্য হবে। আর এটা চেষ্টা ও ঈশ্বরের কৃপা না হলে হবে না। তুমি একান্তভাবে আত্মসমর্পণ না করলে ঈশ্বরের শক্তিও তোমায় গ্রহণ ক'রে নিজের মধ্যে টেনে নেন না। কিন্তু আমাদের আত্মসমর্পণটা কোথায়? আত্মাকে সমর্পণ করতে হবে। এটি না হওয়া পর্যন্ত অবিরত চেষ্টা করে যেতে হবে। বার বার চেষ্টা করলে তবেই না অবশেষে সফল হয়। একবার হলে আর ফেরা নেই। এটাই প্রকৃত পথ। কেবল বার বার 'অর্পণ' 'অর্পণ' উচ্চারণ করে কী লাভ? 'অর্পণ' শব্দটা ব'লে ক'টা টাকা দেওয়া ছাড়া মনের ওপর আর কী প্রভাব হয়? এই 'তিরুবায়মোড়ি'তে আত্মজ্ঞান লাভের পর ভক্তদের অদ্বৈতভাবের ক'টি গীত আছে। নাম্মালয়ার এরূপ একজন ভক্ত। তার একটি গানে, মা যেন মেয়ের আত্মজ্ঞান লাভকে নিন্দার ছলে প্রশংসা করছে, এই ভাব আছে। গানের সারাংশ– 'এ মেয়েটি বলে আমি শিব, আমি বিষ্ণু, আমি

ব্রহ্মা, আমি ইন্দ্র, আমি সূর্য, আমি পঞ্চভূত আর আমিই সব। বিষ্ণু কি এর ওপর ভর করেছেন আর এই সব বলাচ্ছেন, তা না হলে এর এমন বিকৃতি হওয়ার তো কথা নয়। বিষ্ণুই একে এমন করেছেন' (সহস্রগীতি 560-569)। গীতের এই সারমর্ম।'' সেই গীতগুলো পড়ে শোনানো হল আর ভগবান সেগুলোর ব্যাখ্যা করলেন।

এরপর তিনি আমাদের কাছে বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদ ব্যাখ্যা করলেন- ''যখন একজন ভক্ত অদ্বৈত ভাবের গান গাইলে, কোন কোন ভাষ্যকার তার অর্থটা ঘুরিয়ে তাকে বিশিষ্টাদ্বৈতভাবে ব্যাখ্যা করলে। ব্যস্ এ ছাড়া আর কিছু নয়। মহাজনদেরও এই মত। যাই হোক বিশিষ্টাদ্বৈতের অর্থটা কী? যা বিশিষ্ট (বিশেষ) ও শ্রেষ্ঠ তাই বিষ্ণু। তাই ঈশ্বর, সদাশিব, ব্রহ্ম আর সব। যা আছে সেটা এক। কোন কোন বৈষ্ণব এর নাম ও রূপ দেয় আর সালোক্য (একই লোকে বাস), সামীপ্য (নিকটে অবস্থান), সারূপ্য (একই রূপ লাভ) ছাড়া সাযুজ্যকে (ব্রহ্মে মিশে যাওয়া) পরব্রহ্ম ব'লে স্বীকার করে না। তারা বলে 'অর্পণ' 'অর্পণ'। 'আমি' বলে একটা বস্তু থাকলে তবেই না অর্পণ হয়। আগে নিজেকে না জানলে পূর্ণ সমর্পণ হতে পারে না। যদি এটা জানতে পারো তবে বুঝবে যে অবশেষে মাত্র একই থাকে। 'আমি' রূপ যে মন, সে স্বতঃই নিজেক সমর্পণ করে। আর সেটাই প্রকৃত অর্পণ (সমর্পণ)'', ভগবান শেষ করলেন।

* * *

23শে আগস্ট, 1946

(68) সাধনা- সাক্ষাৎকার

গত পরশু মাদ্রাজের একজন বিদ্বান ভদ্রলোক বিকাল তিনটার সময়ে ভগবানকে প্রশ্ন করলেন, ''কোনো সময়ে ভগবান কি কিছু কালের জন্য সাধনা করেছিলেন?'' ভগবান বললেন, ''সাধনা? কিসের সাধনা? সাধনা করার কী আছে? এইভাবে বসে থাকাই সাধনা। আমি এইভাবে বসে

থাকতাম। তখন চোখ বন্ধ করে থাকতাম, এখন খুলে রাখি এই পার্থক্য, এখন যা আছে তখনও তাই ছিল। তখন যা ছিল এখনও তাই আছে। 'আমি' আত্মা ছাড়া যদি অন্য কিছু থাকে তবেই না সাধনার প্রয়োজন হয়। নিত্য আত্মার দিকে না দেখে যারা অনিত্য শরীর ইত্যাদি দেখে বিভ্রান্ত হয় তাদেরই সাধনার প্রয়োজন হয়, কিন্তু যারা আত্মাকেই দেখে আর কোন কিছুই আত্মা থেকে পৃথক দেখে না তাদের সাধনার দরকার নেই। এ ছাড়া সাধনার আর কী প্রয়োজন?''

আর একজন জিজ্ঞাসা করলে, ''তবে কেন অনেক বই-এ বলে যে গুরু ছাড়া জ্ঞান হয় না?'' ভগবান বললেন, ''হাঁ, তবে যারা মনের সংস্কারের জন্য শরীরকেই আমি বলে ভ্রমে পড়ে তাদের এই ধারণা নষ্ট করার জন্য গুরু ও সাধনার দরকার।'' আর একজন জিজ্ঞাসা করলে, ''লোকে বলে যে যারা উপাসনা পেয়েছে তাদের ইষ্টদর্শন হয় আর অন্যান্য অলৌকিক অনুভূতি হয়। এর অর্থ কী?'' ভগবান বললেন, ''যা সর্বদাই আছে তাই 'সাক্ষাৎ'। এই 'আমি' ব্যক্তিটা সর্বদা আছে (সাক্ষাৎ) তাহলে 'কার'টা কী? যার দ্বারা সাক্ষাৎ হয় তাই 'কার'। সুতরাং 'সাক্ষাৎকারে'র অর্থ যা সত্য, যা শাশ্বত ও যা সর্বকারণ-কারণ সেটাকে তার নিজের আত্মা বলে জানা। ওরা বলে যে নিত্য, অস্তিত্বময় আত্মা যদি নিজের কামনানুসারে একটা রূপ তৈরি ক'রে ধ্যান করে তবে ঈশ্বর কোথাও থেকে এসে আবির্ভূত হবেন। তুমি সতত-বর্তমান, সর্বব্যাপী আত্মাকে ছেড়ে কোন দেবতা কোথাও থেকে আবির্ভূত হবেন এই আশায় সাধনা করো। আরও বলে যে ঈশ্বর আবির্ভূত হন আবার অন্তর্ধান করেন। তুমি নিত্য বর্তমান আত্মাকে ছেড়ে সাময়িক দর্শন ও বর লাভের জন্য চেষ্টা ক'রে আরও মানসিক অশান্তি ও যন্ত্রণা বাড়াবে। একজন যা আছে যদি তাই হয়ে থাকে তবে আর কোন কষ্ট নেই।''

যদিও ভগবান আমাদের এত স্পষ্ট ক'রে বোঝালেন যে অধিকারীর (সাধকের) চিন্তার অতীত হয়ে শুদ্ধ সত্তায় ও শুদ্ধভাবে থাকাই সাক্ষাৎকার

কিন্তু কী দুর্ভাগ্য যে আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমি যখন এরূপ ভাবছিলাম, তখন আর একজন জিজ্ঞাসা করলে, ''অধিকারীর মনের ঊর্ধ্বে বিশুদ্ধভাবে ও সত্তায় থাকা ভগবানের মতো ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক ও সম্ভব হলেও আমাদের মতো সাধারণ লোকের কি সাধনা ছাড়া তা হবে?'' ভগবান বললেন, ''নিশ্চয় হয়। সাধনা কিসের জন্য বলো? তার আত্মা সর্বকালে ও সর্বস্থানে আছে। সুতরাং এটা কোথাও থেকে চেষ্টা করে আনতে হবে না। সাধনা কেবল দেহাদি ভ্রান্তি যা আত্মার আত্ম-প্রকাশের বাধা হয়ে আছে সেগুলো দূর করা। সত্য আত্মাকে না দেখে শরীর সংক্রান্ত জগতকে সত্য বলে ভুল করা থেকেই এই ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এই ভুলটা ভাঙ্গার জন্যই সাধনা। না হলে আত্মার নিজেকে পাওয়ার জন্য আবার সাধনা কী? যে নিজের আত্মাকে উপলব্ধি করেছে, সে আর কিছু আছে বলে অনুভব করে না।''

* * *

24শে আগস্ট, 1946

(69) ব্রহ্ম সত্য- জগৎ ভ্রম

কিছুদিন আগে আশ্রমে নবাগত একজন ভগবানকে ইংরাজিতে কিছু জিজ্ঞাসা করলে, আমি ইংরাজি ভাষা না জানায় ঠিক ধরতে পারলাম না। যা হোক ভগবান তামিলে উত্তর দিলেন আর তার যতটুকু বুঝেছি লিখছি। ভগবান বললেন, ''প্রশ্ন হয়- বলা হয়েছে, ব্রহ্ম সত্য আর জগৎ একটা ভ্রম আবার এও বলা হয়েছে যে সবই ব্রহ্মের রূপ। দু'টি বাক্যকে কী করে সমন্বয় করা যায়? সাধক অবস্থায় জগৎ একটা ভ্রম বলতেই হবে। এ ছাড়া কোন উপায় নেই কারণ যখন কেউ নিজেকে নিত্য, সত্য ও সর্বব্যাপী ব্রহ্ম এ কথা ভুলে জগতে সে একটা দেহ আর জগৎ এরূপ অনেক অনিত্য দেহে পূর্ণ কল্পনা ক'রে কষ্ট পায় তাকে জগৎটা যে অসৎ ও ভ্রম সেটা মনে করাতেই হবে। কেন? কারণ তার দৃষ্টি নিজের আত্মাকে ভুলে বাহ্য জড়

জগতে বিচরণ করছে আর এই বাহ্য জড় জগৎটা অসৎ বলে একটা দৃঢ় ধারণা গঠিত না হলে, তার মন অন্তর্মুখীন হয়ে মনন করবে না। যখন সে একবার আত্মোপলব্ধি করবে আর বুঝবে যে নিজের আত্মা ছাড়া জগতে আর কিছু নেই তখন সে সমস্ত জগৎকে ব্রহ্ম বলে অনুভব করবে। তার আত্মা না থাকলে জগৎ নেই। যতক্ষণ মানুষ সব কিছুর মূল তার নিজের আত্মাকে না দেখে কেবল বাহ্য জগৎকে সত্য ও নিত্য বলে দেখে ততক্ষণ তাকে জগৎটা একটা ভ্রম বলতেই হবে। এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। একটা খবরের কাগজ দেখো। তুমি লেখাগুলো দেখো, যার ওপর লেখা সেই কাগজ দেখো না। লেখা থাক বা না থাক কাগজ আছে। যারা কেবল লেখাগুলোকেই সত্য বলে দেখে তাদের বলতে হবে যে ওগুলো অসৎ ও ভ্রম কারণ তাদের অস্তিত্ব কাগজের ওপর নির্ভর করে। জ্ঞানী কাগজ ও লেখাকে এক মনে করেন। ব্রহ্ম ও জগৎও সেইরূপ।

''সিনেমার বেলাও তাই। পর্দা সব সময়ে আছে, ছবি আসছে যাচ্ছে কিন্তু তাতে পর্দার কিছু হয় না। ছবি আসুক বা যাক তাতে পর্দার কী? ছবি কিন্তু পর্দার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু পর্দার তাতে কী এসে যায়? যে ব্যক্তি পর্দাকে না দেখে কেবল ছবি দেখে সে ছবির গল্পের সুখদুঃখে বিচলিত হয়। কিন্তু যে পর্দাকে দেখে, সে বোঝে যে ছবিগুলো সব ছায়া আর তারা পর্দা ছাড়া ও পর্দা থেকে পৃথক নয়। জগৎ সম্বন্ধেও তাই। এ সবই ছায়া–নাটক। প্রশ্নকারী উত্তর শুনে খুশি হয়ে বিদায় নিলে।

* * *

25শে আগস্ট, 1946

(70) স্বামী সর্বস্থানে

তুমি যে ইউরোপীয়দের পরিচয়পত্র দিয়ে পাঠিয়েছিলে তারা মোটরগাড়ি ক'রে গত পরশু এখানে এসে পৌঁছেছে। তাদের সঙ্গে একজন আমেরিকান মহিলাও এসেছে। গতকাল তারা শহর ঘুরে, স্কন্দাশ্রম হয়ে

দুপুরে আশ্রমে এল। ফিরে যাওয়ার সব ব্যবস্থা ক'রে তারা বেলা তিনটার সময়ে হলঘরে এল। তাদের মধ্যে বেচারি আমেরিকান মহিলাটি মাটিতে বসতে অনভ্যস্ত হওয়ায় আমার পাশে বসে ভগবানের দিকে পা ছড়িয়ে দিলে।

আমার এটা অভদ্রতা মনে হলেও একটু পরে চলে যাবে ভেবে চুপ ক'রে রইলাম। সেবক রাজাগোপাল আইয়ার কিন্তু সহ্য করতে না পেরে বিনীতভাবে তাকে পা মুড়ে বসতে বললে। ভগবান দেখলেন ও হেসে বললেন, ''যখন তাদের মাটিতে বসতেই এত অসুবিধা তখন তাদের কি জোর ক'রে হাঁটু মুড়ে বসতে বলা উচিত?'' ভক্তটি বললে, ''না, না আমি তা বলি নি, তারা হয়তো জানে না যে ভগবানের দিকে পা ক'রে বসা অভদ্রতা তাই বলে দিলাম, আর কিছু নয়।'' ভগবান হাল্কাভাবে বললেন, ''ও, তাই নাকি? অভদ্রতা, তাই বুঝি? তাহলে আমার পা ছড়িয়ে বসাও ওদের প্রতি অভদ্রতা। তুমি যা বলছ তা আমার পক্ষেও খাটে'' এই বলে পা মুড়ে বসলেন। আমরা সবাই হাসলাম, কিন্তু মনে ভয় হল। বিদেশিরা প্রায় আধঘন্টা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

ভগবান গতকাল প্রায় সমস্তদিন মাঝে মাঝে পা ছড়ালেও পাছে অভদ্রতা হয়ে যায় বলে পা গুটিয়ে বসে কাটালেন। তাঁর পা মুড়ে বসলে দশ মিনিটে পা ধরে যায় আর সেটা কাটাতে আধঘন্টা সোজা ক'রে ছড়িয়ে রাখতে হয়, তাছাড়া যন্ত্রণা তো আছেই। আজ দুপুরে হলঘরে বিশেষ কেউ ছিল না, মাত্র দু'তিন জন। ভগবান পা ছড়াতে ছড়াতে বললেন, ''কী জানি পা ছড়ানো ঠিক কি না ওরা বলে এটা অভদ্রতা।'' বেচারি রাজাগোপাল আইয়ার মনমরা ও অনুতপ্ত হয়ে সেখানে দাঁড়িয়েছিল। যাই হোক ভগবান করুণার অবতার। তিনি অভ্যাসমত পা ছড়িয়ে বসলেন। আমরাও বাঁচলাম। আমার দিকে চেয়ে আভৈয়ারের গল্প বলতে শুরু করলেন–

''কৈলাস থেকে আসা সাদা হাতিতে চড়ে সুন্দরমূর্তিকে যেতে দেখে চেরারাজা তার পঞ্চাক্ষরী মন্ত্ররূপ ঘোড়ার কানে ফিস্‌ফিস্ ক'রে কিছু বলে তাতে চড়ে কৈলাস চলল। আভৈয়ার সে সময়ে গণেশ্বরের পূজা করছিল ওদের দু'জনকে যেতে দেখে সেও কৈলাসে যাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি পূজা সারতে লাগল। তা দেখে গণেশ্বর বললেন, 'বুড়ি, তাড়াতাড়ি করতে হবে না। যেমন পুজো করো তাই করো। আমি তোমাকে ওদের থেকে আগে কৈলাসে নিয়ে যাব।' যাক্ পূজা তো সারা হল। তারপর গণেশ্বর হাতটি চারিদিকে ঘুরিয়ে বললেন, 'বুড়ি, চোখ বন্ধ করো।' ব্যস্ এইটুকু। আভৈয়ার চোখ খুলে দেখে যে, সে পরমেশ্বর ও পার্বতীর সামনে বসে আছে। সুন্দরমূর্তি ও চেরারাজা এসে দেখে যে, সে এসে বসে আছে। অবাক হয়ে তারা ও কী করে এল জিজ্ঞাসা করলে। তখন সে গণেশ্বরের সাহায্য করার কথা বললে। তখন তারা আভৈয়ারের ভক্তিই যে শেষ অবধি জয়ী হল দেখে খুব আনন্দিত হল।

''সেও খুব বৃদ্ধা ছিল তাই আমার মতো পরমেশ্বরের দিকে পা ছড়িয়ে বসেছিল। পার্বতীর তা সহ্য হল না। পার্বতীর মনে হল ঈশ্বরের দিকে পা ছড়ানো ঈশ্বরকে অপমান করা। তাই বেশ বিনীতভাবে বৃদ্ধাকে একথা জানাতে চেয়ে পরমেশ্বরের অনুমতি চাইলেন। ঈশ্বর বললেন, 'ও কথাটি বলো না। মুখ খুলো না। তোমার ওকে কিছু বলা উচিত হবে না।' তা সত্ত্বেও অর্ধাঙ্গিনী পার্বতী আর কী করে এই অপমান সহ্য করেন? বৃদ্ধাকে বলার জন্য চুপি চুপি একজন সখী পাঠালেন। সখী বৃদ্ধার কাছে গিয়ে বললে, 'ঠাকুমা, ঠাকুমা, ঈশ্বরের দিকে পা ছড়িও না।' সে বললে, 'তাই নাকি? বলো দেখি কোন্ দিকে ঈশ্বর নেই? আচ্ছা, এদিকে রাখব?' এই বলে পা এক দিকে সরালে, ঈশ্বরও সেইদিকে ঘুরে গেলেন আবার অন্যদিকে সরাতে ঈশ্বরও সেই দিকে ঘুরে গেলেন। এরূপে সে যেদিকে পা রাখে ঈশ্বরও সেইদিকে যেতে লাগলেন। তখন ঈশ্বর পার্বতীর দিকে চেয়ে বললেন, 'দেখলে তো। তুমি আমার কথা শুনলে না। দেখ, সে আমাকে কেমন ঘোরাচ্ছে, এইজন্যই আমি তোমাকে মুখ খুলতে বারণ করেছিলাম।'

পার্বতী তখন বৃদ্ধার কাছে ক্ষমা চাইলেন। যখন লোকেদের স্বামীর দিকে পা ছড়াতে বারণ করা হয়, এও সেই রকম। কোথায় তিনি নেই?''

একজন ভক্ত বললে, ''ঠিক এরূপ একটা ঘটনা নামদেবের গল্পেও আছে না?'' ভগবান, ''হাঁ, আছে'' বলে গল্পটা বলতে লাগলেন–

''নামদেবের খুব অহংকার ছিল যে বিঠ্ঠলদেব তাকে অন্যদের থেকে বেশি ভালবাসেন। সেজন্য জ্ঞানদেব ও আর সবাই একদিন নামদেবকে গোরাকুম্ভারের বাড়িতে পঙ্‌ক্তিভোজনে নিয়ে গেল। খাওয়া–দাওয়ার পর সবাই বসে কথাবার্তা বলছে, সে সময়ে একজন হেঁয়ালি ক'রে গোরাকুম্ভারকে বললে, 'তুমি ভাল হাঁড়িকুড়ি তৈরি করো, তাই না? আচ্ছা বলতো, এই পাত্রগুলোর মধ্যে কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ?' গোরা একটা কুমোরের লাঠি নিয়ে পালা ক'রে সবার মাথায় এক এক ঘা দিতে লাগল। তারা গোরাকে সমীহ ক'রে সবাই মাথা নিচু ক'রে বসে রইল। যখন নামদেবের পালা এল তখন সে আপত্তি করলে আর পরীক্ষা দিতে রাজী হল না। কুমোরও সঙ্গে সঙ্গে এটা কাঁচা বলে দিলে। সবাই খুব জোরে হেসে উঠল। নামদেব আর রাগ সামলাতে পারলে না। সে বলতে লাগল যে সবাই মিলে ষড়যন্ত্র ক'রে তাকে এভাবে অপমান করলে। এই বলে কাঁদতে কাঁদতে বিঠ্ঠলের কাছে অভিযোগ করতে গেল। ঠাকুর বললেন, 'আরে, কী হয়েছে?' নামদেব সব কথা বললে। 'সে তো বেশ কথা, কিন্তু বলো দেখি অন্যদের যখন পরীক্ষা করা হচ্ছিল তখন তারা কী বললে', ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন।

নামদেব– যখন লাঠি দিয়ে পরীক্ষা করা হল তখন তারা মুখ বন্ধ করে চুপ করে বসে রইল।

বিঠ্ঠল– আর তুমি?

নামদেব– আমি কি ওদের মতো? আমি তোমার কত প্রিয়। আমায় লাঠি দিয়ে পরীক্ষা করবে?

বিঠ্ঠল– এটা অহংকার। সবাই আমার প্রকৃত রূপ জেনে শান্ত। তোমার তা হয়নি।

নামদেব– আমার ওপর তোমার এত দয়া, আমার আর কী জানার আছে?

বিঠ্ঠল– তা ঠিক নয়। তোমায় সত্য জানতে হলে গুরুজনদের সেবা করতে হবে। আমি কী? তুমি নাচলে আমি নাচি, তুমি হাসলে আমি হাসি। তুমি লাফালে আমি লাফাই। যখন সত্য জানবে তখন আর লাফালাফি থাকবে না।

নামদেব– তুমি বলছ গুরুজন। তোমার থেকে গুরুজন আর কে আছে?

বিঠ্ঠল– কে? এই বনের মধ্যে একটা মন্দির আছে সেখানে একজন সাধু আছে। তার কাছে যাও তবে সত্য জানতে পারবে।

''নামদেব সেই বনের মধ্যে মন্দিরে গিয়ে দেখে যে একজন ধূলিধূসরিত লোক সেখানে শুয়ে রয়েছে। সে ভাবলে, 'এ আবার কী রকম সাধু?' কাছে গিয়ে দেখে যে তার পা শিবলিগের ওপর রয়েছে। দৃশ্য দেখে চমকে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'একী মহাশয়? আপনি ঈশ্বরের ওপর আপনার পা রেখেছেন!' সেই লোকটি বললে, 'ওহো! কে নাম নাকি? বিঠ্ঠল পাঠিয়েছে না?' এবার সাধু কী করে সব জানলে ভেবে অবাক হয়ে সে আবার জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা মহাশয়, আপনি একজন সাধু, তাই না? তবে লিগের ওপর পা রেখেছেন কী করে?' সে বললে, 'বাবা, তাই নাকি? তা তো জানি না। পা সরাতে পারি না। দয়া করে যেদিকে লিগ নেই সেদিকে পা দু' টা সরিয়ে দাও তো?' নামদেব রাজি হয়ে পা দু'টি তুলে অন্যদিকে সরাতে গিয়ে দেখে সেখানেও এক লিগ। এরূপে যেদিকে সরাতে যায় সেখানেই দেখে এক লিঙ্গ রয়েছে সুতরাং অবশেষে পা দু'টি নিজের মাথায় রাখলে আর সেও একটি লিগ হয়ে গেল। তার অর্থ পুণ্যময়

চরণ-স্পর্শে নামদেবের জ্ঞানোদয় হল। নামদেব বিহ্‌ল হয়ে উঠে দাঁড়াল। সেই সাধু বললে, 'এবার বুঝেছ (সত্য)?' 'হাঁ, আমি উপলব্ধি করেছি', বলে নামদেব জ্ঞানেশ্বরের শিষ্য বিসোবাকেসরের চরণে প্রণাম করে বাড়ি গিয়ে নিজের ঘরে বসে ধ্যানে তন্ময় হয়ে রইল, আর মন্দিরে গেল না।

''কিছুদিন পরে বিঠ্‌ঠল দৌড়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, 'নাম, একী, তুমি আজকাল আর আমার কাছে আসছ না যে?' নামদেব বললে, 'ও প্রভু! এমন থান কী আছে যেখানে তুমি নেই? আমি তোমায় সদা সর্বদাই দেখছি। আমিই তুমি আর তুমিই আমি। তাই আর তোমার কাছে যাই না।' 'ও আচ্ছা, সে বেশ ভাল', বলে বিঠ্‌ঠল অন্তর্ধান হয়ে গেলেন।''

ভগবান গল্পটি শেষ করলেন আর মোড়া পা দু'টি ছড়িয়ে বসলেন।

* * *

26শে আগস্ট, 1946

(71) অক্ষর স্বরূপম্‌

আশ্রমের বই কাগজ গোছানো, কেউ চাইলে বই দেওয়া মোটামুটি লাইব্রেরির কাজ করার জন্য রাজাগোপাল আইয়ার জুলাই মাসের শেষাশেষি বাড়ি ফিরে এসেছে।

আসার প্রথম দিকে, পড়ে থাকা কাগজপত্র খুঁজতে খুঁজতে সে একটা ছোট কাগজে ভগবানের হাতের লেখা একটা তামিল কবিতা ও তার নীচে তেলুগু অনুবাদ পেল।

ভগবানকে এটা দেওয়া হলে তিনি এটি যে কার লেখা মনে করতে না পেরে আমায় ডেকে সেটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে সেটা কার লেখা। ভাল ক'রে দেখে, দেখি যে সেটা সুন্দর মন্দিরের গৃহপ্রবেশের সময়ে তিরুচুড়ী সম্বন্ধে নরসিংহ সেট্টীর তামিল কবিতা আর নীচে আমার

লেখা তেলুগু অনুবাদ। ভগবানকে এ কথা বলার পর, আমি এটার একটা প্রতিলিপি চাইলে, তিনি রাজি হলেন।

সন্ধ্যায় বেদপারায়ণ হয়ে গেলে ভগবানকে প্রণাম ক'রে বাড়ি যাওয়ার উপক্রম করছি তখন ভগবান বললেন, ''আমার কাগজটা কই? যদিও তিনি কাগজটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে নকল ক'রে পরের দিন সকালে আনার কথায় রাজি হয়েছিলেন, তবু তাঁর সন্দেহ ছিল যে আমি কাগজ ফেরত দেব কি না! যখনই আমি তাঁর মুক্তার মতো অক্ষরে সুন্দর হাতের লেখা দেখি তখনই আমার রেখে দিতে ইচ্ছা হয়। ভগবান বুঝতে পেরে এই কামনা দূর করার জন্য কাগজটা ফেরত চাইলেন।

ভগবানকে দেখিয়ে আশ্রমের খাতায় টোকার জন্য সেই রাত্রে তেলুগু কবিতা ও তামিল কবিতাটা তেলুগু লিপিতে একটা কাগজে লিখে নিলাম। পরের দিন সকাল সাড়ে সাতটায় আশ্রমে গিয়ে ভগবানকে প্রণাম ক'রে উঠতেই, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ''কাগজটা কোথায়?'' আমি বললাম, ''হাঁ, সেটা এনেছি। আমি তামিল কবিতাটা তেলুগু লিপিতে লিখেছি। আপনি দয়া করে এটা ঠিক হয়েছে কি না দেখে দিলে খাতায় টুকে দেব'' তিনি দেখে ফেরত দিলেন। তিনি পাহাড় থেকে ঘুরে আসার আগে, আমি আশ্রমের খাতাটা তাক থেকে পেড়ে নিজের কাছে রাখলাম। এটা তিনি দেখেন নি। আমি যেই কাগজ ও আমার ব্যাগ নিয়ে বাইরে যাওয়ার জন্য উঠেছি ভগবান বললেন, ''নকল করে কাগজটা আমায় ফেরত দিও। আমার দরকারে লাগবে।'' বারবার এই কাগজ চাওয়াতে আমার খুব অপমান বোধ হল। আর না থাকতে পেরে বললাম, ''এই লেখার কাজে কত কাগজ আমার হাত দিয়ে গেছে, আমি একটিও রাখিনি। সব ফিরিয়ে দিয়েছি। (রাজাগোপাল আইয়ারকে দেখিয়ে) ইনি সাক্ষী আছেন।'' আমি একথা বলাতে রাজাগোপাল বললে, ''হাঁ, ঠিক।'' তবুও না চাপতে পেরে বললাম, ''এটা সেই তেলুগু প্রবাদের মত 'জোর যার মুলুক তার।'' সবাই চাইছে আর ভগবানের হাতের লেখা পেয়ে যাচ্ছে। তারা এরকম কাগজ

পেলে নিঃশব্দে নিজেদের কাছে রেখে দেয়। এই সামান্য কাগজের জন্য কি আমি আসল সত্য থেকে চ্যুত হব? আমার মোটেই চাই না। এখুনি দিয়ে দিচ্ছি,'' বলতে বলতে গলা ধরে এল, চোখে জল এসে গেল। আর সামলাতে না পেরে বাইরে গিয়ে কোন রকমে নকল ক'রে খাতাখানি ভগবানের হাতে আর কাগজটা নিকটে দাঁড়ানো রাজাগোপালকে দিয়ে ভাঙ্গা গলায় বললাম, ''আমি এঁকে কাগজ দিয়ে দিয়েছি।''

ভগবান স্নেহভরে নরম সুরে বললেন, ''ইচ্ছা হলে রাখতে পারো।'' আমার কি আত্মসম্মান নেই? ''কেন? এই অক্ষর মুছে যাবে, এ কাগজ ছিঁড়ে যাবে,'' ভাঙ্গা গলায় বলি। নিজের জায়গায় বসতে যাচ্ছি, ভগবান মৃদুস্বরে বললেন, ''তোমার লেখা পদটা তোমার কাছে আছে?'' নিঃশ্বাস বন্ধ করে বলি, ''হাঁ''। বাইরে কিছু হয়নি ভাব দেখালেও ভিতরে অহংকারের অত্যাচার চলছিল।

দু'তিন বছর আগে ভগবান একটা কবিতা লিখেছিলেন। লোকেরা ভগবানের হাতের লেখা কবিতাটার জন্য কাড়াকাড়ি করেছিল। একজন তাঁর হাতের লেখাটা রাখার সুযোগ পেয়ে সেটা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার ক'রে আত্মসাৎ করেছিল। এইসব দেখে আর মনে যাতে এরূপ ইচ্ছা না হয় ভেবে একটা তেলুগু কবিতা লিখে সান্ত্বনা লাভ করেছিলাম।

হৃদয়কমল দশংবুলণ–জেদরকুণ্ড
নক্ষর স্বরূপুংডবৈ ষলরু নিন্নু
গর্মবাসন মসকছেং গাংচলেক
হস্তলিখিতাক্ষরমুগোর নগুনে রমণ॥
মম হৃয়দয়কমল মধ্যে, হে রমণ!
অক্ষর স্বরূপে সদা বিরাজমান।
হস্তলিখিতাক্ষরে কিবা প্রয়োজন
কর্ম বাসনা জাল ঢেকেছে নয়ন॥

যদি মাঝে মাঝে চোখ ধুয়ে এই আবরণ দূর করা যায় তবে অক্ষর স্বরূপকে স্পষ্ট দেখা যায়। এই বর্ণ (অক্ষর) মুছে যাবে না, এই কাগজ (হৃদয় কমল) ছিঁড়ে যাবে না। যারা জোর ক'রে দাবি করে তারা যদি এই অক্ষর পেয়ে যায় আর নীরব সন্তানের চোখের ধাঁধা যদি ঘুচে যায় তাহলেই আমরা কৃতকৃত্য হই। তখন শিশুটি নিজের ভার নিজেই নেবে। 'ভব-রোগ ভিষগ্ রমণ নামটা তো দেওয়াই আছে। তিনি কি নামের উপযুক্ত কাজ করবেন না? দেখা যাক। একটা জিনিস কিন্তু আছে। তিনি ওষুধ সব সময়ে দিয়ে যাচ্ছেন। চোখের ঘোরও একটু একটু ক'রে কাটছে।

* * *

27শে আগস্ট, 1946

(72) উপদেশ সার

'উপদেশ সারের' মালয়ালাম অনুবাদ 'কুম্মি পট্টু' ভগবান নিজে তেলুগু লিপিতে লিখে রেখেছেন। 1944 সালে আমি সেটা নকল করার জন্য ভগবানকে ব'লে নিয়েছিলাম। নকল ক'রে যখন মূলটা ফেরত দিচ্ছি তখন একজন ভক্ত ভগবানকে বললে, ''মুরুগনার শিবলীলা অর্থাৎ দারুকবনের তপস্বীদের দেওয়া শিবের উপদেশ যখন লিখেছিল তখন ভগবান 'উপদেশ সার' লেখেন, তাই না?''

ভগবান বললেন, ''হাঁ, সে কেবল দারুকবনের তপস্বীদের কথাই লেখেনি। সে ভেবেছিল ঈশ্বরের সব অবতারের কথা আমার ওপর আরোপ ক'রে একশ' শ্লোক লিখবে। সে চলিত গাথা 'উনদিপারা' দিয়ে শুরু ক'রে সত্তরটা শ্লোক লেখে। এর শেষের দিকে দারুকবনের তপস্বীদের কথা ছিল আর আমায় উপদেশমূলক বাকি তিরিশটা শ্লোক লিখতে অনুরোধ করে। আমি বললাম, 'তুমি সব লিখেছ। আমার আর কী লেখার আছে? ওটাও লিখে ফেল।' কিন্তু সে অনেকদিন কিছুই লিখলে না। সে উপদেশ সম্বন্ধে কিছু জানে না এই অজুহাতে আর ভগবানই এটা লিখতে পারেন

বলে আমায় পীড়াপীড়ি করতে থাকল। আমি আর কী করি? উপায়ান্তর না দেখে আমাকেই লিখতে হল। এই তিরিশটা শ্লোক লেখা হলে একে 'উপদেশ' (উনদিয়ার) নাম দেওয়া হল। এটা লেখা হলে যোগী রামিয়া বললে যে, সে তামিল জানে না আর সে তেলুগুতে লেখার জন্য অনুরোধ করতে লাগল, তাই 'দ্বিপদ' লিখলাম। তারপর নায়না বললে, 'সংস্কৃতে হবে না?' আমিও রাজি হয়ে সংস্কৃতে লিখলাম। যখন তিনটি ভাষায় লেখা হয়ে গেল তখন কুঞ্জস্বামী, রামকৃষ্ণ ও অন্যেরা মালয়ালামে লেখার জন্য ধরে বসল আর তাই 'কুম্মি পট্টু' ছন্দে মালয়ালামে লিখলাম।

আমি বললাম, ''তাহলে মূল হল তামিল, তারপর তেলুগু, তারপর সংস্কৃত আর শেষে মালয়ালাম অনুবাদ, তাই না?'' ভগবান বললেন, ''হাঁ''। আমি বলি, ''নায়না 'উপদেশ সার' শ্লোকগুলো দেখে তৎক্ষণাৎ একটা ছোট ভাষ্যও লিখেছিল, তাই না?'' ভগবান বললেন ''হাঁ, সে তখন আম্র (চূত) গুহায় থাকত। শ্লোকগুলো লিখে তার কাছে পাঠালাম। সে বললে, 'আমরা কি এরকম একটাও শ্লোক লিখতে পারি?' বলে সবাইকে দেখিয়ে, কোন এক গ্রহণের দিন একটি লঘুভাষ্য লিখেছিল। এগুলো 1928 সালে ছাপা হয়।''

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ''সদ্‌বিদ্যা কী ক'রে লেখা হল?'' ভগবান বললেন, ''সেটাও মুরুগনারের পীড়াপীড়িতে তামিলে লেখা হয়। সে সময়ে যোগী রামিয়াও সেখানে ছিল। সে অনুরোধ করে যে অন্ততঃ মূল ভাবটা তেলুগুতে লেখা হোক তাই সেটা গদ্যে লিখি। তারপর মাধব ধরলে, 'মালয়ালামে হবে না?' আমিও 'হাঁ' বলে সেই ভাষায় 'কিলি' ছন্দে ওটা লিখি। সেটা অনেকটা 'শীষ মালিকা' ছন্দের মত। এটা আমি তেলুগু লিপিতে লিখি। তোমার ইচ্ছা হলে একটা নকল রাখতে পারো।''

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ''ভগবান সংস্কৃতে কেন লিখলেন না?'' ভগবান বললেন, ''সে সময়ে নায়না, লক্ষ্মণ শর্মা আরও অনেকে এখানে ছিল। তাই তাদের ওপর ছেড়ে দিলাম। ভাবলাম আমি আর চিন্তা করি কেন

তাই চুপ ক'রে রইলাম।'' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ''নায়না কি 'সদ্‌বিদ্যার' সংস্কৃত শ্লোকগুলো তখন লেখেন? ভগবান বললেন, ''না। মুরুগনার ও আমি যখন শ্লোকগুলো বাছাই করছিলাম, তখন নায়না আমাদের পরামর্শ দিয়েছিল কিন্তু লেখেনি। তারপর সে শির্‌সী চলে গেল। যখন সে ওখানে ছিল তখন বিশ্বনাথ ও কাপালী গিয়ে তার সঙ্গে কিছুদিন ছিল। ইতিমধ্যে লক্ষ্মণ শর্মা সদ্‌বিদ্যার সংস্কৃত শ্লোকগুলো (সদ্‌দর্শন) লিখলে। দেখে সংশোধন করে ফেরত পাঠাবার জন্য নায়নাকে সেগুলো পাঠানো হল। নায়না সেগুলো দেখে বললে যে সংশোধন করার থেকে সে নিজেই লিখে ফেলবে, তাই সেগুলো ফেরত পাঠালে। পরে বিশ্বনাথ ও কাপালীর সাহায্যে তামিলের হুবহু সংস্কৃত অনুবাদ ক'রে ঠায়। আগেরগুলো অমনি রইল। আর নায়নারটা 'সদ্‌দর্শন' শিরোনামা দিয়ে ছাপানো হল। যা হওয়ার তাই হয়। আমরা কী করতে পারি? সেই সংস্কৃত শ্লোক অনুসারে কাপালী তার ইংরাজি ও সংস্কৃত ভ্যা লেখে। তারপরে বিশ্বনাথ সেই ভাষ্য তামিলে অনুবাদ করে।''

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ''অনুবন্ধ অংশটা কী করে লেখা হল? ভগবান বললেন, ''আমি এগুলো কোন বিশেষ কারণে লিখিনি। কেউ কখনো একটা কবিতা চাইলে একটা লিখতাম, সেইগুলো নিয়ে 'অনুবন্ধ' হয়। প্রথম সংস্করণে তিরিশটা শ্লোক ছিল, পরে চল্লিশে দাঁড়ায়। প্রথমে এগুলো তামিলে লেখা হয়, পরে তেলুগুতে ও আরও পরে মালয়ালামে লিখি। কতগুলো শ্লোক পুরাকালের মহাত্মাদের লেখা আর কতগুলো যে আমার গদ্য লেখা অনুসরণ করত সেই লক্ষ্মণ শর্মার লেখা।'' আমি জিজ্ঞাসা করি, 'কতগুলো নিশ্চয় ভগবানের লেখা?'' ভগবান বললেন, ''আমি বোধহয় মাত্র দু'তিনটি লিখেছি।'' ''ভগবান নিশ্চয় তেলুগুতেও কিছু কবিতা লিখেছিলেন,'' আমি বললাম। ভগবান বললেন, ''হাঁ, থাকতে পারে, ইচ্ছা হলে পাণ্ডুলিপি দেখতে পারো। সেখানে সব বিবরণ পাবে।''

* * *

28শে আগস্ট, 1946

(73) মনই 'আমি'

আজ সকালে একজন আন্ধ্র ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, ''আপনি বলেন, অনুসন্ধান করা দরকার আর আমি কে খুঁজে পেতে হবে কিন্তু কী করে খুঁজে পাওয়া যায়? আমরা কি 'আমি কে?' 'আমি কে?' কিংবা 'নেতি' 'নেতি' জপ করব? আমায় সঠিক উপায়টি বলুন, স্বামী।'' একটুক্ষণ নীরব থেকে ভগবান বললেন, ''কী খুঁজে পেতে হবে? কে খুঁজে পাবে? খুঁজে দেখার জন্য একজন কেউ রয়েছে তো, রয়েছে না? সেই লোকটি কে? কোথা থেকেই বা সে এল? এটাই আগে খুঁজে পেতে হবে।''

প্রশ্নকারী আবার বললেন, ''আমি কে খোঁজার জন্য আমার একটা সাধনা থাকবে তো? কোন্ সাধনাটা ভাল?'' ভগবান বললেন ''হাঁ, এটা সেই, যাকে খুঁজে পেতে হবে। তুমি যদি জিজ্ঞাসা করো কোথায় খুঁজবে, আমরা বলব অন্তরে দেখো। এর কী আকার, কোথায় জন্মালো, কী করে জন্মালো এটাই তোমায় দেখতে হবে বা অনুসন্ধান করতে হবে।'' জিজ্ঞাসু বললেন, ''আমরা যদি 'আমি' কোথায় জন্মায় জিজ্ঞাসা করি, প্রাচীনেরা বলেন হৃদয়ে। কী করে দেখব?''

ভগবান বললেন, ''হাঁ, আমাদের হৃদয়কেই দেখতে হবে। এটি দেখতে হলে মনটি একেবারে ডুবিয়ে দিতে হবে। 'আমি কে' 'আমি কে' জপ বা 'নেতি' 'নেতি' শব্দ উচ্চারণ করে লাভ নেই।'' প্রশ্নকারী যখন বললেন যে ঠিক এটাই তিনি করতে পারছেন না, তাতে ভগবান উত্তর দিলেন, ''হাঁ, তা ঠিক। এইটাই কঠিন। আমরা সব সময়ে আর সব জায়গায় রয়েছি। এই শরীর ও শরীর সংক্রান্ত অন্যান্য জিনিস আমরাই জড়ো করেছি। এগুলো সংগ্রহ করতে কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু এগুলো ত্যাগ করাই কঠিন। যা আমাদের অন্তর্নিহিত সেটা দেখতেই যত কষ্ট বহিরঙ্গগুলো দেখতে নয় দেখ দেখি কী দুর্ভাগ্য!''

কিছুদিন আগে একজন বাঙালি ছেলে অনুরূপ প্রশ্ন করলে, ভগবান তাকে বিস্তারিত ভাবে বোঝালেন। তার সংশয় নিরসন না হওয়ায় সে জিজ্ঞাসা করলে, ''আপনি বলছেন আত্মা সব সময়ে ও সব জায়গায় আছে। সেই 'আমি'টা ঠিক কোথায়?'' ভগবান হেসে উত্তর দিলেন, ''আমি বলছি তুমি সবস্থানে ও সবকালে রয়েছ আর তুমি বলছ সেই 'আমি'টা কোথায় এটা ঠিক যেন তুমি তিরুভণ্ণামলই-এ এসে জিজ্ঞাসা করছ তিরুভণ্ণামলই কোথায়? যখন তুমি সব জায়গায় তখন তুমি কোথায় খুঁজবে? আসল ভ্রম হল, তুমি একটা শরীর এই বোধ। যখন তুমি এই ভুলটা দূর করবে তখন যা থাকবে তাই তোমার আত্মা। যা তোমার কাছে নেই সেটাই তোমার খোঁজা উচিত কিন্তু যা সব সময়ে তোমার কাছে রয়েছে তাকে খোঁজার কী প্রয়োজন? তুমি একটা শরীর এই ভ্রম ভাঙ্গাবার জন্যই সাধনা। 'আমি আছি' এ জ্ঞান সর্বদাই রয়েছে, একে আত্মা, পরমাত্মা যা খুশি বলতে পারো। 'আমি দেহ' এই বোধটা ত্যাগ করতে হবে। আত্মারূপে যে 'আমি' তাকে খোঁজার কিছু নেই। সেই আত্মা সর্বব্যাপী।''

এর উদাহরণস্বরূপ 'উন্নাদিনালুবদি'তে লেখা ভগবানের কথা তুলে দিচ্ছি-

আমি ছাড়া স্থানকালের প্রত্যয় কোথায়?
যদি আমি দেহ তবে এ দুটি প্রত্যয়।
কিন্তু সত্যই কি 'শুদ্ধ আমি' দেহ ?
'আমি' এক নিত্য অতীতে অনাগতে
একই এখানে ওখানে সর্বস্থানে।
এক সর্বব্যাপী কালাতীত সত্তা,
একক অস্তিরূপে হয় অনুভূত॥

সদ্‌বিদ্যা- 16

* * *

৪ই সেপ্টেম্বর, 1946

(74) সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

কয়েকজন গুরুবন্ধু আমাকে 1লা সেপ্টেম্বর পালিত সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের কথা লিখতে অনুরোধ করেছে তাই এই চিঠি লিখছি। যারা এ বিষয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল তারাও জানে না যে কী ভাবে কী হল। সে ক্ষেত্রে আমি স্ত্রীলোক ও সাধারণ দর্শক হয়ে কী করে কী হল তার আর কী জানব না বুঝব? যাই হোক, ভাগবত বক্তার সেই কথাটা, ''আমি জ্ঞানীদের কাছে যতদূর শুনেছি, দেখেছি ও বুঝেছি, সেই মতো ব্যাখ্যা করব,'' মনে রেখে চেষ্টা করছি।

উৎসবের কুড়িদিন আগে সর্বাধিকারী মাদ্রাজ থেকে ফিরলেন। তখন তাঁর মাদুরাই যাওয়া প্রায় মাসখানেক হয়ে গেছে। মনে হয় তিনি মাদ্রাজে পৌঁছালে ভক্তেরা তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে উৎসবের পরামর্শ করেছিল কিন্তু তিনি তিরুভণ্ণামলই এসে না পৌঁছানো অবধি উৎসবের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। জানি না অন্য কোথাও লোকেরা ইংরাজি 'স্মারক' গ্রন্থ ছাপানো বিষয়ে খুব পরিশ্রম করছিল কি না, এখানে কিন্তু হলঘরে কাউকেই উৎসব সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহিত হতে দেখা যায়নি কেবল ভগবানই যা ভক্তদের অনুরোধে পুরাতন খাতাপত্র থেকে ইংরাজিতে অনুবাদ করার জন্য সংস্কৃত শ্লোকগুলো খোঁজার ভান করছিলেন। সর্বাধিকারী ফিরে আসা মাত্রই উৎসবের কাজ পুরোদমে আরম্ভ হল। অফিসে কী আলোচনা হল বা কে পরামর্শ দিল জানি না কিন্তু হলঘরের উত্তরে পাহড়ের দিকে একটা বড় চালা তৈরি শুরু হল। গত একমাস ধরে কৃষ্ণমূর্তির শরীর খারাপ যাচ্ছিল। যা হোক চালা তৈরি শুরু হতেই তার দুর্বলতা চলে গেল। আর সে যেন বিপুল শক্তি লাভ করলে মই বেয়ে ওঠা, নারিকেল পাতা সেলাই করা আরও নানা কাজে লেগে গেল। শামিয়ানা তো হল। ওরা ঠিক করলে যে জমিটা সিমেন্ট করা হবে। সুতরাং জল ঢালা, পেটানো আরও হরেক

রকম কাজে কৃষ্ণমূর্তির যেন অসুরের বল দেখা গেল। গল্পে আছে যে হনুমান প্রথমে লেজ গুটিয়ে পাখির মতো বসেছিল কিন্তু যেই সে শুনলে যে সমুদ্র লঙ্ঘন করতে হবে অমনি বিশ্বরূপ (বিরাট রূপ) ধরে, কত কি না করলে। বলা হয় যে ঈশ্বরের ভক্তেরা সময় হলে তাঁরই বলে বলীয়ান হয়ে পরোপকারের জন্য কত কাজ করেন, এও একটা দৃষ্টান্ত।

প্রায় কুড়িদিন আগে তুমি শ্রীচিন্তা দীক্ষিতুলুর গান ও প্রবন্ধ আর আমার গোব্রী গীত উৎসবের আগে ছাপাবে বলে নিয়ে গেছ মনে আছে? এরপর মুরুগনার ও আরও কয়েকজন গান ও কবিতা লিখে ছাপাতে দিয়েছে। কাপালী শাস্ত্রীর লেখা 'শ্রীরমণগীতার' ছাপানো সংস্কৃত ভাষ্য এসে গেছে। পঞ্চাশটা সোনালি তারা আঁকা ইংরাজি নিমন্ত্রণ পত্র ভক্তদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

পঞ্চাশ বছর পূর্বে জন্মাষ্টমীর আগের দিন ভগবান আরিয়ানাল্লুরে পৌঁছেছিলেন। সেদিন রবিবার ছিল। সোমবার অষ্টমীর দিন কিলুরের মুথুকৃষ্ণ ভাগবতারের বাড়িতে ভাল ক'রে আহার করে মঙ্গলবার নবমীর দিন সকালে তিনি অরুণাচল ক্ষেত্রে পা দিলেন। সবাই জানে যে সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত তিনি এখান থেকে কোথাও যান নি। সেটা ছিল 1896 সালের 1লা সেপ্টেম্বর। অন্যান্য মহাদেশের ভক্তদের সুবিধার জন্য ইংরাজি (গ্রীগোরিয়ান) দিন-পঞ্জি মতে 1লা সেপ্টেম্বর উৎসব পালনের দিন ধার্য করা হয়েছে।

হিন্দুমতে (তিথি অনুসারে) জন্মাষ্টমীর পরের দিনটি সুবর্ণ-জয়ন্তী দিবস। ঈশ্বরের কী লীলা জানি না এবারও জন্মাষ্টমী সোমবারে পড়ল (19শে আগস্ট, 1946), পরের দিন মঙ্গলবার। রামস্বামী আইয়ার ও আরও একজন কয়েকজন বললে যে তামিল মতানুসারে এই দিনে উৎসব পালন করা উচিত সুতরাং সে ও অন্য ভক্তেরা তামিলে গান লিখে গাইলে ও কবিতা আবৃত্তি করলে। শ্রীশম্বাশিব রাও বললে যে তেলুগু মতে বুধবার অবধি নবমী রয়েছে সুতরাং 21শেই পঞ্চাশ বছর পূর্তি দিবস। এই বলে সে

ভাগবত থেকে 'নীপদ কমল সেবয়ু' (তব চরণ কমল সেবায়) নামে একটি শ্লোক ও পদ্য লিখে ভগবানকে অর্পণ করলে। আরও একজন কবিতা, গান ও প্রবন্ধ লিখে পাঠ করলে। এইরূপ স্তোত্রপারায়ণ (প্রার্থনার আবৃত্তি) দু'দিন আগে অবধি চলছিল।

23শে রেল ধর্মঘট আরম্ভ হল। ভক্তেরা কী করে আসবে ভেবে আমরা চিন্তিত হলাম। যারা 29শে-র মধ্যে কাট্‌পদী স্টেশনে এসে গিয়েছিল তারা কোনো প্রকারে বাস বা লরি করে এল। চতুর্থীর দিন মন্দিরে বিনায়ক (গণেশ) পূজা হল। চালা বা 'জয়ন্তীহলের' পাশে বিয়ে বাড়ির মতো একটা বিরাট শামিয়ানা খাটানো হয়েছে। কেউ বললে পাতার মালা দিয়ে সোফাটা সাজালে ভাল হয়।

সব বক্তারা রাত্রি বারোটার মধ্যে বাসে করে এসে গেল। উৎসব আগামীকাল আরম্ভ হবে। অনেক রাত্রি অবধি আলাপ-আলোচনার পর শুতে গেলাম। অভ্যাসমত ভোর 5টায় আশ্রমে গিয়ে দেখি 'ন কর্মণা' পাঠ হয়ে গেছে। মনে হয় এরা সময়টা এক ঘন্টা এগিয়ে দিয়েছে। আশ্রমের বিদ্যার্থীরা পূজার সামগ্রী এনে ভগবানের সামনে রেখে প্রণাম ক'রে মন্দিরে নিয়ে গেল। অসাবধানতার জন্য নিজেদের গালাগালি দিতে দিতে শামিয়ানার কাছে গিয়ে সাজানো দেখে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। চারিদিকে লাল কাপড়ের ঝালর লাগানো হয়েছে, ফুল, আম পাতার মালা আরও অন্যান্য জিনিস দিয়ে সাজানো হয়েছে। সম্প্রতি বরোদার রানি মন্দিরের জন্যে যে সকল জরি দেওয়া শাড়ি পাঠিয়েছিলেন তাই দিয়ে পর্ণশালা বা 'জয়ন্তী হলের' উত্তর দিকে রাখা পাথরের সোফাটা মন্দিরের মত ক'রে সাজানো হয়েছে। শাড়ির রুপালি জরি ভোরের আলোয় ঝলমল করছে। শাড়িগুলো মন্দিরের দেবীর জন্য পাঠানো হয়েছিল কি না জানতে চাইলে একজন ভক্ত বললে আগে ভগবানের সোফা সাজিয়ে তারপর দেবীদের সাজানো হবে। আর একজন বললে চমৎকার হয়েছে। কাল রাত্রি

9টা অবধি কিছুই ছিল না। ভোর পাঁচটার মধ্যে এই সব সাজানো হয়েছে, তাহলে বলতে হবে যে ভক্তরা সারারাত কেউ ঘুমায়নি। অন্যান্য ভক্তরা কী করে এল জানি না কিন্তু সকালে দেখি স্থানে স্থানে দলে দলে লোক জিনিসপত্র নিয়ে বসে আছে।

ভগবান ছ'টার মধ্যে স্নান ও প্রাতরাশ সেরে অরুণাচলের দিকে বেড়াতে গেলেন। তিনি ফিরে আসার আগেই কৃষ্ণমূর্তি সোফার ওপর আসল খদ্দরের কাপড় পেতে তার ওপর সদ্য কেনা চরকা আঁকা তিনরঙ্গা পতাকা বিছিয়ে দিলে। বাড়িয়ে বলছি না, অনেক জমকালো সাজানোর মধ্যে জাতীয় পতাকাপাতা বসার জায়গাটি সাদাসিধা বলেই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। এই অবসরে মনে করা যেতে পারে সেপ্টেম্বর মাসে জওহরলাল নেহরুও প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন।

7টার মধ্যে ভগবানও অভ্যাসমত কৌপীন পরে ও তাঁর অপূর্ব হাসিটি নিয়ে ভক্তদের আশীর্বাদ করার জন্য সোফায় এসে বসলেন। তাঁর ক্ষমাসুন্দর অমিয়মধুর চাহনি ভক্তদের প্রাণে আনন্দের জোয়ার বইয়ে দিলে। সেদিন তাঁর দর্শন পাওয়া পরম সৌভাগ্য বলতেই হবে। পুরাকালে বাল্মীকি, ব্যাস ও আরও অনেকে ঈশ্বরের রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি অবতাররূপে যুগে যুগে ধর্ম স্থাপনের জন্য পৃথিবীতে আসার কথা বলেছেন– 'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে' (গীতা 4৪)। সেটা দেখার সৌভাগ্য আজ আমাদের হল। একজন অবতারকল্পপুরুষ, জগদ্‌গুরু শ্রীরমণ পরমাত্মা অরুণাচল ক্ষেত্রে পঞ্চাশ বছর বাস ক'রে কেবলমাত্র তাঁর দৃষ্টি দিয়ে মানুষের অন্তঃকরণ পবিত্র করেছেন। যারা তাঁকে অনন্য ভক্তিতে সেবা করে, তিনি তাঁর মৌন শিক্ষার দ্বারা তাদের বন্ধন মুক্ত ক'রে মোক্ষ দান করেন। আমাদের উচিত বাজে কাজে সময় নষ্ট না ক'রে তাঁর সেবা করা। এই সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবই তাঁর পঞ্চাশ বৎসর গুরুপদে অধিষ্ঠানের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অনেক ভক্ত বলে সুবর্ণ যুগ বা নূতন যুগ। এতদিন ধরে বহু ভক্ত তাঁর করুণা লাভ ক'রে শান্তি পারাবারে অবগাহন ক'রে ধন্য হয়েছে।

আরও কত লোক হবে। আজ পর্যন্ত আমি তাঁর মহত্বের পূর্ণরূপ অনুভব করিনি। আমার মতো অনেকেই জানে না যে এই করুণাঘন মূর্তরূপ তাঁকে সেবা করার কত সুযোগই না আমাদের দিয়েছেন। আর সব সুযোগের মধ্যে মনে হয়, সুবর্ণ জয়ন্তী সবার সেরা। এখনও অবধি আমি এ মহান ঋষির কী সেবা, কী প্রার্থনা, কী উপাসনা- কিছুই জানি না। সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী ও বুদ্ধির অগম্য বস্তু যদি নরদেহে আবির্ভূত হন তাহলে আমরা তাঁকে দেব-ই বা কী, আর সন্তুষ্টই বা করব কী দিয়ে? মৌনতাই তাঁর প্রকৃত পূজা। এ পূজা আমার অসাধ্য ব'লে দূরে দূরে থাকি, আর আশায় থাকি যদি তাঁর চরণধূলিতে আমার মুক্তি হয়, এইটুকুই আমার কামনা। প্রকৃত মুমুক্ষুদের প্রতি কৃপা বিতরণ ক'রে তাঁর করুণাশিসে সবার জীবন ভরে দিয়ে বহুকাল তিনি আমাদের মধ্যে থাকুন, এ ছাড়া আর কী কামনা করা যায়?

আর একটা চিঠিতে সকাল 7টা থেকে সন্ধ্যা 7টা 15 মিনিট অবধি দিনপঞ্জির বিবরণ লিখে পাঠাব।

* * *

9ই সেপ্টেম্বর, 1946

(75) সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন

গতকালের চিঠিতে সাধারণভাবে জয়ন্তী উৎসবের বর্ণনা লিখেছি। আজ সকাল 7টা থেকে সন্ধ্যা 7টা 15 মিনিট অবধি যা হল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি।

সকালের কর্মসূচী 7টা 15 মিনিটে উমা ও অন্যান্য পুণ্যস্ত্রীদের (এয়োস্ত্রী) ভজন গানের সহিত দুধ ভরা ঘট এনে ভগবানের চরণে অর্পণ করা দিয়ে শুরু হল। তারপর কয়েকজন ভক্ত সংস্কৃত, তামিল, তেলুগু, কান্নাড়া, ইংরাজি, উর্দু ইত্যাদি ভাষায় প্রবন্ধ, গীত ও কবিতা পাঠ করলে। মাঝে একটু বিরাম দিয়ে এরূপ পাঠ বেলা দুটো অবধি চলল। 8টা 30 মিনিট থেকে 9টা 30 মিনিট অবধি বুদালুর কৃষ্ণমূর্তি শাস্ত্রীর সমবেত গান

হল পৌনে 9টা থেকে 10টা অবধি বিশ্রাম। 10টা 15 মিনিটে মাতৃভুতেশ্বর মন্দিরে পূজা। 11টায় সময়ে ভক্তেরা অরুণাচলেশ্বর মন্দির থেকে অন্নভোগ প্রসাদ এনে ভক্তিভরে ভগবানের সামনে সাজিয়ে দিলে। 11টা থেকে 12টা অবধি বিশ্রাম।

ভক্তেরা ভগবানকে বেলা দুটো অবধি নিয়মমতো বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করেছিল, তা কি তিনি শুনবেন? খাওয়া হয়ে যাওয়া মাত্রই অভ্যাসমত সোফায় এসে বসলেন। কত দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা তাঁর দর্শনের জন্য এসেছে পাছে তাদের সময়াভাবে দর্শন না পেয়ে চলে যেতে হয় তাই করুণাময় কৃপাবতার নিজের দেহের স্বাচ্ছন্দ্য অগ্রাহ্য ক'রে নিয়মিত বিশ্রাম না নিয়ে দর্শন দিয়ে যেতে লাগলেন।

অনেকেই অবশ্য 2টা অবধি ভগবানের দর্শন হবে না ভেবে বাড়ি চলে গিয়েছিল। খেয়ে ফিরে গিয়ে দেখি আগেই ভগবান ভক্ত পরিবেষ্টিত হয়ে পর্ণশালার নীচে শোভমান রয়েছেন।

একের পর এক প্রশস্তি পাঠ হতে লাগল। এই মহা-ঋষির সঙ্গে কোন সম্রাট বা দেবতার তুলনা হয় না। কেন না যদি সম্রাটের দর্শনে যাও তবে কত বাধা আর কত লোকের পরিচয়পত্র লাগবে। দেবতার দর্শনে যাও, যদি বৈকুণ্ঠে যাও, জয়-বিজয় দ্বারে দাঁড়িয়ে বলবে, এখন সময় নয়, ফিরে যাও। কৈলাসে গেলেও একই অবস্থা, প্রমথগণও তাই করবে। এখানে অন্য ব্যবস্থা একটিমাত্র নিয়ম। কেউ যেন কোন সময়ে দর্শনে বাধা না পায় এমন কি পশুপাখি অবধি। এঁর মতো করুণাঘন মূর্তির আর তুলনা হয় না। তিনিই তাঁর তুলনা।

অপরাহ্ন 2টা থেকে লোক সমাবেশ আরম্ভ হল, তিল ধারণের স্থান নেই, এত ভিড়। স্বেচ্ছাসেবকেরা নীরবে যতদূর সম্ভব তাদের আরামে বসার ব্যবস্থা করলে। জয়ন্তী হলের যেন রাজসভার মতন শোভা হল। 2টার সময়ে ভগবানকে 'স্মারক' গ্রন্থটি উপহার দেওয়া হল, তারপর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পূর্ণকুম্ভ নিয়ে বেদপাঠ করতে করতে এল, আর এরপর

'হিন্দি প্রচার সভার' তরফ থেকে একটি প্রবন্ধ পাঠ করা হল। লাউড স্পীকার লাগানো হল। আর্য বৈশ্য সমাজের পক্ষ থেকে তেলুগুতে আর মুনিস্বামী চেট্টী ব্রাদার্সের তরফ থেকে তামিলে ভাষণ পাঠ হল। তারপর বক্তৃতা আরম্ভ হল।

মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী সি. এস. কুপ্পস্বামী আইয়ার সমিতির সভাপতি। তাঁর ইংরাজি উদ্বোধন ভাষণের পর স্যার এস. রাধাকৃষ্ণণের একটি প্রবন্ধ শ্রী টি. কে. দুরাইস্বামী পড়ে শোনালেন। প্রবন্ধটি সেইমাত্র ডাকে এসেছে।

তারপর স্বামী রাজেশ্বরানন্দ ও ডঃ টি. এম.পি. মহাদেবন ইংরাজিতে বললেন বিচারপতি চন্দ্রশেখর আইয়ার তেলুগুতে এম. এস. চেলাম ও ওমানদুর রামস্বামী রেড্ডীয়ার (পরে ইনি মাদ্রাজ বিভাগের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন) তামিলে এবং কে. কে. ঐরাবতম আইয়ার মালয়ালামে বক্তৃতা করলেন। আর. এস. বেঙ্কটরাম শাস্ত্রী সংস্কৃতে প্রশস্তি পাঠ করলেন। কুঞ্জুস্বামী গান গাইলে। এইসব বক্তৃতা লিখে রাখার মতো কিন্তু আমি কি এইসব ভাষা জানি যে লিখব! সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ শেষ হতে 4টা 15 মিনিট হয়ে গেল। এই সময়ে ভারতীয় সংবাদ সংস্থা জয়ন্তী উৎসবের ছায়াছবি করার উদ্দেশ্যে ছবি তুললে। তারপর 15 মিনিট বিশ্রামের পর 5টার সময়ে তিরুভণ্ণামলইবাসীদের পক্ষ থেকে অণ্ণামলই পিল্লাই-এর ধন্যবাদ ভাষণ হল, তারপর মুসিরি সুব্রহ্মণ্যম আইয়ারের সমবেত সঙ্গীত ও বেদপারায়ণ। সভার কাজ 7টা 15 মিনিটে শেষ হল। এর আগে প্রায় 6টার সময়ে মাহুত মন্দিরের হাতিটিকে পুরো সাজিয়ে এনে ভগবানকে প্রণাম করালে। মন্দিরের সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপে হাতি রাখা হয় আর এই মণ্ডপের ভূগর্ভস্থ গুহায় ভগবান অরুণাচলেশ্বর মন্দিরে থাকার প্রথম অবস্থায় কিছুদিন ছিলেন। মণ্ডপের হাতির সেই মণ্ডপের অধীশ্বরকে প্রণাম নিবেদন করা যথাযথই হয়েছিল।

তুমি জিজ্ঞাসা করবে এই অগণিত কৃপা ও করুণার প্রার্থী যারা এসে প্রণাম করলে ভগবান তাদের কী সন্দেশ (বার্তা) দিলেন। আমি এই মর্মে একটি তেলুগু কবিতা লিখি যার নির্গলিতার্থ ''প্রণবমূর্তি গুণাতীত অটল সাক্ষীরূপম্।'' এইভাবে আত্মমগ্ন ও অবিচলিত হয়ে তিনি সবই দেখলেন, সবই শুনলেন, আর আদ্যোপান্ত মৌন রইলেন। এই তাঁর মহান ও অমূল্য উপদেশ। সে নয়নের কৃপা-করুণাবাণী অন্তরে হল গাঁথা এনে দিলে হৃদয়ে শান্তির অমৃত আশ্বাস। মৌন ভাস্করের অত্যুজ্জ্বল কিরণ দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হয়ে অজ্ঞানের তমো করে বিনাশ, তা না হলে সেই বাক্য মনের অতীত মৌন কোন্ মাধ্যমে হবে প্রচার?

* * *

13ই ডিসেম্বর, 1946

(76) ব্রহ্মোৎসব

গত মাসের 28শে, কার্তিকী শুক্লা পঞ্চমী তিথি ছিল, ব্রহ্মোৎসবের প্রস্তুতিপর্ব রূপে অরুণাচলেশ্বর মন্দিরে সেদিন ধ্বজা উত্তোলন উৎসব হল। এই উৎসবের দশদিনের দিন সন্ধ্যায় অরুণাচল পাহাড়ে 'দীপম্' বা 'জ্যোতি দর্শন' উৎসব (পাহাড়ের চূড়ায় অগ্নিস্থাপন) হয়। এ বছর এটি এ মাসের 7 তারিখে পড়েছিল। দশদিন ব্যাপী বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে শহরে যাত্রীদের আনাগোনার আর অন্ত নেই। পুণ্যার্থীরা আশ্রমে ভগবানকেও দর্শন করে যায়। 'দীপম্' উৎসব কৃত্তিকা নক্ষত্রের দিন পড়ে। সাধারণতঃ চার পাঁচদিন আগে থেকেই ভিড় হতে আরম্ভ হয়, সুতরাং দর্শনের সুবিধার জন্য মাতৃভূতেশ্বর মন্দিরের সামনের চালায় ভগবানের বসার জায়গা করা হয়। যা হোক এ বছর ভক্তদের মনে হল যে ভগবানের জয়ন্তী হলে বসলেই ভাল হয় তাই হলের চারিদিকে টাটি দিয়ে বৃষ্টির জল আটকাবার ব্যবস্থা করা হল। ভগবান ব্রহ্মোৎসব শুরু হওয়ার দু'তিনদিন পরেই স্থান

পরিবর্তন করলেন। মনে হয় গতবারের থেকে দু'একদিন আগেই করলেন। দারুণ বৃষ্টি শুরু হল। দর্শনার্থীরা বেশির ভাগই নিম্নবিত্ত। তাদের মধ্যে বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত ও শিশুকোলে স্ত্রীলোকও ছিল।

উৎসবের দশম দিনের সন্ধ্যায় 'দীপম্' উৎসব হওয়ায়, যারা রাত্রি আড়াইটা থেকে গিরি প্রদক্ষিণ করত তারা দলে দলে ভিজে কাপড়ে দর্শনের জন্য রাত্রি তিনটা নাগাদ আসত। তাদের দর্শনের সুবিধার জন্য সচরাচর ভগবান হলঘরের দরজার একপাট খুলে তাঁর সোফাটা দরজা বরাবর রাখতেন। আমরা ভাবলাম এবারও তাই হবে। ভগবান বললেন, ''কেন? এখানেই বেশ আছে।''

সেদিন সমস্ত রাত ঝোড়ো হাওয়া আর বৃষ্টি। আমার ঘড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এক ঘুমের পর উঠে সময় বুঝতে পারলাম না। যাই হোক স্নান ক'রে সকাল সকাল আশ্রমে যাব বলে তৈরি হলাম। রাস্তায় লোক চলাচলের শব্দ শোনা গেল না। এখনও ভোর হতে দেরি আছে ভেবে অপেক্ষা করছি, তন্দ্রা এসে গেল। হঠাৎ স্বপ্নের মত যাত্রীদের কোলাহল শুনে চমকে উঠে পড়লাম। তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। হাওয়াতে মেঘও কেটে গেছে। জানলা দিয়ে ঘরে চাঁদের আলো পড়েছে। দেরি হয়ে গেল ভেবে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বেরুতে গিয়ে দেখি যে পাহাড়ের জল স্রোতের মতো কলকল শব্দে নেমে যাচ্ছে। পথ জলমগ্ন। তাড়াতাড়ি আশ্রমে গিয়ে ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে 4টা বেজেছে। ভগবানকে তাঁর ঘরে দেখলাম না। একজনকে জিজ্ঞাসা করতে সে বললে, ''ওখানে, চালাঘরে।'' আমি বিস্ময়ে বলে উঠলাম, ''কী এই ঝড়বৃষ্টিতে চালাঘরে!'' সেখানে গিয়ে দেখি ভগবান সোফায় বসে আছেন, গায়ে একটা চাদরও নেই। পূর্ণিমার চাঁদের মতন মুখখানি হাসিতে ঝলমল করছে আর স্নেহ-সুধারাশি সবার ওপর ঝরে পড়ছে। অমরাবতীর নন্দনবনের চন্দন সুগন্ধের মতো ধূপের মিষ্টি গন্ধ চারিদিক আমোদিত করছে। পুরাণে আছে কোথাও নাকি ক্ষীরোদ সাগর আছে, আর সেই সাগরে শ্বেতদ্বীপও আছে, সেখানে মহাবিষ্ণু অমরগণ পরিবৃত হয়ে রয়েছেন, দেবতারা তাঁদের সুখ শান্তির জন্য মহানন্দে তাঁর আরাধনা

করছেন। আমার মনে হল জলপ্লাবিত চতুর্দিক যেন ক্ষীরোদ সাগর, বৈদ্যুতিক আলোতে আলোকিত সুবর্ণ জয়ন্তী হলটি যেন শ্বেতদ্বীপ, সোফায় বসে থাকা রমণ পরমাত্মা যেন শ্রীমহাবিষ্ণু আর শ্রদ্ধা নিবেদক ভক্তমণ্ডলী যেন অমরবৃন্দ। দৃশ্য দেখে বুকটা আমার আনন্দে ভরে উঠল।

যখন এরূপ নানা কল্পনা নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, তিনি হাসতে লাগলেন। কেন বুঝলাম না। প্রণাম সেরে উঠতেই বললেন, ''বেদপারায়ণ হয়ে গেছে।'' দু'মাস আগে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের সময়ে যখন বেদপারায়ণকে একঘন্টা এগিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তখন আমি নিয়মিত সময়ে গিয়ে দেখি যে সব শেষ হয়ে গেছে। ভাবলাম এবারও সেই রকম হল বলে ভগবান হাসছেন। অসাবধানতার জন্য লজ্জিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ''সারারাত এখানে ছিলেন?'' ভগবান বললেন, ''না। প্রতি বৎসর রাত্রি দুটো থেকে দলে দলে লোক আসে। তাই আমি দুটোর সময়ে এখানে এসেছি। বৃষ্টির জন্য তারা এখনও এসে পৌঁছায় নি।'' একজন ভক্ত বললে, ''দেরি ক'রে আসার জন্য তোমায় জরিমানা দিতে হবে।'' আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

আমরা যখন কথাবার্তা বলছিলাম তখন রামস্বামী পিল্লাই ও কৃষ্ণস্বামী আইয়ার এসে সোফার পাশে দাঁড়াল। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ''কী? কিছু পারায়ণ (পাঠ) হবে নাকি?'' পিল্লাই বললে, ''হাঁ, স্নানের এখনও দেরি আছে। আমরা 'তেবারম' (তিনজন তামিল ভক্তের শিবস্তুতি) আবৃত্তি করব।'' ভগবান রাজি হলেন আর তারাও পাঠ শুরু করলে। পাঠ শেষ হতেই রামস্বামী এসে স্নানের সময় হয়েছে জানালে। পিল্লাই বললে যে সে ভক্ত মাণিক্কবাচকরের 'তিরুবেম্বাই' পাঠ করবে। ভগবান বললেন, ''ওতে কুড়িটা পদ আছে। অতক্ষণ কী করে অপেক্ষা করা যায়? যাবার সময় হয়েছে,'' বলে পা মালিশ করতে লাগলেন। ''আমরা এখুনি শেষ করব,'' বলে পিল্লাই অণ্ণামলয়ান' দিয়ে শুরু একটি পদ আরম্ভ করলে। তার ভাবটি ছিল ''ও! সখী! দেবতাবৃন্দের মুকুটের রত্নপ্রভা

যেরূপ অরুণাচলেশ্বরের চরণকমল জ্যোতির কাছে ম্লান হয়ে যায় সেরূপ অরুণোদয় জগতের অন্ধতমিস্রা দূর ক'রে নক্ষত্রপুঞ্জের প্রভাও ম্লান করে। এই শুভক্ষণে এসো আমরা তাঁর শ্রীচরণ বন্দনা করি। চলো স্নানে যাই, চরণকমল বন্দনা করতে করতে কমলদলশোভিত তড়াগে অবগাহন করি।''

ভগবান স্নানে যাওয়ার জন্য মাটিতে পা দিতেই পাঠ থামল। 'ওঠ সখী! স্নানে যাই!' বলে কবিতা শেষ হল। ভগবানও সোফা থেকে নেমে বললেন, ''হাঁ, এই তো স্নানের জন্য উঠছি।'' সবাই হেসে উঠল।

যিনি স্ত্রী নন বা পুরুষও নন সেই পরমাত্মা ভগবানরূপে জগতে আবির্ভূত হয়ে অবলাভাবেই অরুণাচলেশ্বরকে সম্বোধন করেছিলেন। এই কথা ভেবে আমার খুব গর্ব বোধ হল। মনে হচ্ছে মাণিক্কবাচকরও অবলাভাবে ভাবিত হয়ে এই গানগুলো গেয়েছেন। ভগবানও তাঁর 'অক্ষর মনমালৈ' অবলাভাবেই লিখেছেন। তবেই দেখ অবলাভাবের কী মাহাত্ম্য।

আমি গতবছর ঠিক এই উৎসবের পরই, অরুণাচলেশ্বরের গিরিপ্রদক্ষিণের প্রারম্ভে আশ্রমের নিকটে আসা আর ভগবানের স্বগতোক্তি 'পিতার প্রতি সন্তানের কৃতজ্ঞতা' বলার ঘটনা লিখে প্রথম চিঠি লেখা শুরু করি। কিছুদিন আগে সে সব চিঠি ছাপাতে গেছে।

* * *

19শে ডিসেম্বর, 1946

(77) আত্মাকারাবৃত্তি

গত পরশু একজন আন্ধ্র ভদ্রলোক এসে ভগবানকে একটা চিঠি দিলে, তাতে এই প্রশ্ন ছিল– ''কেউ বলে জ্ঞানী নিদ্রিত অবস্থায় আত্মাকারাবৃত্তিতে থাকেন আবার অন্যেরা বলে তা নয়। আপনার কী মত?'' ভগবান উত্তর দিলেন, ''আগে জাগ্রত অবস্থায় 'আত্মিক ভাবে

থাকা যাক। পরে ঘুমে কী হয় ভাবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। যে জাগ্রত অবস্থায় রয়েছে সেই কি ঘুমের অবস্থায় থাকে না? বলো দেখি, তুমি এখন আত্মাকারাবৃত্তিতে না ব্রহ্মাকারাবৃত্তিতে আছ?''

প্রশ্নকারী বললে, ''স্বামীজি! আমি আমার কথা বলছি না জ্ঞানীর কথা জিজ্ঞাসা করছি।'' ভগবান উত্তর দিলেন, ''ওহো! তাই না কি? তা বেশ, কিন্তু প্রশ্ন তুমিই করছ, আগে নিজের বিষয় জানো। জ্ঞানীরা তাঁদের ব্যবস্থা করবেন। আমরা আমাদের কথা জানি না, কিন্তু জ্ঞানীর কথা জানতে চাই। তাঁরা আত্মাকারাবৃত্তি বা ব্রহ্মাকারাবৃত্তি যাতেই থাকুন তাতে আমাদের কী এসে যায়? আমরা যদি আমাদের কথা জানি তবে তাঁদের সম্বন্ধে প্রশ্নই ওঠে না।'' প্রশ্নকারী বললে, ''স্বামীজি, এটা আমার প্রশ্ন নয়, একজন বন্ধু জানতে চেয়েছে।''

''তাই না কি?'' ভগবান বললেন, ''বন্ধু জানতে চেয়েছে। আমরা কী উত্তর দেব? যখন আমরা 'বৃত্তি' বলি তখন একটা দ্বৈত ভাব আসে, তাই না? কিন্তু যা 'আছে' সেটা এক। তাহলে প্রশ্ন হয় 'ব্রহ্মের চেতনা ছাড়া অতীত অবস্থা থেকে বর্তমান এবং ভবিষ্যতে কী করে আসা যায়?' সুতরাং আমাদের একটা নাম দিতে হয় যেমন 'অখণ্ডাকারাবৃত্তি' বা 'আত্মাকারাবৃত্তি' কিংবা 'ব্রহ্মাকারাবৃত্তি' যেমন বলি সমুদ্রাকারা নদী। সব নদী সমুদ্রে প'ড়ে নামরূপ হারিয়ে মিশে গিয়ে সমুদ্রের সঙ্গে এক হয়ে যায়। তবে আর নদীকে সমুদ্রাকারা বলার কী অর্থ? সমুদ্রে কি এত লম্বা, এত চওড়া পরিমাপ আছে? অনুরূপভাবে লোকে এমনি বলে যে জ্ঞানীর অখণ্ডাকারা বৃত্তি বা আত্মাকারাবৃত্তি প্রকৃতপক্ষে সবই এক। এগুলো কেবল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য বলা হয়। কিন্তু জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সব কিছু একটা পূর্ণ।''

অন্য একজন জিজ্ঞাসা করলে, ''ব্রহ্মবিদ, ব্রহ্মবিদবর, ব্রহ্মবিদবরীয় ও ব্রহ্মবিদবরিষ্ঠ বা অন্যদের কি সাত্ত্বিক মন থাকে?'' ভগবান বললেন, ''ব্রহ্মবিদবরিষ্ঠ, ব্রহ্মবিদ আর যাই বল সবই এক। ব্রহ্মের মতন বলার অর্থ

ব্রহ্মই। সাধারণ ভাষায় বলতে গেলে এদের সাত্ত্বিক মন আছে বলতে হয়, বাস্তবিক পক্ষে এদের মন বলে কিছু নেই। বাসনাই মন। বাসনা না থাকলে, মন নেই। যা 'আছে' তা সৎ। সৎই ব্রহ্ম। সেটা স্ব-ভাস্বর। সেই আত্মা, সেই পরমাত্মা। যারা আত্মানুসন্ধানের ফলে জ্ঞান লাভ ক'রে 'আত্মজ্ঞানে স্থিতি' লাভ করেছে এরূপ জ্ঞানীদের ব্রহ্মবিদ, ব্রহ্মবিদবর, ব্রহ্মবিদবরীয় বা ব্রহ্মবিদবরিষ্ঠ নাম দেওয়া হয়। দৈনন্দিন কাজ অখণ্ডাকারাবৃত্তি বা আত্মাকারাবৃত্তি থেকে হয় বলা হয়।''

* * *

20শে ডিসেম্বর, 1946

(78) আন্ডবনে (হে ঈশ্বর)

প্রায় সকাল 9টায় একটা তারে খবর এসেছে যে রামনাথ ব্রহ্মচারী ওরফে 'আন্ডবনে' গত রাত্রে মাদ্রাজে মারা গেছে। ঘরে ঢুকতেই কেউ আমায় একথা বললে। ভগবানের বিরূপাক্ষ গুহায় থাকাকালে অল্প বয়সে সে ভক্তমণ্ডলীতে যোগ দিয়েছিল। এরপর বছরে দিন পনেরো বাইরে যাওয়া ছাড়া সে আর কখনো ভগবানকে ছেড়ে থাকেনি। আজীবন ব্রহ্মচারী, অনুগত ভক্ত চিকিৎসার জন্য মাদ্রাজে গিয়েছিল, তার পনেরো দিনের মধ্যে মৃত্যুর খবর এল। কিছুকাল আগে মাধবস্বামীরও এই রকম হল ভেবে মন খারাপ করে ঘরে ঢুকলাম, আবার বেশি কষ্ট না পেয়ে তার জীর্ণ দেহ ত্যাগ হওয়ায় মনে স্বস্তিও পেলাম। ভগবান আমায় বললেন, ''মনে হচ্ছে আমাদের রামনাথ চলে গেল।'' এর আগে মাধবস্বামী মারা গেলে ভগবান বলেছিলেন, ''মাধব চলে গেল'' আর আমি, ''কোথায়'' জিজ্ঞাসা করাতে ভগবান বলেছিলেন, ''কোথায় আর? শরীরটা এখানে ফেলে সেখানে।'' তাই এবার আর কোথায় জিজ্ঞাসা না ক'রে কেবল বললাম, ''হাঁ, আমি শুনেছি।''

বিকাল তিনটার সময়ে উমা ও অলমু তামিল কবিতা 'রমণ-অনুভূতি' গাইতে আরম্ভ করলে। ভারাক্রান্ত স্বরে ভগবান বললেন, ''দেখ। এটা রামনাথের লেখা 'তিরুচুড়ীনাথানৈ কন্ডেনে' পল্লবী (ধুয়া) সমেত আরও একটা গীত আছে। সেটাও তার লেখা। এর সঙ্গে একটা মজার গল্প আছে। বিরূপাক্ষ গুহায় থাকার সময়ে এক পূর্ণিমার রাত্রে আমরা গিরি প্রদক্ষিণে বেরুলাম। সে সময়ে চিদাম্বর সুব্রহ্মণ্যম এখানে ছিল। সেদিন খুব জ্যোৎস্না আর ওদেরও খুব উৎসাহ। ওরা ঠিক করলে একটা সভা হবে আর এক একজন এক একটা বিষয়ে বলবে। সুব্রহ্মণ্যম সভাপতি হল। প্রথম বক্তা রামনাথ, তার বিষয় ছিল, 'হৃদয় গুহার পরমাত্মা, চিদাম্বরের নটরাজ ও বিরুপাক্ষ গুহার শ্রীরমণ অভিন্ন।' সভাপতি তাকে আধঘন্টা সময় দিলে। তার তুলনা দেওয়ার আর শেষ হয় না। সভাপতি সময় হয়ে গেছে বললে, রামনাথ আরও আধঘন্টা চেয়ে নিলে। এ সভাটা আবার প্রদক্ষিণরত চলন্ত লোকের সভা। সে 'আর একটু সময়' 'আর একটু সময়' ক'রে পুরো তিনঘন্টা বলে গেল তখন সভাপতি তাকে জোর করে থামিয়ে দিলে। সেদিন তার উৎসাহ দেখার মতো। পরে সে তার বক্তৃতার সারাংশ 'তিরুচুড়ীনাথানৈ কন্ডনে' নামে চারটি পদের একটি কবিতা লেখে। এই কবিতাতে 'আন্ডবনে' শব্দটা বেশ কয়েকবার ছিল, তাই পরে সবাই তাকে 'আন্ডবনে' বলে ডাকত। প্রণবানন্দজী এটি তেলুগুতে অনুবাদের চেষ্টা করেছিল কিন্তু ঠিক আসেনি।''

''ও! এইজন্য তার নাম 'আন্ডবনে' হয়েছিল,'' বলে কবিতাটি পড়লাম। সাহিত্যের দিক থেকে না উতরালেও হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে লেখা বলে পড়তে ভালই লাগে।

''আমি তিরুচুড়ীনাথকে1 দেখলাম, আর ফিরে যাওয়া হল না, অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এই সেই, যে চিদাম্বরে নৃত্য করে, অসহায়ের শরণ, চিরকরুণাময়। সেই তিরুচুড়ীনাথ পবিত্র তিরুভণ্ণামলই পাহাড়ে বিরূপাক্ষ গুহায় অধিষ্ঠিত দেবতারূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

''জীব কায়াপুরী অধিকার ক'রে রাজত্ব করে, করণ (ইন্দ্রিয়) রাশি তার প্রজাবৃন্দ আর অহংকার তার মন্ত্রী।

''কিছুদিন পরে ঈশ্বরের কৃপা-খড়্গে জীব তার মন্ত্রী অহংকারের শিরশ্ছেদ করে।

''তারপর জীব দহরালয়ে একাকী নৃত্যপর ঈশ্বরের সামনে দাঁড়ায়।

''এই সেই তিরুচুড়ীনাথ আমি দেখলাম আর থেকে গেলাম, আমার আর ফিরে যাওয়া হল না।''

* * *

24শে জানুয়ারি, 1947

(79) ওঁকার- অক্ষর

সম্প্রতি একদিন বেলা পাঁচটায় বাড়ি ফেরার পথে দু'টি যুবককে আলোচনা করতে শুনলাম। একজন বললে, ''আমি রমণ মহর্ষিকে খুব সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম যে ওঁকার পার হয়ে কী থাকে? তিনি কিছু উত্তর দিতে পারলেন না তাই চোখ বন্ধ ক'রে ঘুমাতে লাগলেন। সব একটা ভান।''

যদিও আমার গুরুকে তাচ্ছিল্য করাতে প্রথমে রাগ হল, পরে তাদের বোকামি দেখে হাসিও পেল, তাই নরমসুরে বললাম, ''বাবা, গুরুজনদের নিন্দা করছ কেন? আমরা ওঁকার কী তাই কি জানি যে ওঁকার পার হলে কী হবে জানতে চাইব?'' যুবকটি বললে, ''জানি না বলেই তো জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ঠিক উত্তর দিলেই পারতেন।'' আমি বললাম, ''এত অধৈর্য হয়ো না। যদি শান্তভাবে আবার জিজ্ঞাসা করো তবে জানতে পারবে।'' সেদিন তারা চলে গেল কিন্তু পরের দিন আবার হলঘরে হাজির হল। অপ্রত্যাশিতভাবে আর একজন জিজ্ঞাসা করলে, ''স্বামীজি! অকার,

উকার ও মকার নিয়ে ওঁকার হয় বলা হয়। এই তিনটি অক্ষরের কী অর্থ? ওঁকারের স্বরূপ কী?''

ভগবান বললেন, ''অওঁকারই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নামরূপহীন বিশুদ্ধ 'সৎ'। সেই 'এক'কেই ওঁকার বলে। অকার, উকার, মকার বা সৎ, চিৎ, আনন্দ– এই তিনটি নিয়ে ব্রহ্ম। ওঁকার বাক্য ও মনের অতীত, কেবল অনুভব করা যায়, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না তাই তার স্বরূপ বলা যায় না।'' এই উত্তরটা গতকাল যে দু'টি যুবক প্রশ্ন করেছিল তাদেরও সংশয় দূর করবে।

অনুরূপভাবে সময়ে সময়ে অনেকে ভগবানকে ''অক্ষরের স্বরূপ কী? কী প্রকার দর্শন হয় ? কী করে জানা যায়?'' জিজ্ঞাসা করত। এইসব প্রশ্নে ভগবানের উত্তর হল, ''গীতার মতে 'অক্ষরম্ ব্রহ্ম পরমম্' অর্থাৎ যা পরম ও নিত্য তাই অক্ষর। আর কী করে জানা যায় তার সম্বন্ধে বলা যায় আত্মাই অক্ষর। যা ক্ষয় হয় না তাই অক্ষর। কী করে জানা যায়? অক্ষর যদি আত্মা থেকে পৃথক হয় তবেই এ প্রশ্ন ওঠে। এ দুটি পৃথক নয়, এক। যা আছে তা একই আছে। সেটা সৎ। সেই সৎ–ই আত্মা। আত্মা ছাড়া কিছু নেই। প্রকৃত করণীয় হল অনুসন্ধান ক'রে আত্মাকে জানা আর তাতেই থাকা।''

* * *

25শে জানুয়ারি, 1947

(80) বিরূপাক্ষ গুহাবাসের কাহিনী

ভগবানের বিরূপাক্ষ গুহায় থাকার সময়ে যিনি দৈনন্দিন কাজ কর্মগুলো দেখতেন সেই বাসুদেব শাস্ত্রী ক'দিন আগে একদিন এসে হলঘরে বসলেন। কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করার পর ভগবান বললেন, ''এই শাস্ত্রী প্রথম জয়ন্তী (জন্মদিন) পালন করা আরম্ভ করে।'' আর একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করলে, ''ইনিই কি বাঘ দেখে ভয় পেয়ে লুকিয়ে ছিলেন?''

ভগবান উত্তর দিলেন, ''হাঁ, এই সে। বিরূপাক্ষ গুহায় থাকার সময়ে একদিন রাত্রে আমরা বাইরের বারান্দায় বসে আছি, নীচে উপত্যকায় একটি বাঘ দেখা গেল। আলো দেখে বাঘটা চলে যাবে ভেবে আমরা একটা হ্যারিকেন এনে বারান্দায় রেলিঙের বাইরে ঝুলিয়ে দিলাম। যা হোক শাস্ত্রীর খুব ভয় হয়েছিল। সে গুহায় ঢুকে পড়ল আর সবাইকে ভিতরে আসার জন্য ডাকতে লাগল। আমরা গেলাম না। সে গুহায় ঢুকে লোহার গরাদের দরজাটা বেশ ক'রে বন্ধ করে মস্ত বড় বীরের মতো বাঘকে ভয় দেখাতে লাগল 'দেখ! এদিকে এসো না, সাবধান। দেখ না আমি কী করি। হাঁ! ভেবেছ কী? এখানে ভগবান রয়েছেন না! সাবধান।' এ সব আস্ফালন মহাভারতের উত্তরকুমারের মতো গুহার ভিতর থেকেই হল। গল্পটা হল, খুব আস্ফালন ক'রে বিরাট রাজার ছেলে উত্তরকুমার অর্জুনের সঙ্গে গেল কিন্তু কুরুসৈন্য দেখেই রথ থেকে লাফিয়ে পালাতে গেল। শেষ অবধি অর্জুন যুদ্ধ জয় করলেন। বাঘ খানিকক্ষণ ঘোরাফেরা করে আপন মনে চলে গেল। তখন শাস্ত্রী গুহা থেকে বেরুল– খুব সাহসী বলতে হবে।''

শাস্ত্রী কথার সূত্রটা ধরে বললেন, ''এটাই শেষ নয়। আর একবার দিনের বেলায় স্বামীজী ও আমি গুহার বাইরে পাথরের ওপরে বসে রয়েছি নীচে উপত্যকায় একটা বাঘ ও একটা চিতাবাঘ খুব খেলা করছিল ভগবান তাদের খেলা দেখে বসে হাসতে লাগলেন। আমি এই দেখে খুব ভয় পেয়ে ভগবানকে গুহায় চলে আসতে বললাম। ভগবান জেদ ক'রে স্থির হয়ে বসে রইলেন। আমি কিন্তু গুহায় ঢুকে পড়লাম। জানোয়ার দু'টি কিছুক্ষণ খেলা করে পোষা জন্তুরা যেমন দেখে তেমনি ভীত ও বিরক্ত না হয়ে নির্ভয়ে ভগবানের দিকে চেয়ে দেখলে, তারপর আপন মনে একজন পাহাড়ে উঠে গেল আর অন্যজন নীচে নেমে গেল। গুহা থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'স্বামীজি, এত কাছে জন্তু দু'টি খেলা করছিল, আপনার ভয় করল না?' ভগবান হেসে বললেন, 'ভয় কিসের? আমি তাদের দেখেই বুঝতে পারলাম যে একটু পরে একজন ওপরে উঠে যাবে আর অন্যজন নীচে নেমে যাবে। তারাও তাই করলে। যদি আমরা ভয় পেয়ে বলি 'ওরে

বাবা! একটা বাঘ!' ওরাও ভয় পেয়ে বলবে 'ওরে! একটা মানুষ!' আর ছুটে কামড়াতে আসবে। আমাদের এই ভয় না থাকলে ওদেরও কোনো ভয় নেই বেশ স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করবে'।'' শাস্ত্রী আরও যোগ করলেন, ''ভগবান যতই বলুন, আমার কিন্তু ভয় কাটেনি।''

''আমার যখন হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া থেমে গিয়েছিল, শাস্ত্রী আমায় জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করেছিল'',– বলে ভগবান ঘটনাটা বলতে লাগলেন– ''একদিন পাচিয়াম্মান কোয়েলের (দুর্গা মন্দির) পুকুরে বাসু ও আমরা কয়েকজন স্নান করতে গিয়েছি। ফিরবার সময়ে একটা সোজা পথ দিয়ে ফিরে আসছি, যেই কচ্ছপ পাথরটার কাছে এসেছি, আমার খুব ক্লান্তি বোধ হল, মাথা ঘুরতে লাগল, পাথরটার ওপর বসে পড়লাম। আমার অভিজ্ঞতা জীবনীতে[1] লেখা আছে সবাই পড়েছ।''

1 জীবনী থেকে প্রাসঙ্গিক সারাংশ–

কচ্ছপ পাথর, পাহাড়ি পথের একটা প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই। সেই পাথরের কাছে ভগবানের অভিজ্ঞতা তাঁর নিজের ভাষায়–

''হঠাৎ আমার চোখের সামনের সব কিছু অদৃশ্য হয়ে গেল আর চোখে একটা সাদা পর্দার মতো আড়াল পড়ে গেল। কিন্তু এ দুটি বেশ ধীরে ধীরে হয়েছিল তাই দৃশ্য মুছে যাওয়া আর আড়াল নেমে আসা একই সঙ্গে বুঝতে পারলাম। একটু পরে সব কিছু মুছে গেলে, আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। চোখের ধোঁয়াটে ভাবটা একটু কাটলে আবার চলতে শুরু করলাম। আবার এইরকম হল আর দুর্বলতাও বেড়ে গেল, সেজন্য কচ্ছপ পাথরটায় হেলান দিলাম। তৃতীয়বার এরূপ হতে পাথরে বসে পড়লাম চারিদিক সাদা পর্দায় ঢাকা। মাথা ঘুরতে লাগল। রক্ত চলাচল ও হৃৎপিণ্ডের গতি থেমে গেল, মৃতদেহের মতো শরীর কাল্‌চে হয়ে যেতে লাগল। এটা বাড়তে দেখে, আমি মরে গেছি ভেবে বাসু কাঁদতে কাঁদতে আমায় জড়িয়ে ধরলে।

আমি কিন্তু আমার শরীরের রঙ্‌ বদলে যাওয়া, বাসুর জড়িয়ে ধরা, তার কাঁপুনি, আশপাশের কথা সবই বুঝতে পারছি। আমি আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া থেমে যাওয়া জানি কিন্তু কোনো ভয় হল না। আমার চিন্তা ও সত্তার কোনো ব্যতিক্রম হল না আর শরীরের জন্য কোনো উদ্বেগও হল না। পাথরে ঠেসান না দিয়ে পদ্মাসনে বসে রইলাম। রক্ত চলাচল থেকে গেল কিন্তু আসন ঠিকই রইল। এরকম প্রায় পনেরো মিনিট ছিল।

সেই কথার সূত্র ধরে শাস্ত্রী বললেন, ''হাঁ, সবাই যখন দূরে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল, আমি হঠাৎ ওঁকে জড়িয়ে ধরলাম। আমি তখনও অবিবাহিত তাই ওঁকে ছুঁতে পারতাম। আর কেউ ওঁকে স্পর্শ করতে সাহস করত না। মনে হয় ভগবান প্রায় দশ মিনিটকাল সেই অবস্থায় ছিলেন তারপর তাঁর জ্ঞান ফিরল আর আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। 'কান্না কীসের? তোমরা ভেবেছ, আমি মরে গেছি? মরবার হলে কি আগে তোমাদের বলতাম না'? ভগবান আমাদের সান্ত্বনা দিলেন।''

* * *

26শে জানুয়ারি, 1947

(81) শিবভক্ত সুন্দরমূর্তি

গতকাল শ্রীভগবান 'তিরুচুড়ী পুরাণ' (ত্রিশূল পুরাণ) দেখছিলেন, তা থেকে সুন্দরমূর্তির সেখানে (তিরুচুড়ী) যাওয়ার কাহিনীটি আমাদের বললেন–

''সোমশেখর শিবের জ্যোতি হতে জাত আলাল সুন্দরের অংশে শ্রদ্ধাভাজন সুন্দরমূর্তির জন্ম হয়, তীর্থে ভ্রমণ করার সময়ে তাঁর কেরলের রাজা চেরামল পেরুমল নয়নারের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল। তাঁরা দু'জনে মাদুরাই-এ তীর্থ করতে গেলেন। পাণ্ড্যরাজা ও তাঁর জামাই চোলরাজা তাঁদের সযত্নে আদর-আপ্যায়ন ক'রে খুবই আনন্দ পেলেন। সুন্দরমূর্তি

''হঠাৎ শরীরে একটা শক্তির ঢেউ খেলে গেল রক্ত চলাচল শুরু হল, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়াও আরম্ভ হল।

''শরীরের কাল্‌চে রঙ্‌ মিলিয়ে গেল। সমস্ত শরীর থেকে ঘাম বেরোতে লাগল। চোখ খুলে উঠে দাঁড়ালাম আর বললাম, 'চলো আমরা যাই'। এরপর আর কোনো অঘটন ছাড়াই বিরূপাক্ষ গুহায় পৌঁছে গেলাম। এই একবারই আমার শ্বাসপ্রশ্বাস ও হৃদ্‌যন্ত্র একসঙ্গে থেমে গিয়েছিল। এ অবস্থা আমি ইচ্ছা ক'রে করিনি বা মরে গেলে শরীরের কী হয় তা দেখার কোনো ইচ্ছা ছিল না, আগেও আমার এরূপ হয়েছে তবে এবার যেন বেশি তীব্র! এই ঘটনা।''

মীনাক্ষীনাথ সুন্দরেশ্বরের অনেক স্তুতি-বন্দনা রচনা ক'রে গাইলেন। তারপর তিনি চেরারাজা সহ দক্ষিণ দেশের তীর্থ তিরুকুট্রালাম, তিরুনেলেভেলি, রামেশ্বর ইত্যাদি হয়ে লঙ্কা দ্বীপের পবিত্র তীর্থ তিরুক্কেদেশ্বরের দর্শন ও পূজা করলেন। সেখানে তাঁর মুক্তিনগর তিরুচুড়ীর (ত্রিশূলপুরম) কথা মনে পড়ল আর তাঁরা সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁদের দু'জনার জ্যোতির্ময় রূপ দেখে শহরে লোকেদের মনে হল যেন চন্দ্র ও সূর্য একসঙ্গে আসছেন। সেখানে ভূমিনাথেশ্বরের পূজা ক'রে 'উনাই উয়ির পুহালে' গানটি রচনা ক'রে, গান ক'রে ভক্তিতে বিহ্বল হয়ে গেলেন। সেখানে কিছুদিন থাকার ইচ্ছা হলে তাঁরা কৌণ্ডিণ্য নদীর তীরে একটা মঠে বাস করতে লাগলেন।

''তিরুচুড়ীতে থাকার সময়ে একদিন রাত্রে ভগবান শিব এক অপরূপ যুবার বেশে তাঁকে স্বপ্ন দিলেন। শিবের হাতে একটা গোলক (রাজার প্রতীক), মাথায় মুকুট, মিষ্টি হেসে বললেন, 'আমরা জ্যোতির্বনে (কালেশ্বরে) থাকি'। একথা শুনে সুন্দরমূর্তি ব্যস্ত হয়ে উঠে ঈশ্বরের অপার করুণা ও কৃপার কথা স্মরণ ক'রে চেরারাজাকে তাঁর দর্শনের কথা বললেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কালেশ্বরের উদ্দেশ্যে ''তানদর আদিথো দালালুম'' দিয়ে আরম্ভ 'তেবর পদীকম' গাইলেন।

''এখান থেকে তাঁরা আরও দূরের তীর্থ তিরুপুনাভাইল যাওয়া মনস্থ করলেন। যাওয়ার আগে যিনি স্বপ্ন দিয়েছিলেন সেই কালেশ্বর দেব ও দেবী অম্বা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর বেশে এসে উপস্থিত হলেন। সুন্দরমূর্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কে? কোথা থেকে আসছেন?' তারা বললেন, 'আমাদের কিছু খেতে দাও, ক্ষুধা পেয়েছে, তারপর সব বলছি।' সুন্দরমূর্তি রাজি হয়ে খাবার তৈরি ক'রে তাঁদের খুঁজতে গেলেন কিন্তু কোথায় পেলেন না। শহরের সব অলিগলি খোঁজা হল কিন্তু তাঁদের াওয়া গেল না। মঠে ফিরে এসে দেখেন যে সব খাবার অদৃশ্য হয়ে গেছে আর পাতাগুলো উঠানে ছড়ানো রয়েছে। সুন্দরমূর্তি অবাক হয়ে গেলেন আর বলে উঠলেন, 'ও, কী আশ্চর্য! এ পরমেশ্বরের লীলা ছাড়া আর

কিছু নয়?' তিনি যেই এ কথা বললেন অমনি একটি আকাশবাণী হল, 'জ্যোতির্বনে আমাদের না দেখে কোথায় যাবার ইচ্ছা করছ?' সুন্দরমূর্তি মনে মনে ভাবলেন জ্যোতির্বন কোথায়, কী করে যাওয়া যায়। আবার আকাশবাণী হল, 'আমরা নন্দীর (শিবের বাহন) রথে যাচ্ছি, তুমি এর ায়ের চিহ্ন দেখে পিছনে এসো।'

''সুন্দরমূর্তি সব ভক্তদের সঙ্গে নন্দীর ায়ের চিহ্ন দেখতে দেখতে চললেন। কিছুদূর গিয়ে চিহ্ন হারিয়ে গেল। তখন তিনি বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লে আবার আকাশবাণী হল 'ভাল ক'রে দেখ।' একটু ভাল ক'রে পায়ের চিহ্ন খুঁজে দেখেন যে সেটা অজস্র শিবলিঙ্গে পূর্ণ একটা জায়গা একটি পা ফেলারও স্থান নেই। তিনি অবাক হয়ে ভক্তদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ একটা সরু পথ দেখা গেল। সেই পথ ধরে গিয়ে তাঁরা কালেশ্বরের মন্দিরে পৌঁছালেন। তাঁরা সবাই মন্দিরের পুষ্করিণীতে স্নান ক'রে মন্দিরে ঢুকতে গিয়ে দেখেন যে মন্দির অদৃশ্য হয়ে গেছে। হতবাক হয়ে সুন্দরমূর্তি গীত রচনা ক'রে গাইতে লাগলেন, 'প্রভু, আমরা স্নান সেরে দর্শনে আসিনি বলেই কি তুমি অদর্শন হলে।' এই গান গাওয়া মাত্র একটা জ্যোতির আবির্ভাব হল, পরে তার থেকে মন্দিরের চূড়া ও ক্রমশঃ সমস্ত গোপুরম সমেত মন্দিরটি দেখা গেল। আনন্দে আত্মহারা হয়ে দেবদর্শন ক'রে, স্তুতি-বন্দনা রচনা ক'রে, গান ক'রে তবে অন্য তীর্থ দর্শনে গেলেন। চমৎকার গল্প। তাঁর সম্বন্ধে এরকম অনেক গল্প আছে'', বলে ভগবান শেষ করলেন।

আমার আবেগ (70) 'স্বামী সর্বস্থানে' চিঠিতে যে সুন্দরমূর্তির কথা বলা হয়েছে, এই সেই সুন্দরমূর্তি। এঁর কাহিনী সংস্কৃত 'শিবভক্ত বিলাসম্', 'উপমন্যু ভক্ত বিলাসম্' আর তেলুগু 'পণ্ডিতারাধ্য চরিত্র' ও পালাকুর্তি সোমনাথের 'বাসব পুরাণে' বিস্তারিত ভাবে দেওয়া আছে।

আগে একবার ভগবান বলেছিলেন যে সুন্দরমূর্তির সখ্যভাব, মাণিক্কবাচকরের মধুরভাব, অপ্পরের দাস্যভাব আর সম্বন্ধরের বাৎসল্য ভাব দেখা যায়।

* * *

27শে জানুয়ারি, 1947

(82) সুন্দরমূর্তির দাসখৎ

গতকাল ভগবানের বলা সুন্দরমূর্তির জীবনী, যেটা তোমায় আগের চিঠিতে লিখেছি, শুনে আমার তাঁর বাল্যজীবনের কথা শোনার ইচ্ছা হল তাই আজ সকাল সকাল সাড়ে সাতটার সময়ে ভগবানের কাছে গেলাম। তিনি পাহাড় থেকে বেড়িয়ে ফিরে এসে একটা বই দেখছিলেন। হলঘরে বেশি কেউ ছিল না। প্রণাম ক'রে কী বই দেখছেন জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, '''পেরিয়া পুরাণম্' (মহাপুরাণ)। সুন্দরমূর্তির বাল্যজীবনটা দেখছি।'' আমি বললাম ''খুব আশ্চর্য জীবন, না?'' ভগবান বললেন, ''হাঁ, পড়বে?'' আমি বললাম, ''পড়ার তো ইচ্ছা কিন্তু তামিল ভাল জানি না।'' ভগবান হেসে বললেন, ''আচ্ছা বেশ, ছোট ক'রে গল্পটা বলছি'' বলে শুরু করলেন।

''সুন্দরমূর্তি তিরুমুনৈপ্পদি দেশের পুণ্যভূমি তিরুনাভানুরের আদিশৈব্য বংশে শিবের পূজারি সাদয়ানার বা শিবাচার্য ও তার পত্নী ইসাইজ্ঞানীয়ারের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম হয় নাম্বিয়ারুর। একদিন যখন তিনি রাস্তায় খেলাগাড়ি নিয়ে খেলছেন তখন সে দেশের রাজা নরসিংহ মুনিয়ার তাঁকে দেখেন। তাঁর ছেলেটিকে খুব ভাল লাগে। বাবা শিবাচার্যকে তাঁকে ছেলেটিকে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। শিবাচার্য রাজি হলে ছেলেটি রাজার পোষ্যপুত্র হয়ে বড় হতে লাগল। তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণের সংস্কার

উপনয়ন ইত্যাদি ও শাস্ত্র শিক্ষা ঠিক ঠিক ভাবে দেওয়া হল আর কালে তিনি শাস্ত্র বিশারদ হন।

''উপযুক্ত বয়স হলে তাঁদের এক আত্মীয় চাটন্‌গবী শিবাচার্যের মেয়ের সঙ্গে সুন্দরমূর্তির বিয়ে ঠিক হয়। নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হয়ে গেল। বিয়ের আগের দিন গায়ে হলুদও হয়ে গেল বিয়ের দিন অতি প্রত্যুষে বরবেশে আত্মীয় বন্ধুদের নিয়ে সুন্দরমূর্তি একটা ঘোড়ায় চড়ে কনের বাড়ি পুত্তুর গ্রামে যাত্রা করলেন। কনের বাড়ি পৌঁছে ঘোড়া থেকে নেমে শামিয়ানার নীচে বরাসনে বসলেন। খুব গান বাজনা হচ্ছে কেবল কনে আসতে বাকি।

''এমন সময়ে, শিব এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'তোমরা দয়া করে আমার একটা কথা শোনো।' সবাই রাজি হলে বৃদ্ধ ছেলেটিকে (বরকে) দেখিয়ে বললেন, 'দেখ, তোমার ও আমার মধ্যে একটা শর্ত আছে, সেটি পূর্ণ ক'রে বিয়ে করো।' ছেলেটি বললেন, 'যদি থাকে তো ভাল, শর্তটা কী শোনা যাক।' বৃদ্ধ সবাইকে শুনিয়ে বললেন, 'এ ছেলেটি আমার দাস। আমার কাছে এর ঠাকুরদাদার লেখা দাসখতের দলিল আছে।' সুন্দরমূর্তি উত্তর দিলেন, 'এ পাগল নাকি! খুব হয়েছে! এই প্রথম শুনছি যে একজন ব্রাহ্মণ আর একজন ব্রাহ্মণের দাস হয়। যাও, চলে যাও।' ব্রাহ্মণ বললেন, 'আমি পাগল নই, পিশাচও নই, তোমার কথায় কিছু মনে করছি না। তুমি আমার কথা বুঝতে পারলে না। এসব ছেলেমানুষি ছাড়ো। আর আমার সেবা করো।' তখন সুন্দরমূর্তি বললেন, 'কোথায়, দলিলটা দেখি।' বৃদ্ধ বললেন, 'তুমি দলিল দেখার কে? এঁরা সবাই যদি দলিল দেখে ঠিক বলে সাব্যস্ত করেন তবে তুমি আমার সেবা শুরু করবে।' সুন্দরমূর্তি খুব রেগে গিয়ে দলিলটা কেড়ে নেওয়ার জন্য ব্রাহ্মণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যা হোক ব্রাহ্মণ দৌড়ালেন আর সুন্দরমূর্তিও তাঁর পিছু নিলেন শেষ অবধি দলিলটা কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। বৃদ্ধ কিন্তু সুন্দরমূর্তিকে জাপটে ধরে চিৎকার শুরু করে দিলেন। তখন বরযাত্রীরা সবাই খুব হই হল্লা ক'রে দুজনকে ছাড়াল। তারা বললে, 'কী এক আজগুবি কথা বলছ। আচ্ছা ঝগড়াটে বামুন তো।

কোথা থেকে এসেছ?' ব্রাহ্মণ বললেন, 'আমি তিরুভেন্নৈনালুর গ্রামে থাকি। এবার দেখলে তো, ছেলেটির অন্যায়ভাবে দলিল কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলাতেই প্রমাণ হল যে ও আমার দাস।' সুন্দরমূর্তি বললন, 'তুমি যদি তিরুভেন্নৈনালুরের বাসিন্দা হও তবে তোমার দাবি সেখানেই প্রমাণ করা যাবে, তাই না?' ব্রাহ্মণ বললেন, 'হাঁ, আমার সঙ্গে এসো, আমি ব্রাহ্মণদের পঞ্চায়েতে আমার আসল দলিল দেখাব আর আমার দাবি প্রমাণ করব।' সে অনুসারে ব্রাহ্মণ আগে আগে আর সুন্দরমূর্তি ও অন্যের তার পিছনে চলল।

''তারা ব্রাহ্মণদের পঞ্চায়েতে পৌঁছাতেই সেই ধূর্ত ব্রাহ্মণ আগেই তার আর্জি পেশ ক'রে বললেন যে এই নাম্বিয়ারুর আমার দাসখতের দলিলটা ছিঁড়ে ফেলেছে। পঞ্চায়েতের সবাই বললে, 'একজন ব্রাহ্মণ আর একজন ব্রাহ্মণের দাস হবে, এমন কথা কেউ কখনো আগে শোনেনি।' বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বললেন, 'তা হতে পারে, তবু আমার দাবি মিথ্যা নয়। যে দলিলটা ছেলেটি ছিঁড়ে ফেলেছে তাতে ওর ঠাকুরদাদার নিজের হাতে লেখা আছে যে, সে ও তাঁর বংশ-পরম্পরা আমার দাস।' পঞ্চায়েৎ সুন্দরমূর্তিকে বললে, 'ঠাকুরদাদার দলিলটা ছিঁড়ে ফেললেই কি তুমি জিতে যাবে? তুমি কী বলো?' তিনি বললেন, 'হে ধর্মাবতার! আপনারা সবাই বেদজ্ঞ! আপনারা জানেন যে আমি আদিশৈব। যদি এ ব্রাহ্মণ তার দাবি ন্যায়সঙ্গত বলে প্রমাণ করতে পারে যে আমি তার দাস তবে এটা একটা অভাবনীয় ঘটনা বলতে হবে। আমি আর এই অদ্ভুত দাবি সম্বন্ধে কী বলব?' পঞ্চায়েৎ তখন ব্রাহ্মণকে বললে, 'এ যে তোমার দাস তা তুমি আগে প্রমাণ করো। এর জন্য তিনটি জিনিস দরকার, প্রচলিত রীতি, লিখিত দলিল ও মৌখিক প্রমাণ। তিনটির মধ্যে তুমি অন্ততঃ একটাও তো দেখাবে?' ব্রাহ্মণ বললেন, 'মহাশয়, ও যা ছিঁড়েছে সেটা নকল, আসল দলিলটা আমার কাছে আছে।' পঞ্চায়েৎ আসলটা দেখতে চাইলে আর এটা সুন্দরমূর্তিকে ছিঁড়তে দেওয়া হবে না বলে আশ্বাস দিলে। বৃদ্ধ তাঁর কোমরের কাপড় থেকে আসল দলিল বার ক'রে সবাইকে দেখালে।

আকস্মিকভাবে সেই সময়ে গ্রামের আদায়কারীও সেখানে এসে উপস্থিত হল, তাকে দলিলটা পড়তে বলা হল। সে সবাইকে নমস্কার ক'রে দলিলটার ভাঁজ খুলে সবাইকে শোনাবার জন্য জোরে জোরে পড়লে– 'আমি, আদিশৈব বংশজাত তিরুভেন্নৈনালুর গ্রামবাসী আরুরার সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় তিরুভেন্নৈনালুর গ্রামের পিত্থনের (পাগলের) দাসত্ব নিজে ও আমার বংশ–পরম্পরায় স্বীকার করলাম। (স্বা) আরুরার।'

''এই দলিলের সাক্ষীরূপে উপস্থিত পঞ্চায়েতের নাম ও স্বাক্ষর ছিল তারা সবাই দেখলে ও তাদের স্বাক্ষর বলে স্বীকার করলে। পঞ্চায়েৎ সুন্দরমূর্তিকে তার ঠাকুরদাদার সই মেলাতে বললে। ব্রাহ্মণবেশী লোকটি বললেন, 'এ বাচ্চা ছেলে, ঠাকুরদাদার সই জানবে কী করে? যদি হাতের লেখা কোন কাগজ থাকে তবে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখ।' তারা রাজি হল, সুন্দরমূর্তির আত্মীয়েরা খুঁজে তার ঠাকুরদাদার হাতের লেখা কাগজ আনলে। পঞ্চায়েৎ কাগজ মিলিয়ে দু'টি এক বলে স্বীকার করলে। তারা সুন্দরমূর্তিকে বললে, 'বাবা, আর কোন উপায় নেই। তুমি হেরে গেছ। এখন এই বৃদ্ধের খুশিমতো তোমায় একে সেবা করতে হবে।' সুন্দরমূর্তি হতবাক হয়ে বললে যে কপালে যদি তাই লেখা থাকে তবে সে তাই করবে। তবুও ছেলেটির ওপর দয়া ক'রে আর বৃদ্ধকে সন্দেহ ক'রে তারা বললে, 'মহাশয়, দলিলে বলছে যে আপনি এখানে থাকেন, তবে আপনার বসতবাড়ি ও সম্পত্তি কোথায়?' বৃদ্ধ অবাক হওয়ার ভান ক'রে বললেন, 'কী! তোমরা সবাই এই গ্রামের বাসিন্দা, সবাই বিদ্বান, বুদ্ধিমান আর বয়স্ক ব্যক্তি, তোমাদের একজনও কি আমার বাড়ি চেনো না? কী আশ্চর্যের কথা! তাহলে আমার সঙ্গে এসো!' এই বলে তিনি রাস্তা দেখিয়ে এগিয়ে চললেন ও আর সবাই তাঁর পিছনে গেল। সবাই দেখলে ছদ্মবেশী ঈশ্বর 'তিরুভরুল তুরৈ' শিব মন্দিরে ঢুকে গেলেন। সবাই হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

''সুন্দরমূর্তি ভাবলেন, 'যে ব্রাহ্মণ আমায় দাস করলে সে পরমেশ্বরের মন্দিরে ঢুকে গেল, কী আশ্চর্য!' এই ভাবতে ভাবতে তিনিও আগ্রহ ভরে

একাকী ব্রাহ্মণের পদানুসরণ ক'রে মন্দিরে প্রবেশ ক'রে আকুল হয়ে 'ওহে ব্রাহ্মণ!' বলে ডাকলেন। তৎক্ষণাৎ শিব পার্বতীর সঙ্গে নন্দীতে আরোহন ক'রে আবির্ভূত হয়ে বললেন, 'হে পুত্র! তুমি আমার প্রমথগণের মধ্যে আলালসুন্দর। একটা শাপের জন্য তোমার এই জন্ম হয়েছে। এরূপ শাপের সময়ে তুমি যেখানেই থাক না কেন, আমি যেন তোমাকে নিজের করে নেই, এই অনুরোধ করেছিলে। তাই তোমাকে আমার দাস করে নিয়েছি।''

এরূপে ভগবান আমাদের সুন্দরমূর্তির বাল্য কাহিনী বললেন। তিনি বলে চললেন–

''এই কথা শোনা মাত্র সুন্দরমূর্তি মাতৃ আহ্বানে বৎসের মতো আনন্দে আত্মহারা হলেন। আবেগে কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগল, আনন্দে চোখে জল এসে গেল, তিনি হাত জোড় ক'রে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ক'রে বললেন, 'হে প্রভু! এই হতভাগ্যের প্রতি তোমার কী অসীম কৃপা। মার্জার শাবকের মতো তুমি আমায় নিজেই ধরে রেখেছ। কী অপার করুণা তোমার!' এই স্তুতি করলেন। পরমেশ্বর খুশি হয়ে বললেন, 'হে পুত্র! যেহেতু তুমি আমার সঙ্গে বাদানুবাদ করেছ সেজন্য তোমার নাম 'বন থোনদন' (সাহসী দাস) হবে। তোমার সেবা হবে স্তুতি–বন্দনা রূপ পুষ্পে আমার পূজা করা। স্তুতি রচনা করো আর গেয়ে যাও।' সুন্দরমূর্তি হাতজোড় করে বললেন,'হে প্রভু! তুমি ব্রাহ্মণের বেশে এসে আমাকে দাবি করলে আর আমি না জেনে তোমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলাম ও তর্ক করলাম। 'হে পরমেশ্বর! তুমি আমার পূর্বস্মৃতি খুলে দিয়ে এই সংসার সমুদ্র হতে উদ্ধার করলে। তোমার অনন্ত গুণের কথা আমি কি জানি যে গাইব?' ঈশ্বর বললেন, 'তুমি আগেই আমার পিত্থন বলেছ। অতএব পাগলের নামে গান গেয়ে বেড়াও।' এই বলে অন্তর্ধান করলেন। সুন্দরমূর্তি তৎক্ষণাৎ 'পিত্থা পিরাই সুদি' দিয়ে শুরু 'শ্রীপদিকম্' গেয়ে উঠলেন। তাঁর জীবন এমন অনেক আশ্চর্য ঘটনায় পূর্ণ।''

জিজ্ঞাসা করলাম, ''সুন্দরমূর্তি নাম কি তাঁর পূর্ব জন্মের স্মৃতির জন্য হল?'' ভগবান বললেন, ''হাঁ, তাই হবে বোধ হয়। জীবনীতে আর কোন কারণ পাওয়া যায় না।''

* * *

28শে জানুয়ারি, 1947

(83) স্বরূপ

আজ বিকাল তিনটার সময়ে একজন ইংরাজ ভদ্রলোক ভগবানকে ইংরাজিতে কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাতে 'নেচার' কথাটা বেশ কয়েকবার ছিল আর ভগবান তার এরূপ উত্তর দিলেন।

''যদি একজন নিজের স্বরূপ ঠিকভাবে জানে তবে আর এ সব প্রশ্ন ওঠে না। সেটা না জানা অবধি এগুলো উঠতেই থাকবে। ততদিন অবধি আমাদের এই অসৎ বস্তুগুলো সত্য বলে ভুল হতে থাকবে। আমাদের এটা বুঝতেই হবে যে প্রকৃত অবস্থা সর্বদা আছে ও সব সময়ে থাকে। আমরা যা আছে তাকে ছেড়ে যা নেই তার জন্য কামনা ক'রে এত দুঃখ পাই। যা আসে যায় সবই অসৎ। আত্মা সব সময়ে তার স্বরূপে রয়েছে! যতক্ষণ না আমরা সেই সত্যটা অনুভব করি ততক্ষণ দুঃখ।''

পরের প্রশ্ন হল, ''আত্মাকে কোথায় দেখা যায়? কী করে জানা যায়?''

''আত্মাকে কোথায় দেখা যায়? এ প্রশ্নটা ঠিক যেন রমণাশ্রমে থেকে রমণাশ্রম কোথায় জিজ্ঞাসা করা। আত্মা সর্বদা তোমাতে রয়েছ ও সর্বস্থানে আছে, তা সত্ত্বেও তাকে দূরে খোঁজা ঠিক যেন 'পান্ডুরঙ্গ ভজন গাওয়া'। এই ভজন বাড়ির উঠানে একটা প্রদীপ রেখে, পায়ে ঘুঙুর প'রে সন্ধ্যাবেলা ভক্তেরা গাইতে শুরু করে। ভক্তেরা প্রদীপটিকে ঘুরে ঘুরে গাইতে থাকে 'পান্ডারপুর কত দূর! পান্ডারপুর এত দূর! চল সবাই সেখানে যাই'। তারা

কিন্তু কেবল ঘুরেই চলেছে, আধ গজও এগোয়নি। যখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর হয় তারা শুরু করে 'দেখ ঐ পান্ডারপুর! দেখ ঐ পান্ডারপুর! দেখ! দেখ!' সেই এক প্রদীপের চারিদিকেই কিন্তু ঘুরে চলেছে। ভোর হল তারা গেয়ে উঠল 'পান্ডারপুর এসে গেছি। এই পান্ডারপুর' বলে প্রদীপকে প্রণাম ক'রে ভজন শেষ করে। এও সেই রকম। আমরা 'কোথায় আত্মা? কোথায় সে?' বলে ঘুরে ঘুরে আত্মাকে খুঁজি, যখন জ্ঞানদৃষ্টিরূপ ভোর হয় তখন বলি 'এই আত্মা, আমিই সেই।' আমাদের সেই দৃষ্টি লাভ করা উচিত। একবার সেই দৃষ্টি লাভ ক'রে জ্ঞানী যদি সংসারে থাকে আর সংসারী লোকেদের সংস্পর্শে আসে, তবে তার আর আসক্তি হয় না। একবার জুতাটা পরে নিলে রাস্তায় যতই পাথর আর কাঁটা থাকুক পায়ে লাগে না। তুমি নির্ভয়ে বা নির্ভাবনায় পাহাড় পর্বত যেখানে খুশি ঘুরতে পারো। সেই রকম, যাদের জ্ঞানদৃষ্টি হয়েছে তাদের কাছে সবই স্বাভাবিক। একজনের আত্মার অতিরিক্ত আর কী আছে?''

''জাগতিক দৃশ্যগুলো লয় হলে সবই স্বরূপ অনুভব হয়। এগুলো কী করে লয় হবে?'' পরে প্রশ্ন হল।

ভগবান উত্তর দিলেন, ''যদি মন নাশ হয়ে যায় তবে সমস্ত জগৎ লয় হয়ে যাবে। মনই এ সবের কারণ। মনটা নাশ হলেই স্বরূপ প্রকাশ পাবে। আত্মা সব সময়ে নিজেকে 'আমি' 'আমি' রূপে জাহির করছে। এটা স্বয়ং জ্যোতি। এটা এখানে রয়েছে। সবই সেই। আমরাও তাতেই রয়েছি। তাতে থেকে তাকে খোঁজা কেন? মহাজনেরা বলেন–

দৃষ্টিং জ্ঞানময়ীং কৃত্বা পশ্যেৎ ব্রহ্মময়ং জগৎ।
দৃষ্টি জ্ঞানময়ী করে, জগৎ ব্রহ্মময় দেখে।''

''বলা হয়েছে চিদাকাশই আত্মার স্বরূপ আর সেটা মন দিয়েই অনুভূত হয়। মন নাশ হয়ে গেলে তাকে কী করে দেখা যায়?'' অন্য একজন জিজ্ঞাসা করলে। ভগবান বললেন, ''যদি আকাশের উপমা নেওয়া হয়, তবে একে তিনরকম বলা হয় চিদাকাশ, চিত্তাকাশ ও ভূতাকাশ। স্বরূপ

অবস্থাকে চিদাকাশ বলে, চিদাকাশ থেকে উৎপন্ন 'আমি' বোধ চিত্তাকাশ। এই চিত্তাকাশই আরও প্রসারিত হয়ে মহাভূত (ক্ষিতি অপ্ ইত্যাদি) হয়, এ সবই ভূতাকাশ। মন কি শরীরের একটা অংশ? চেতনারূপ চিত্তাকাশ যখন চিদাকাশকে (স্বরূপ) না দেখে ভূতাকাশ দেখে তখন তাকে মনাকাশ (মন) বলে আর যখন মনাকাশ ত্যাগ ক'রে চিদাকাশ দেখে তখন একে চিন্ময়1 বলে। মন নাশ হওয়ার অর্থ মনের নানাত্ব চলে গিয়ে একত্ব অনুভব। এটা হলে সবই স্বাভাবিক মনে হয়।''

এই ভাব নিয়ে ভগবান তাঁর সদ্‌বিদ্যা (14) লিখেছেন–

যদি 'উত্তম' পুরুষ আমি থাকে
তবে 'মধ্যম' 'প্রথম' পুরুষ দেখে।
অশং–এর অনুসন্ধানে তার নাশ
তার সাথে সাথে ইদং বিনাশ।
অবশেষে যাহা জ্যোতির্ময় সত্তা
সেই স্বরূপ, স্বভাব সেই আত্মা॥

* * *

29শে জানুয়ারি, 1947

(84) রমণ কে?

ভগবানের একজন ভক্ত ডাঃ টি. এন. কৃষ্ণস্বামী 7ই ডিসেম্বর মাদ্রাজে ভগবানের জয়ন্তী (জন্মদিন) পালন করে। সে সময়ে একজন পণ্ডিত তাঁর বক্তৃতায় কোথাও থেকে উদ্ধৃত ক'রে বলেন যে ভট্টপদ তিরুচুড়ীতে রমণ রূপে জন্ম নেবেন বলে উল্লেখ আছে। যখন ভক্তরা এই উল্লেখটি খুঁজছিল তখন ভগবান নিজেই বললেন, ''নায়না (গণপতি মুনি) বলেছিল যে স্কন্দ (কার্তিক) প্রথমে ভট্টপদ তারপর সম্বন্ধ (তিরুজ্ঞান সম্বন্ধ), আর তৃতীয়বার রমণ হয়েছেন। শ্রীশঙ্করের সৌন্দর্য লহরীর 'দ্রাবিড় শিশু' নামটা সম্বন্ধকে বোঝায়, তাই না? অতএব শঙ্করের সমসাময়িক ভট্টপদের থেকে

সম্বন্ধ আগেই ছিলেন। নায়না বলেছিল সম্বন্ধ ভট্টপদের পরবর্ত্তীকালে ছিলেন। একটার সঙ্গে অন্যটার মিল হয় না উপরোক্ত পণ্ডিতের উল্লিখিত অংশটি কোন্ মতের অনুযায়ী জানা নেই।''

আলোচনা শুনে অবাক হয়ে সবাইকে চমকিত ক'রে বলে উঠলাম, ''এর জন্য এত আলোচনার কী দরকার? ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেই হয়। ভগবান কি জানেন না, তিনি কে? যদি এখন নাও বলেন, পাহাড়ে অমৃতনাথ যতীন্দ্রের 'রমণ কে'? গানটার উত্তরে তিনি নিজেই বলেছেন। ভগবান উত্তর দিলেন, ''হাঁ ঠিক।'' একটু হেসে, অল্পক্ষণ থেমে বললেন, ''অমৃতনাথ অদ্ভুত লোক ছিল। তার সব বিষয়ে খুব উৎসাহ ছিল। যখন পাহাড়ে ছিলাম সে মাঝে মাঝে এসে আমার সঙ্গে থাকত। একদিন আমি কোথাও গেছি। আমার ফিরে আসার আগে সে একটা কাগজে মালয়ালামে 'রমণ কে' কবিতাটা লিখে রেখে চলে গেছে। আমি কাগজে কী লেখা আছে দেখতে গিয়ে সেটা পেলাম। সে ফিরে আসার আগে আমিও মালয়ালামে তার উত্তরটা নীচে লিখে কাগজটা রেখে দিলাম। সে আমার অলৌকিক শক্তি আছে ভাবতে ভালবাসত। মালয়ালামে যে জীবনী লেখে তাতে অলৌকিক শক্তির কথা লেখে, নায়না সেটা কাউকে দিয়ে পড়িয়ে শোনে একটু শুনে 'থামো, হয়েছে' বলে সেটা ছিঁড়ে ফেলে। তার প্রশ্ন করার কারণটা এই। সে আমার ওপর হরি, যতী, বররুচি বা ঈষাগুরুর মত অতিপ্রাকৃত শক্তি আরোপ করার চেষ্টায় ছিল। আমি তার কী উত্তর দিলাম কবিতাটাতে আছে। তারা আর কী করবে? কোনো উত্তর দিতে পারলে না। ও দু'টির তেলুগু অনুবাদ আছে, তাই না?''

''হাঁ, আছে'', আমি বললাম, ''ভগবান যে স্বয়ং পরমাত্মা এটা বোঝাতে তাঁর নিজের কথাই যথেষ্ট।'' ভগবান হেসে মৌনাবলম্বন করলেন।

'রমণলীলা'য় লিখিত মালয়ালি কবিতা দু'টি নীচে দিলাম।

অমৃতনাথের প্রশ্ন–

অরুণাচল গুহার রমণ কে?
করুণাসাগর রূপে বিখ্যাত যে
বররুচি, ঈষাগুরু হরি কি যতীন্দ্র
মহিমা জানিতে ইচ্ছুক অন্তর॥

ভগবানের উত্তর–

বিষ্ণু অবধি সকল জীবের হৃদয় কমল অভ্যন্তরে,
অরুণাচল রমণ পরমাত্মন্ শুদ্ধ সত্ব জ্যোতির্ময়
প্রেমে গলিত মন, হৃদয়ে হলে ধারণ সেথা প্রিয়তম
শুদ্ধ বোধের সূদদর্শনে, আত্মস্বরূপ নিরীক্ষণ॥

* * *

30শে জানুয়ারি, 1947

(85) দ্রাবিড় শিশু

গতকাল ভগবান বলেছিলেন যে শঙ্কর 'সৌন্দর্য লহরীতে' সম্বন্ধকে 'দ্রাবিড় শিশু' অখ্যা দিয়েছেন, তাই না? গতরাত্রে একটা তেলুগু ভাষ্য সমেত 'সৌন্দর্য লহরী' নিয়ে এলাম, তাতে শঙ্করের সম্বন্ধের বিষয়ে লেখা শ্লোকটা পড়লাম–

তবস্তন্যং মন্যে ধরণিধরকন্যে হৃদয়তঃ
পয়ঃ পারাবারঃ পরিবহতি সারস্বতমিব।
দয়াবত্যা দত্তং দ্রাবিড়শিশুরাস্বাদ্য তবয়ৎ
কবীনাং প্রৌঢ়ানামজনি কমনীয়ঃ কবয়িতা॥ 75

হে ধরণিধর কন্যে, মনে হয় তোমার
কাব্যরাশি পারাবার হৃদে হল স্তন্যধারা।
দ্রাবিড় শিশু কৃপায় তোমার সে স্তন্যপানে

শ্রেষ্ঠ কবি হল সে যে সকল কবিজনে॥

তেলুগু ভাষ্যে 'দ্রাবিড় শিশুর' অর্থ করা হয়েছে শঙ্কর। পরের দিন ভগবানকে দেখালাম। ভগবান বললেন, ''তেলুগু অর্থকার এটা ভুল করেছে। তামিল 'সৌন্দর্য লহরীতে' 'দ্রাবিড় শিশুর' অর্থ শঙ্কর নয়, সম্বন্ধ করা হয়েছে।'' বলে বইটা চেয়ে পাঠালেন আর সম্বন্ধর 'দ্রাবিড় শিশু' নাম হওয়ার বিষয়ে যা লেখা ছিল সেটা পড়ে অর্থ করে বললেন–

''সম্বন্ধ সিরকালি গ্রামের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ শিবপদ হৃদয়ার ও তাঁর পত্নী ভগবতীয়ারের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতা নাম রাখেন আলুড়য় পিল্লায়াব। ছেলেটি যখন তিন বছরের তখন তার বাবা তাকে নিয়ে একদিন তিরুত্তোনি অপ্পর কোয়েলে (মন্দির) যান। তিনি পুষ্করিণীতে স্নানে গিয়ে 'অঘমর্শন' মন্ত্র পাঠ ক'রে জলে ডুব দিলেন। ছেলেটি বাবাকে জলে দেখতে না পেয়ে ভয়ে দুঃখে চারিদিকে চাইতে লাগল। বাবার খোঁজ নেই। আর থাকতে না পেরে মন্দিরের রথের দিকে চেয়ে 'ও বাবাগো! ও মাগো!' বলে চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠল। তৎক্ষণাৎ শিব পার্বতীর সঙ্গে আকাশে আবির্ভূত হয়ে ছেলেটিকে দর্শন দিলেন। শিব পার্বতীকে সোনার বাটিতে শিব-জ্ঞানরূপ স্তন্যদুগ্ধ ভরে ছেলেটিকে পান করতে দিতে বললেন, পার্বতীও তাই করলেন। দুধ পান ক'রে ছেলেটির সব দুঃখ মিটে গেল আর দিব্য দম্পতিও অন্তর্ধান করলেন।

''জ্ঞানদুগ্ধ পান ক'রে সম্বন্ধ সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন মনে পুকুরের পাড়ে বসে রইল। তার মুখ থেকে দুধের ধারা গড়াতে লাগল। বাবা স্নান করে এসে ছেলের অবস্থা দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে জিজ্ঞাসা করলেন 'কে তোকে দুধ দিয়েছে? যার তার কাছে দুধ খেতে নেই, জানো না? বল, কে তোকে দুধ দিয়েছে, না হলে আজ তোকে মেরেই ফেলব।' সম্বন্ধ তৎক্ষণাৎ দশটি পদে একটি তামিল কবিতা আবৃত্তি করলে যার প্রথম পঙ্‌তি হল–

‘তোড়ুড়য় চেভিয়ন্ন ভিতেয়েড়িওর দ্রভেণমদিচুড়ি’

‘‘প্রথম পদের সারাংশ ‘কুন্ডলধারী, বৃষভবাহন, চন্দ্রমৌলী, চিতাভস্মভূষিতাঙ্গ আমার হৃদয় হরণ, বেদধারী তপস্যারত সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে বরদানকারী, ব্রহ্মপুরীবাসী আমার যে পিতা ও মাতা আছেন, তারাই এই দুগ্ধ দিয়েছেন।’ এই বলে সে শিবপার্বতীর যে রূপ দেখেছিল তার বর্ণনা করলে আর দুধ দেওয়ার কথা বলে মন্দিরের রথটা দেখালে।’’

‘‘কবিতাগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, যাঁরা তাকে দুধ পান করতে দিয়েছিলেন তাঁর শিবপার্বতী ছাড়া আর কেউ নয়। লোক জড়ো হয়ে গেল। সেইদিন থেকে ছেলেটির কবিত্ব শক্তি অনর্গল ধারায় বয়ে চলল। সে কারণে শঙ্কর গেয়েছেন, ‘তবস্তন্যং মন্যে’। অতএব ভাষ্যকার সিদ্ধান্ত করেছেন যে ‘দ্রাবিড় শিশু’ বলতে সম্বন্ধকেই বোঝাচ্ছে। নায়নাও ‘শ্রীরমণগীতায়’ তাঁকেই দ্রাবিড় শিশু বলেছে।’’

* * *

1লা ফেব্রুয়ারি, 1947

(86) জ্ঞানসম্বন্ধমূর্তি

ভগবানের তামিল ভাষ্য পড়ে ‘সৌন্দর্য লহরীতে’ সম্বন্ধকেই যে ‘দ্রাবিড় শিশু’ বলা হয়েছে, বলার পর, হলঘরে এই বিষয়ে দু‘তিন দিন ধরে আলাপ-আলোচনা চলল। এই অবসরে একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করলে ‘‘সম্বন্ধর আসল নাম ‘আলুড়য় পিল্লায়ার’ ছিল, তাই না? জ্ঞানসম্বন্ধ নাম কখন আর কেনই বা হল?’’ ভগবান বললেন, ‘‘দেবীর দেওয়া দুধপান করাতে তার জ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধ হয় তাই তার নাম ‘জ্ঞানসম্বন্ধ নয়নার’ হয়। তার অর্থ সে প্রচলিত গুরুশিষ্য পরম্পরা ছাড়াই জ্ঞানী হয়েছিল। এইজন্য আশপাশের লোকেরা তাকে সেদিন থেকে ওই নামে উল্লেখ করতে শুরু করে দিলে। কারণটা এই।’’

আমি বললাম, ''ভগবানও কোন ব্যক্তিগত গুরু ছাড়াই জ্ঞান লাভ করেছেন, নয় কি?'' ভগবান বললেন, ''হাঁ ঠিক তাই। সেজন্য কৃষ্ণায়া সম্বন্ধ ও আমার মধ্যে অনেক মিল দেখিয়েছিলেন।''

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, '''রমণলীলায়' বলা হয়েছে যে সম্বন্ধ যখন তিরুভল্লামলই-এ আসছিল তখন বন্যজাতিরা তার সব সম্পত্তি কেড়ে নেয়। সে একজন প্রজ্ঞাবান জ্ঞানী ছিল। তার আবার সম্পত্তি কী?'' ভগবান বললেন, ''ও! সেটা! তার ভক্তিমার্গ ছিল, তাই না? সুতরাং তার সোনার করতাল, মুক্তার ঝালর দেওয়া পাল্‌কি, ঈশ্বরের আজ্ঞায় আরও সাজসরঞ্জাম ছিল, তার একটা মঠ ও তার আনুষঙ্গিক যা থাকে সবই ছিল।'' আমি বললাম, ''তাই নাকি? কখন এ সব হল?''

ভগবান আবেগের সঙ্গে বলতে লাগলেন, ''যখন থেকে তার নাম 'জ্ঞানসম্বন্ধ' হল অর্থাৎ ছোটবেলা থেকে সে অবিরত কবিতা রচনা করে গেয়ে চলল আর তীর্থে তীর্থে ঘুরতে লাগল। প্রথমে সে 'তিরুকোলক্কা' নামে এক তীর্থে যায়, মন্দিরে গিয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে ছোট্ট হাতে তালি দিয়ে গান গাইলে। ঈশ্বর খুশি হয়ে তাকে সোনার করতাল দিলেন। সেই থেকে সে যখন যেখানে গান গায় হাতে করতাল বাজায়। তারপর সে চিদাম্বরম ও অন্যান্য তীর্থ দর্শন ক'রে 'মরণপদি' নামে এক তীর্থস্থানে গেল। তখন ট্রেন ছিল না, সেখানের অধিষ্ঠিত দেবতা ছোট ছেলেটিকে হেঁটে হেঁটে তীর্থ করতে দেখে দয়া পরবশ হয়ে, সন্ন্যাসীর উপযুক্ত মুক্তা দেওয়া ছাতা, পাল্‌কি ইত্যাদি আরও নানা বস্তু মন্দিরে রেখে, মন্দিরের পুরোহিত ও সম্বন্ধকে স্বপ্ন দিয়ে, ব্রাহ্মণকে বললেন, 'সসম্মানে এগুলো সম্বন্ধকে দিও' আর সম্বন্ধকে বললেন, 'ব্রাহ্মণ তোমায় এগুলো দেবে তুমি নিও।'' ঈশ্বরের দান বলে সম্বন্ধ অস্বীকার করতে পারলে না। সুতরাং যথোচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে সেসব গ্রহণ করে প্রদক্ষিণাদি ক'রে সে পাল্‌কিতে উঠল। সেই থেকে সে পাল্‌কি চড়ে তীর্থ করত। ক্রমশঃ কয়েকজন সঙ্গী জুটল, একটা মঠও হল। যাই হোক, তীর্থের কাছাকাছি এলে, গোপুরম দেখা

গেলেই সে পাল্‌কি থেকে নেমে বাকি পথ পায়ে হেঁটেই যেত। সে এখানে তিরুকৈলুর থেকে হেঁটে এসেছিল। কারণ সেখান থেকেই অরুণগিরির চূড়া দেখা যায়।''

একজন তামিল ভক্ত বললে যে 'পেরিয়া পুরাণে' তার এখানে আসার কথা ভালভাবে বলা নেই, তাতে ভগবান উত্তর দিলেন–

''না। পেরিয়া পুরাণে নেই। উপমন্যুর সংস্কৃত 'শিবভক্ত বিলাসে' আছে। সম্বন্ধ আরাকান্ডানালুরের বিরাটেশ্বরকে পূজা করে গান গেয়ে তাঁকে খুশি ক'রে তারপর অতুল্যনাথেশ্বরকেও সেইভাবে পূজা করে। সেখানেই সে অরুণগিরি চূড়া দেখতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে স্তুতি বন্দনা গাইলে আর সেখানে অরুণাচলেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করলে। সেখানে সে যখন একটা মণ্ডপে বসে আছে, অরুণাচলেশ্বর প্রথমে তাকে জ্যোতিরূপে দর্শন দিলেন, পরে এক ব্রাহ্মণের বেশে দেখা দিলেন। সম্বন্ধ এই ব্রাহ্মণকে চিনতে পারলেন না। ব্রাহ্মণের হাতে ফুলের সাজি। অকারণে সম্বন্ধের মন ব্রাহ্মণের প্রতি চুম্বকের মত আকৃষ্ট হল। সে তৎক্ষণাৎ হাত জোড় করে জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি কোথা থেকে আসছেন?' ব্রাহ্মণ বললেন, 'অরুণাচল থেকে আসছি। আমার গ্রাম কাছেই।' সম্বন্ধ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'অরুণাচল! কতদিন আগে এসেছেন?' ব্রাহ্মণ উদাসীন ভাবে বললেন, 'ক'দিন আগে? রোজ সকালে এসে ফুল তুলে অরুণাচলেশ্বরের জন্য মালা গেঁথে বিকালে ফিরে যাই।' সম্বন্ধ অবাক হয়ে বললে, 'তাই নাকি? তবে যে লোকে বলে অনেক দূর?' বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বললেন, 'কে বলেছে? একবার হাঁটলেই পৌঁছে যাবে, এ আর বেশি কী?' এ কথা শুনে সম্বন্ধ অরুণাচল দেখার জন্য উৎসুক হয়ে বললে, 'তা যদি হয় আমি কি হাঁটতে পারব?' ব্রাহ্মণ বললেন, 'বা! যদি আমার মতো বুড়ো লোক রোজ গিয়ে ফিরে আসতে পারে, তুমি জোয়ান ছেলে পারবে না কেন? বলছ কী?'

''খুব আগ্রহের সঙ্গে সম্বন্ধ বললে, 'মহাশয়, তা যদি হয় তবে আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন', এই বলে সদলে রওনা দিলে। ব্রাহ্মণ

আগে যাচ্ছেন আর এরা সবাই পিছনে, হঠাৎ ব্রাহ্মণ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দলের সবাই যখন এদিক-ওদিকে খুঁজছে, সেই গোলমালে একদল ব্যাধ এসে তাদের ঘিরে ফেলে পাল্‌কি, ছাতা, সোনার করতাল, মুক্তার ঝালর আর যা কিছু দামী জিনিস, সব খাদ্য দ্রব্য ও তাদের পরনের জামা কাপড় সব কেড়ে নিলে। তাদের শরীরে কেবল কৌপীনটুকু রইল। কেন যে এমন হল তারা বুঝতে পারলে না, খুব রৌদ্রের তেজ, কোন আশ্রয় নেই, সবাই ক্ষুধার্ত, খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। তারা আর কী করে? সম্বন্ধ প্রার্থনা করতে লাগল 'হে প্রভু! এ কী পরীক্ষা? আমার যা হয় হোক, এরা কেন এত কষ্ট পায়।' প্রার্থনা শুনে ঈশ্বর নিজমূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে বললেন, 'হে পুত্র! ব্যাধেরা আমার প্রমথগণ। তারা তোমাদের সাজ-সরঞ্জাম থেকে বঞ্চিত করেছে কারণ অরুণাচলেশ্বর দর্শন আড়ম্বরশূন্য ভাবেই করা ভাল। সেখানে পৌঁছে গেলে তোমাদের জিনিসপত্র আবার পেয়ে যাবে। এখন মধ্যাহ্ন, পেটভরে খেয়ে এগিয়ে যাও' এই বলে তিনি অন্তর্ধান করলেন।

''তৎক্ষণাৎ নিকটের সমতল স্থানে একটা তাঁবু দেখা গেল। ব্রাহ্মণেরা তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে সম্বন্ধ ও তার দলের সবাইকে ভিতরে ডেকে অনেক প্রকার সুস্বাদু খাদ্য পরিতোষপূর্বক খাওয়ালে আর শেষে তাম্বুল ও চন্দন দিয়ে আপ্যায়িত করলে। এতদিন সম্বন্ধ অন্যদের আপ্যায়িত করেছে আজ ঈশ্বর তাকে সমাদর করলেন। একটু বিশ্রামের পর তাঁবুর এক ব্রাহ্মণ বললে, 'মহাশয়! চলুন এবার অরুণগিরি যাওয়া যাক।' খুব খুশি হয়ে সম্বন্ধ সব সাথীদের নিয়ে চলল। তাদের রওনা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁবু ও তাঁবুর লোকজন অদৃশ্য হয়ে গেল। সম্বন্ধ এই সব ঘটনা ভাবতে ভাবতে চলল, তারা পৌঁছতেই পথপ্রদর্শক ব্রাহ্মণও অদৃশ্য হয়ে গেল। হঠাৎ তাঁবু ও তার লোকজন এবং যে ব্যাধেরা তাদের জিনিস নিয়েছিল তারা সামনে এল আর তাদের জিনিস ফেরত দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। সম্বন্ধ আনন্দাশ্রু ফেলতে ফেলতে প্রভুর করুণা গাথা গাইলে আর কিছুদিন সেখানে বাস ক'রে কবিতা কুসুমাঞ্জলি দিয়ে পূজা সমাপন ক'রে আবার যাত্রা শুরু করলে। আপন সেবক সম্বন্ধের ওপর করুণা পরবশ হয়ে ঈশ্বর নিজেই তাকে আদর ক'রে এই পাহাড়ে ডেকে আনলেন।''

ভক্তিতে হৃদয় ভরে, আবেগময় কণ্ঠস্বরে গল্পটি বলে ভগবান মৌনাবলম্বন করলেন।

* * *

2রা ফেব্রুয়ারি, 1947

(87) দিব্যশক্তি

আজ বেলা আড়াইটার সময়ে হলঘরে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখি ভগবান কারও দেওয়া একটা ছোট কাগজ পড়ছেন। ভগবান কী বলেন শোনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভগবান কাগজটা ভাঁজ ক'রে রেখে হেসে বললেন, ''ভগবানের থেকে নিজেকে পৃথক ভাবলেই এ সব ওঠে। কোন পার্থক্য নেই ভাবলেই আর এসব নেই।''

ভগবানের থেকে আমাদের পার্থক্য নেই এটা কি কেবল বললেই হবে? একজনকে, সে কে, কোথা থেকে এল, আগে খুঁজতে হবে তবে না ভগবানের থেকে পৃথক নয় বলা যাবে? ভগবান একথা বলছেন কেন? ভাবছিলাম জিজ্ঞাসা করি কেন ভগবান আমাদের বিভ্রান্ত করছেন কিন্তু সাহস পাচ্ছিলাম না। ভগবান আমার জিজ্ঞাসা বুঝতে পারলেন কি না জানি না যা হোক তিনি নিজেই বলতে শুরু করলেন–

''তার আর ভগবানের মধ্যে পার্থক্য নেই বোঝার জন্য আগে তার যা নিজস্ব নয় সেই সব অসৎ উপাধি ত্যাগ করতে হবে। উপাধি ত্যাগ না হলে সত্য উপলব্ধি হয় না। একটা চৈতন্যময় শক্তি আছে যা সব কিছুর উৎস। সেই শক্তিটাকে ধরতে না পারলে উপাধি ত্যাগ করাও যায় না। সাধনা কেবল সেই শক্তিটা ধরার জন্য।''

এ কথা শুনে হঠাৎ কীরকম সাহস হয়ে গেল, বলে ফেললাম, ''তবে একটা শক্তি আছে?'' ভগবান বললেন, ''হাঁ, একটা শক্তি আছে আর সেই শক্তিকে 'স্ব–সুরণ' (আত্মার বোধ) বলে।'' আমি কম্পিত স্বরে বললাম,

''ভগবান হাল্কাভাবে বলেন যে ঈশ্বরের সঙ্গে পার্থক্য নেই ভাবলেই যথেষ্ট হবে। কিন্তু সেই শক্তিকে ধরতে পারলে তবেই না অসৎ উপাধি ত্যাগ করতে পারব। সেটা দিব্যশক্তি বা স্ব-সুরণ যাই হোক সেটা আমাদের জানতে হবে তো? যত চেষ্টাই করি না কেন সেটা জানা যায় না।''

এ যাবৎ কখনো সকলের সামনে ভগবানকে এভাবে কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। আজ, অন্তরের আকূতি এতই প্রবল ছিল যে কথায় কথায় আপনা হতে কথাগুলো মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, চোখে জল এসে গেল, সেজন্য দেওয়ালের দিকে মুখটা ঘুরিয়ে নিলাম। আমার পাশে বসা মহিলাটি পরে বলেছিল যে ভগবানের চোখও জলে ভেজা দেখাচ্ছিল। দীনের প্রতি তাঁর কী সদয় হৃদয়!

ভগবান সময়ে সময়ে বলতেন, ''জ্ঞানী দুঃখীর সঙ্গে কাঁদেন, সুখীর সঙ্গে হাসেন, খেলুড়ের সঙ্গে খেলেন, গায়কের সঙ্গে গান করেন গানের সঙ্গে তাল দিয়ে যান। তাঁর কী এসে যায়? তাঁর উপস্থিতি যেন একটা নির্মল স্বচ্ছ দর্পণ আমরা যেমন, সেখানে তেমনই ছায়া পড়ে। আমরা জীবনে নিজ নিজ ভূমিকা অভিনয় করি ও তার ফল ভোগ করি। দর্পণ বা দর্পণের আধারের তাতে কী ক্ষতিবৃদ্ধি হবে? তাদের লাভ-লোকসান নেই, তারা কেবল আশ্রয় মাত্র। সংসারের অভিনেতারা- কর্মের কর্তারা নিজেরাই ভেবে ঠিক করুক কোন গানটা বা কাজটা জগতের কল্যাণকারী, কোনটা শাস্ত্রসঙ্গত আর কোনটা সাধ্যপর।'' ভগবান এরূপ বলতেন। এটা একটা বাস্তব উদাহরণ।

* * *

4ঠা ফেব্রুয়ারি, 1947

(88) সুষুপ্তি ও স্বরূপ

আজ বিকালে একজন একটা প্রশ্ন লিখে ভগবানকে একটা কাগজ দিলে। প্রশ্নের সারাংশ, ''নিদ্রাতে জগতের কী হয়? জ্ঞানী নিদ্রায় কী

অবস্থায় থাকেন?'' অবাক হওয়ার ভাব দেখিয়ে ভগবান উত্তর দিলেন, ''ওহো! তুমি এই জানতে চাও? ঘুমে তোমার শরীরের কী হচ্ছে আর সেটা কী অবস্থায় থাকে, জানো কি? ঘুমে তোমার শরীর যে এখানে, এই জায়গায়, এই মাদুরে, এই অবস্থায় রয়েছে তা ভুলে কোথাও ঘুরে বেড়াও আর কত কী করে বেড়াও। জেগে উঠলেই তখন এখানে রয়েছ বুঝতে পারো। কিন্তু কী ঘুমে কী জাগ্রতে তুমি সর্বদাই ছিলে। তোমার শরীরটা জড়ের মতো এখানে নিষ্ক্রিয় ভাবে পড়েছিল। অতএব বলা যায় যে ঘুমের অবস্থায় তুমি এই শরীরটা নও। তবে ঘুমে তুমি কিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলে ? এই আসা যাওয়ার একটা অবলম্বন থাকা উচিত। তুমি ঘুমাবে বলে শোও কিন্তু তুমি স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করো .তারপর বেশ আরামে কিছু না জেনে ঘুমিয়ে পড়ো। বেশ সুখের ঘুম। সুতরাং তুমি স্বীকার করছ যে ঘুমেও তুমি ছিলে। তবুও বলছ যে সে অবস্থায় তুমি কিছু জানতে না। যেটা সত্য, তুমি বলো তুমি কিছু জানো না। অথচ যেটা অসৎ ও ক্ষণস্থায়ী সেটা জানি বলছ। প্রকৃত পক্ষে যা সত্য তা তুমি জানো। এই ক্ষণস্থায়ীগুলো- এদের আসতে যেতে দাও- তারা তোমায় স্পর্শ করবে না। তুমি নিজের সম্বন্ধে জানো না অথচ জগতের কী হয় জানতে চাও? জ্ঞানী ঘুমে কী অনুভব করেন? তুমি যদি প্রথমে তোমার কী হয় জানো তবে জগৎও তার কী হয় জানবে। তুমি জ্ঞানীদের কথা জিজ্ঞাসা করছ- তাঁরা সৎকে- সত্যকে জানেন বলে যে কোন অবস্থা ও পরিবেশে একরূপেই থাকেন। এই যে প্রাত্যহিক কাজ, খাওয়া, ঘুরে বেড়ানো, আর যা কিছু, এসব জ্ঞানীরা অন্যদের জন্য অভিনয় করে যান। একটা কাজও তাঁদের নিজেদের জন্য নয়। আমি অনেকবার বলেছি যে যেমন একদল ভাড়াটে কাঁদুনে আছে যাদের ব্যবসা হল পয়সা নিয়ে কাঁদা সেই রকম জ্ঞানীরা ও অনাসক্ত হয়ে অন্যের জন্য কাজ করে যান আর সেজন্য তাঁরা কাজের দ্বারা কিছুমাত্র প্রভাবিত হন না।''

আর একজন ভক্ত যেই কথার সূত্র ধরে জিজ্ঞাসা করলে, ''স্বামী, আপনি বলেন স্বরূপ জানতে হবে আর উপলব্ধির জন্য ধ্যান করা

প্রয়োজন। কিন্তু প্রথমতঃ ধ্যানটা কী?'' ভগবান উত্তর দিলেন, ''ধ্যানের অর্থ ব্রহ্ম মনের দোষ দূর করার জন্য কিছু নিষ্ঠা অবলম্বন করতে বলা হয় আর সেটা অবলম্বন করেই ধ্যান অভ্যাস করতে হবে। এরূপ করতে করতে দোষগুলো চলে যাবে। দোষ চলে গেলে ধ্যানও ব্রহ্মের মতো দৃঢ় হবে। তপস্যাও তাই। বাসনা কী করে দূর করা যায় জিজ্ঞাসা করা হলে, উত্তর হয় 'তপস্যা করো।' কিন্তু তপস্যার ফল কী? বলা হয় 'তপস্যার ফল তপ।' তপের অর্থ স্বরূপ (আত্মোপলব্ধি)। যা সত্য তাই স্বরূপ, সেই আত্মা, পরমাত্মা, সেই ব্রহ্ম। সেই সব কিছু। সাধারণতঃ শাস্ত্রের পরিভাষায় বলতে গেলে 'ধ্যান করো' বলতে হয় কিন্তু আসলে কে ধ্যান করছে জানলে আর এরূপ সংশয় হয় না।'' এই ভাবটি ভগবানের 'উপদেশ সার'-এ বলা হয়েছে-

অহমপেতকং নিজবিভানকম্।
মহদিদং তপো রমণ বাগিয়ম॥ 30
অহংকার বিনাশিত নিজে প্রকাশিত।
মহাতপ হয় এই রমণ কথিত॥ 30

* * *

7ই ফেব্রুয়ারি, 1947

(89) শ্রীদক্ষিণামূর্তি অবতার

দক্ষিণামূর্তি স্তোত্র তামিলে অনুবাদ ও তার ভাষ্য লেখার সময়ে ভগবান দক্ষিণামূর্তি অবতারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সেই লেখার ভূমিকাতে দিয়েছেন। তাছাড়া নয়টি শ্লোককে তিনটি করে এক এক ভাগে জগৎ, দ্রষ্টা ও দৃশ্য ভাবে সাজিয়েছেন। প্রথম তিনটি (1) বিশ্বদর্পণ (2) বীজস্যান্তরিব (3) যস্যৈব সুরণং- জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে। পরের তিনটি (1) নানাচ্ছিদ্র (2) রাহুগ্রস্ত (3) দেহংপ্রাণম্ - দ্রষ্টা সম্বন্ধে। আর শেষ তিনটি (1) বাল্যাদিষ্বপি (2) বিশ্বং পশ্যতি (3) ভূরম্ভাংস্য- যে আলোকে দর্শন

হয় তার সম্বন্ধে। শেষ শ্লোকটি 'সর্বাত্মত্বমিতি'র অর্থ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মেই লীন হয়ে আছে।

সম্প্রতি আমি এই ভূমিকাটি তেলুগুতে অনুবাদ করি। ভগবান অনুবাদটা পড়ে হেসে বললেন, ''আমি ভূমিকাতে স্তোত্রের সঙ্গে যতটুকু সম্বন্ধ ততটুকু কাহিনী দিয়েছি কিন্তু পুরো গল্পটা আরও উপভোগ্য। সেটা এই রকম– ব্রহ্মা তাঁর মানস পুত্র সনক, সনৎকুমার, সনন্দন ও সনৎসুজাতকে সৃষ্টি বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করতে বললেন তাঁর সৃষ্টিতে আগ্রহী ছিলেন না, তাই রাজি হলেন না। তাঁরা নন্দনবনে দেবতা ও ঋষি পরিবেষ্টিত হয়ে ভাবছিলেন যে কে তাঁদের ব্রহ্মজ্ঞান দেবে। নারদ আবির্ভূত হয়ে বললেন, 'ব্রহ্মজ্ঞান আর কে দেবে স্বয়ং ব্রহ্মা ছাড়া? চলো, আমরা তাঁর কাছে যাই।' তাঁরা রাজি হয়ে ব্রহ্মার সত্যলোকে গেলেন, সেখানে গিয়ে দেখেন যে সরস্বতী বীণা বাজাচ্ছেন আর ব্রহ্মা সামনে বসে শুনছেন ও তার সঙ্গে তাল দিচ্ছেন। তাঁরা এ দৃশ্য দেখে ভাবলেন যে, একজন যে তাঁর পত্নীর বীণাবাদনে মুগ্ধ হয়ে রয়েছেন তিনি কী করে অধ্যাত্মতত্ত্ব শিক্ষা দেবেন। নারদ বললেন, 'চল! বিষ্ণুর ধাম বৈকুণ্ঠে যাওয়া যাক।' তাঁরা সেখানে গেলেন, প্রভু অন্তঃপুরে রয়েছেন। যা হোক নারদ তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ, তিনি দেখে আসি বলে একেবারে ভিতরে চলে গেলেন। শীঘ্র ফিরে আসাতে জিজ্ঞাসিত হলে বললেন, সেখানে ব্রহ্মা তবু বীণাবাদিনী সরস্বতীর থেকে একটু দূরে বসেছিলেন। কিন্তু এখানে লক্ষ্মীদেবী প্রভুর পালঙ্কে বসে প্রভুর পদসেবা করছেন। এ আরও অধম। একজন বিষয়ী যিনি তাঁর পত্নীর অপাঙ্গদৃষ্টিতে বদ্ধ হয়ে আছেন তিনি আমাদের অধ্যাত্মবিদ্যা শিক্ষার কী আর সাহায্য করবেন? দেখ দেখি, প্রাসাদ ও ধামের কী ঐশ্বর্য! নাঃ, এ চলবে না। চল শিবের কাছে যাই।'

তাঁরা সবাই মিলে হিমালয়ে গেলেন ও কৈলাস পর্বতে পৌঁছে আশান্বিত হয়ে পর্বতে উঠলেন। সেখানে অগণ্য গণের মধ্যে শিব তাঁর অর্ধেক শরীর পত্নীকে দিয়ে নৃত্য করছেন, বিষ্ণু মৃদঙ্গ বাজাচ্ছেন আর ব্রহ্মা করতালে তাল দিচ্ছেন। যাঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য এসেছিলেন তাঁরা তো এ

দৃশ্য দেখে হতবাক- 'ভাবলেন এও দেখি স্ত্রীলোক নিয়ে মত্ত! ব্রহ্মার স্ত্রী কাছে বসেছিলেন তবু স্পর্শ করেন নি, যদিও বিষ্ণুকে তাঁর পত্নী স্পর্শ করেছিলেন তাও কেবলমাত্র পদসেবা, কিন্তু শিব পার্বতীকে অর্ধেক শরীর দিয়ে দিয়েছেন। এ একেবারে চলবে না! যাক খুব হয়েছে', বলে সবাই ফিরে চললেন। শিব সবই বুঝলেন আর তাদের জন্য দুঃখিত হয়ে বললেন, 'এ কী ভ্রান্তি এদের! যেহেতু ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর তাঁদের শক্তি সেবিত হয়ে ভক্তদের দর্শন দিয়েছেন তাই এরা মনে করে যে তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানহীন! আগ্রহী সাধকদের কে আর শিক্ষা দেবে?' এই ভেবে পার্বতীকে তপস্যা করতে যাচ্ছি বলে দূরে সরিয়ে করুণাময় প্রভু, বিফল মনোরথ ভক্তেরা যে পথে ফিরছিলেন সেই মানস সরোবরের উত্তরদিকে একটা অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় দক্ষিণামূর্তি রূপে যুবা বেশে চিন্মুদ্রা ধারণ ক'রে বসলেন। আমি এ গল্পটা কোথাও পড়েছি।'' ভগবান বললেন।

আমি বললাম, ''গল্পটা কী সুন্দর! ভগবান সব গল্পটা ভূমিকায় দিলেন না কেন?''

ভগবান বললেন, ''কী জানি! ভাবলাম ভূমিকাতে এত বড় কাহিনী দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কেবল 'অষ্টকের' জন্য যেটুকু দরকার দিয়েছি।''

আরও খোঁজ করাতে জানা গেল যে এ গল্পটা 'শিবরহস্য' বই-এর দশম অধ্যায়ে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'দক্ষিণামূর্তি অবতার' শিরোনামায় দেওয়া আছে। একজন ভক্ত এ কথা শুনে জিজ্ঞাসা করলে, ''অবতার বললে কি দক্ষিণামূর্তির জন্ম কোথায়?'' ভগবান বললেন, ''তাঁর জন্মের প্রশ্ন কোথায়? এটা তাঁর পঞ্চমূর্তির একটি। এর অর্থ তিনি দক্ষিণ দিকে মুখ ক'রে মৌন মুদ্রায় (মৌন ভঙ্গিতে) বসেছিলেন। এর গূঢ়ার্থ হল দক্ষিণ্ অমূর্তি গু মূর্তির অভাব বা অমূর্ত- সেটাই দক্ষিণামূর্তি, অষ্টকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'দক্ষিণামূর্তি অষ্টকে' কি মূর্তির ব্যাখ্যা করা আছে কিংবা মূর্তির অভাব বা অমূর্ত রূপের ব্যাখ্যা করা হয়েছে? শ্রীদক্ষিণামূর্তি- 'শ্রী'র অর্থ মায়া (আবরণ) শক্তি। দক্ষিণের আরও একটা অর্থ 'সমর্থ' আর একটা

অর্থ হয় 'শরীরের দক্ষিণে হৃদয় 'অমূর্তির' অর্থ আকার বা রূপের অভাব। অনেকরকম ব্যাখ্যা হতে পারে, তাই না?''

সেই ভক্ত আবার বললে, ''ভাগবত পুরাণে সনকাদি ঋষিদের চিরকাল পাঁচ বছরের শিশু বলা হয়েছে কিন্তু স্তোত্রে বলা হয়েছে 'বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা' (শিষ্যেরা বৃদ্ধ ও গুরু যুবা)। সেটা কী করে হল?''

ভগবান বললেন, ''জ্ঞানীরা সর্বদাই যুবা (কুমার), তাঁদের যৌবন ও বার্দ্ধক্য নেই। বৃদ্ধ শিষ্যের বর্ণনায় বলা হয়েছে সনকাদি ঋষিরা বয়সে বৃদ্ধ ছিলেন। বয়সে বৃদ্ধ হলেও তাঁরা দেখতে চিরকুমার (শিশু)।''

আমি ভগবানের লেখা ভূমিকাটি আমার করা অনুবাদ দিলাম– ''সনক, সনন্দন, সনৎকুমার ও সনৎসুজাত ব্রহ্মার চারজন মানস পুত্র, তাঁরা যখন শুনলেন যে সৃষ্টি কার্যের জন্য তাঁদের জন্ম হয়েছে, তাঁরা তাতে রাজি না হয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য গুরু খুঁজতে বার হলেন। ভগবান শিব তাঁর একান্ত ভক্তদের প্রতি করুণা ক'রে একটা অশ্বত্থ গাছের তলায় মৌন হয়ে দক্ষিণামূর্তিরূপে চিন্মুদ্রা ধারণ ক'রে বসলেন। সনকাদি ঋষিরা তাঁকে দেখে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সামনে তৎক্ষণাৎ আত্মোপলব্ধি করলেন। যারা মৌন ও আদিরূপের (দক্ষিণামূর্তির) যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে না তাদের জন্য শঙ্কর সংক্ষেপে সেই সার্বজনীন সত্যটি স্তোত্রাকারে লিখেছেন, আর উত্তম অধিকারীর জন্য ব্যাখ্যা করেছেন যে, যে শক্তি জ্ঞানের তিনটি প্রতিবন্ধক জগৎ, দ্রষ্টা ও দৃশ্য বিনাশ করে তা তার আত্মা থেকে অতিরিক্ত কিছু নয়। সবকিছু অবশেষে নিজের আত্মাতেই লয় হয়।''

* * *

৪ই ফেব্রুয়ারি, 1947

(90) জ্ঞানীর মনই ব্রহ্ম

আজ সকাল সাড়ে সাতটায় হলঘরে গিয়েছিলাম। ঘরের ভিতর নিবিড় নীরবতা। ধূপের সুরভি জানালা দিয়ে বাইরে এসে ভগবানের উপস্থিতি নবাগতদের জানাচ্ছে। ঘরে ঢুকে প্রণাম ক'রে বসলাম। ভগবান এতক্ষণ বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিলেন, এবার সোজা হয়ে পদ্মাসনে বসলেন। পরমুহূর্তে তাঁর দৃষ্টি মহাশূন্যে নিথর হয়ে গেল আর ঘরটি যেন তার আলোয় ভরে গেল। হঠাৎ একজন প্রশ্ন করলে, ''স্বামীজি! জ্ঞানীদের কি মন থাকে কিংবা থাকে না?''

ভগবান স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললেন, ''মন ছাড়া ব্রহ্ম অনুভবের প্রশ্ন নেই। মন থাকলে তবেই উপলব্ধি মন সব সময়ে উপাধির (অবলম্বন) দ্বারা কাজ করে, উপাধি ছাড়া মন নেই উপাধির মাধ্যমেই আমরা একজনকে জ্ঞানী বলি । উপাধি ছাড়া কেউ একজন জ্ঞানী এটা কী করে বলা যায়? কিন্তু মন ছাড়া উপাধি থাকে কী করে? থাকে না তাই বলা হয় জ্ঞানীর মনই ব্রহ্ম। জ্ঞানী সর্বদা ব্রহ্ম দেখছেন। মন ছাড়া দেখা কী করে হয়? তাই বলা হয় যে জ্ঞানীর মন ব্রহ্মাকারা বা অখণ্ডাকারা। বস্তুতঃ তার মনই ব্রহ্ম। যেমন একজন অজ্ঞানী ব্রহ্মকে অন্তরে অনুভব না ক'রে কেবল বাইরের বৃত্তি (বস্তু) দেখে, সেরূপ জ্ঞানীর শরীরটা বাহ্য বৃত্তিতে থাকলেও, অন্তরে সে সর্বদাই ব্রহ্মময়। ব্রহ্ম সর্বব্যাপী মন যখন একবার ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়, তাকে ব্রহ্মাকারা বলা যেন নদীকে সমুদ্রাকার বলা যখন সব নদী সমুদ্রে মিশে যায় তখন সেটা একটা বিশাল জলরাশি সেই অপার জলরাশিতে তুমি কি 'এটা গঙ্গা, এটা গোমতী, এ নদীটা এত লম্বা, এ নদীটা এত চওড়া' এরূপ খুঁজে বার করতে পারো? মনের পক্ষেও তাই।''

অন্য একজন বললে, ''লোকে বলে সত্ত্বগুণ ব্রহ্ম, আর রজঃ ও তমোগুণ আভাস তাই কি?'' ভগবান উত্তর দিলেন, ''হাঁ। সৎ যা আছে

সৎ-ই সত্ত্ব এটাই স্বরূপ। এটা মনের সূদ স্পন্দন। রজঃ ও তমোগুণের সংস্পর্শে এসেই এটা জগতের নানা রূপ সৃষ্টি করে। সত্ত্বের রজঃ ও তমোগুণের সঙ্গে সংস্পর্শ হলে মন আভাসরূপ জগৎ দেখে আর ভ্রমে পড়ে। যদি এই সংসর্গ দূর করা যায় তবে বিশুদ্ধ নির্মল সত্ত্বই থাকে। তাকেই শুদ্ধ সত্ত্ব বলে। সূদাতিসূদ মন দিয়ে বিচার ক'রে সংসর্গ ত্যাগ করতে না পারলে এটা দূর করা যায় না। সব বাসনা দমন হওয়া চাই মন অতি সূদ হওয়া চাই অর্থাৎ সূদাতিসূদ, বলা হয়েছে 'অণোরণীয়ান্' অণু হতে অণু। মন যদি অণু হতে অণু হয়ে যায় তবেই বিশাল হতে বিশালতর হয় 'মহতোমহীয়ান্'। একে চিত্তদর্শন বা শক্তিলাভ বলো যা ইচ্ছা হয় নাম দাও যে নামই হোক না কেন। আমরা ঘুমালে মন তার সব ক্রিয়ার সঙ্গে হৃদয়ে অস্ত যায় তখন আমরা কী দেখি? কিছু না। কেন? কারণ তখন মন নিষ্ক্রিয় আমরা ঘুম থেকে উঠি, জেগে উঠলেই মনও জেগে ওঠে, সেখানে সৎ ও ব্রহ্ম রয়েছে যেইমাত্র জাগ্রত মনের সঙ্গে গুণের সংস্পর্শ হয় অমনি অসংখ্য ক্রিয়া শুরু হয়। যদি এই 'গুণবিকার' (মনের চাঞ্চল্য) ত্যাগ করতে পারো তবে স্ব-প্রকাশ, স্বয়ংসিদ্ধ অহম্ বা 'আমি' ব্রহ্ম সর্বস্থানে অনুভূত হবে। তখন সবই তন্ময়। বেদান্তের পরিভাষা দেখ তারা বলে ব্রহ্মবিদ, ব্রহ্মবরিষ্ঠ ইত্যাদি, তারপর বলে 'ব্রহ্মৈব ভবতি'। সে নিজেই ব্রহ্ম। তাই আমরা বলি জ্ঞানীর মনই ব্রহ্ম।''

আর একজন প্রশ্ন করলে, ''বলা হয় জ্ঞানী সমদর্শী হয়ে ব্যবহার করেন?'' ভগবান উত্তর দিলেন ''হাঁ। জ্ঞানী কীভাবে ব্যবহার করেন?''

মৈত্রী করুণা মুদিতোপেক্ষাণাং
সুখদুঃখ পুণ্যাপুণ্য বিষয়াণাং
ভাবনাতশ্চিত্ত প্রসাদনম্॥

পাতঞ্জলী যোগসূত্র 137

''মৈত্রী (বন্ধুত্ব), করুণা (দয়া), মুদিতা (আনন্দ) ও উপেক্ষা (উদাসীনতা) এরূপ অন্যান্য ভাব তাঁদের স্বাভাবিকভাবে হয়। সং-এর

প্রতি মিত্রতা, দীনের প্রতি দয়া, সৎকাজে আনন্দ ও দুষ্টের প্রতি উপেক্ষা ইত্যাদি জ্ঞানীর স্বাভাবিক গুণ।''

* * *

9ই ফেব্রুয়ারি, 1947

(91) মায়া

গতকাল যে ভক্ত প্রশ্ন করেছিল, আজ বিকালে সেই আবার মায়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, ''স্বামী, মানুষের মনে যে অসংখ্য বস্তু সত্য বলে মনে হয় এসব মায়া, তাই নয় কি? যদি এদের ত্যাগ করা যায় তবে কি মায়াও চলে যাবে?''

ভগবান বললেন, ''যতক্ষণ ঈশ্বর ও আমি পৃথক বোধ রয়েছে ততক্ষণ মায়া মায়াই থাকবে। যখন সেই ভ্রমটা চলে যায় আর সে বুঝতে পারে যে সে নিজেই ঈশ্বর তখন বুঝবে যে মায়াটা তার নিজের থেকে কিছু পৃথক বস্তু নয়। ঈশ্বর মায়া রহিত ও মায়া থেকে পৃথক কিন্তু ঈশ্বর ছাড়া মায়া নেই।'' প্রশ্নকর্তা বললে, ''অতএব মায়া তখন একেবারে শুদ্ধ মায়া হয়ে যায়, তাই না?'' ভগবান উত্তর দিলেন ''প্রায় তাই দাঁড়ায় ব্যক্তি না থাকলে ঈশ্বরকে জানে কে? আর মায়া না থাকলে ব্যক্তিও নেই। যখন একবার নিজেকে জানা যায় তখন মায়ার দোষ আর স্পর্শ করে না একে শুদ্ধ মায়া বলো আর যাই বলো এটাই মূলকথা।''

আর একজন আলোচনাটার সূত্র ধরে বললে, ''জীব মায়ার দোষ যেমন সীমিত দৃষ্টি, সীমিত জ্ঞান ইত্যাদির অধীন, অন্যপক্ষে ঈশ্বরের অখণ্ড দৃষ্টি ও জ্ঞান আরও নানা বিশেষত্ব আছে। জীব যদি তার খণ্ড দৃষ্টি ও খণ্ড জ্ঞান আর অন্যান্য বিশেষত্ব ত্যাগ করে তবে জীব ও ঈশ্বর এক হয়ে যাবে কিন্তু ঈশ্বর কি তাঁর বিশেষত্ব অখণ্ড দৃষ্টি ও জ্ঞান ইত্যাদি ত্যাগ করবেন না? এগুলোও কি মায়া নয়?''

ভগবান বললেন, ''এই তোমার সংশয়? আগে তোমার সীমিত দৃষ্টি ইত্যাদি বিশেষত্ব ত্যাগ করো তারপর ঈশ্বরের অখণ্ড দৃষ্টি ও অখণ্ড জ্ঞানা সম্বন্ধে ভাবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। আগে নিজের সীমিত জ্ঞান ত্যাগ করো ঈশ্বরের জন্য চিন্তা করছ কেন? তিনি নিজেরটা দেখবেন। আমাদের যতটুকু শক্তি, অন্ততঃ তাঁর ততটুকু তো নিশ্চয়ই আছে। তাঁর অখণ্ড দৃষ্টি ও জ্ঞান আছে কিনা আমরা ভাবব কেন? আমরা আমাদের ভারটুকু নিলেই যথেষ্ট হবে।''

প্রশ্নকারী আবার জিজ্ঞাসা করলে, ''কিন্তু প্রথমে আমাদের একজন গুরু খুঁজতে হবে আমরা যাতে গুণাতীত হতে পারি তিনি সেরূপ অভ্যাস করাবেন খুঁজতে হবে না?''

ভগবান বললেন, ''আমাদের গুণ ত্যাগ করার জন্য যদি আন্তরিকতা থাকে তবে গুরু কি আর পাওয়া যাবে না? আগে আমাদের ওগুলো ত্যাগের ইচ্ছা হওয়া চাই। আমাদের যখন এটি হবে তখন গুরু নিজেই আমাদের খুঁজতে আসবেন আর তা না হলে কোনো না কোনো ভাবে নিজের কাছে টেনে নেবেন। গুরু সদা সতর্ক হয়ে দেখবেন আর আমাদের ওপর লক্ষ্য রাখবেন ঈশ্বর নিজেই গুরু চিনিয়ে দেবেন। বাবা ছাড়া সন্তানের ভালমন্দ আর কে দেখে? তিনি আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন, আমাদের ঘিরে আছেন। পাখি যেমন নিজের ডানার তলায় ডিমকে তা দিয়ে রক্ষা করে তিনিও তেমনি আমাদের রক্ষা করেন। কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হওয়া চাই।''

একজন মহিলা ভক্ত শঙ্করম্মা সাধারণতঃ ভগবানকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভয় পেত কিন্তু এ কথাগুলো শুনে মৃদুস্বরে বললে, ''কিন্তু স্বামীজি! সাধনার জন্য গুরুর উপদেশ চাই, তাই না?'' ভগবান বললেন, ''ওহো! তাই নাকি? কিন্তু উপদেশ তো রোজই দেওয়া হয় যাদের প্রয়োজন তারা নিতে পারে।'' সেখানে উপস্থিত আর একজন বললে, ''কিন্তু আমরা যাতে উপদেশ গ্রহণ করতে পারি তার জন্য ভগবানের আশীর্বাদ চাই।

এটাই আমাদের প্রার্থনা।'' ভগবান উত্তর দিলেন, ''আশীর্বাদ সব সময়ে রয়েছে।''

* * *

10ই ফেব্রুয়ারি, 1947

(92) আদরণ (সম্মান)

আজ মধ্যাহ্নে তিনজন ফরাসি মহিলা পণ্ডিচেরি থেকে মোটর গাড়িতে এলেন। একজন গভর্নরের স্ত্রী আর একজন সেক্রেটারির স্ত্রী আর অন্যজন এঁদের কেউ হবেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রামের পর আড়াইটার সময়ে তাঁর হলঘরে এলেন। দু'জন মহিলা মাটিতে না বসতে পেরে ভগবানের সামনে জানলার ধাপে বসলেন তৃতীয়জন কোনো রকমে মাটিতে বসলেন। তাঁরা তিনটার সময়ে ভগবানের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। এঁদের দেখে, আমার আশ্রম দর্শনার্থিনী আমেরিকান মহিলার কথা, তার পা ছড়িয়ে বসা, সেবকের বারণ করা আর ভগবানের আভৈয়ার ও নামদেবের গল্প বলে সেবককে ভর্ৎসনা করা ইত্যাদির ঘটনা মনে পড়ে গেল। সে সব অনেকদিন আগে লিখেছি। অনুরূপ আরও দু'টি ঘটনা লিখছি।

প্রায় দশমাস আগে ইউরোপীয় ফ্রেডম্যানের সঙ্গে একজন বয়স্কা ইউরোপীয় মহিলা এখানে এসেছিলেন ও দিন কুড়ি ছিলেন। পাশ্চাত্য জীবনযাপনের জন্য মাটিতে বসা অভ্যাস ছিল না। তাছাড়া মহিলার বয়স হয়েছিল। মাটিতে বসতে তাঁর খুবই কষ্ট হত আর একবার বসলে উঠতে পারতেন না। সঙ্গী ভদ্রলোক হাত ধরে উঠতে সাহায্য করতেন। একদিন সকাল ৪টায় হলে গিয়ে দেখি যে তাঁর দু'জনে মেয়েদের বসার জায়গার একেবারে সামনে বসে রয়েছেন। অন্য মেয়েরা কাছে বসতে ইতস্ততঃ করছে, সেজন্য আমি ফ্রেডম্যানকে ইঙ্গিতে সরে বসতে বলাতে তিনিও তৎক্ষণাৎ তাই করলেন। ভগবান বিরক্ত হয়ে আমার দিকে চাইলেন, কিন্তু কেন যে

বিরক্ত হলেন তখন তা বুঝিনি। আমি সোফার কাছে দাঁড়িয়ে কারও সঙ্গে কথা বলছিলাম। হঠাৎ ফ্রেডম্যান দাঁড়িয়ে উঠলেন ও মহিলাটিকে উঠতে সাহায্য করলেন মহিলার চোখে জল আর তিনি খুবই অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদায় নিলেন। ভগবান যথারীতি অনুমতিসূচক ঘাড় নাড়লেন। তারা চলে যেতেই ভগবান আমার দিকে চেয়ে বললেন, ''বেচারি, ওরা চলে যাচ্ছে।'' আমার মনে হল মস্ত বড় একটা অন্যায় ক'রে ফেলেছি তাড়াতাড়ি বললাম, ''আমি দুঃখিত। ওঁরা যে চলে যাবেন জানতাম না।'' ভগবান বুঝলেন যে আমি আমার অন্যায় বুঝেছি আর তার জন্য অনুতপ্ত তাই বললেন, ''না। তা নয় । মাটিতে বসতে ওদের কষ্ট হয়, ইচ্ছা থাকলেও অনেকে তাই আসে না। ওরা পা মুড়ে বসতে অভ্যস্ত নয়। কী আর করবে? বেচারি।''

কিছুদিন আগে একদিন সকালে একজন গরিব বৃদ্ধা তার আত্মীয়দের সঙ্গে এখানে এসেছিল। সে ছাড়া সবাই প্রণাম ক'রে বসে পড়ল। সে কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল। সেবক কৃষ্ণস্বামী তাকে বসতে অনুরোধ করলে, সে কিন্তু বসল না। তার আত্মীয়রা বসতে বললে তাও শুনল না। আমিও তাকে আত্মীয়দের কাছে গিয়ে বসতে বললাম, সে গ্রাহ্যও করলে না। কেউ একজন একটু ধমকের সুরে বললে, ''সবাই বলছে, শুনছ না কেন?'' আমি তার জেদের কারণ জানার জন্য তার সঙ্গীদের দিকে চাইলাম, তারা বললে যে, সে প্রায় অন্ধ তাই ভগবাকে খুব কাছ থেকে দেখতে চায় । আমি উঠে দাঁড়িয়ে তার হাত ধরে ভগবানের সোফার কাছে নিয়ে গেলাম। হাত দিয়ে চোখ আড়াল ক'রে ভাল করে ভগবানের দিকে চেয়ে সে বললে, ''আমি চোখে ভাল দেখতে পাই না। আমায় আশীর্বাদ করুন যেন অন্তরে আপনাকে দেখি।'' করুণা বিগলিত নয়নে ভগবান সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বললেন, ''বেশ তো।''

তারা চলে যেতেই ভগবান আমাদের বললেন, ''বেচারি বৃদ্ধা, চোখে ভাল দেখে না আর কাছে এসে আমাকে দেখতেও ভয় পাচ্ছিল। কী আর করবে তাই দাঁড়িয়েছিল। যাদের চোখ নেই, মনই তাদের চোখ। তাদের

একটা দৃষ্টি– মনশ্চক্ষু, আর মনোযোগ নষ্ট করার জন্য অনেক দৃষ্টি নেই। কেবল মনটা একাগ্র হলেই হল একবার সেটা হলে ওরা আমাদের থেকে অনেক ভাল।'' কী মৃদু ও মিষ্টি ক'রে তিরস্কার!

* * *

11ই ফেব্রুয়ারি, 1947

(93) গুরুর সাক্ষাতে সাধনা

আজ বেলা তিনটার সময়ে হলে পৌঁছালাম। ভগবান ধীরে সুস্থে কোন একজন ভক্তের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। একটা প্রশ্ন ছিল, ''ওরা বলে ভগবানের কাছে জপ, তপ করলে ভাল ফল হয়। তা যদি হয়, আপনার সান্নিধ্যে খারাপ কাজগুলোর কী হয়?'' ভগবান উত্তর দিলেন, ''ভাল কাজের যদি ভাল ফল হয় মন্দ কাজের আরও মন্দ ফল হবে। বারাণসীতে গো দানে যদি অশেষ পুণ্য হয় গো বধেও অশেষ পাপ হবে। যখন বলো, পুণ্যস্থানে অল্প ভাল কাজে অনেক শুভ ফল হয় অনুরূপভাবে অল্প মন্দ কাজে অনেক অশুভ ফল হবে। যতক্ষণ তুমি কর্তা এরূপ বুদ্ধি আছে ততক্ষণ ভাল বা মন্দ যাই হোক না কেন তার ফলভোগও আছে।''

সেই লোকটি বলে চলল, ''বদ–অভ্যাস ছাড়তে চাই কিন্তু বাসনার শক্তি অত্যন্ত প্রবল কী করব?'' ভগবান বললেন, ''সেগুলো ছাড়ার জন্য একটা মানবোচিত চেষ্টা থাকা উচিত। বাসনা ত্যাগের জন্য সাধুসঙ্গ, সৎসঙ্গ, সদাচার ইত্যাদি সদভ্যাস অনুশীলন করতে হবে। চেষ্টা করতে করতে মনের পক্কতা ও ঈশ্বরের কৃপা হলে চেষ্টা সফল হয় আর বাসনা ক্ষয় হয়ে যায়। একেই 'পুরুষকার' বলে। তোমার চেষ্টা ছাড়া ঈশ্বর তোমায় দয়া করবেন, এটা তুমি কী করে আশা করো?''

আর একজন এ কথার সূত্র ধরে বললে, ''বলা হয় যে ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরের চিদবিলাস আর সবই ব্রহ্মময়। তবে আর বদ–অভ্যাস ও অসৎ

আচরণ ত্যাগের কথা কেন বলব?'' ভগবান বললেন, ''কেন? বলছি। এই তো শরীর। মনে করো, এটাতে কোনো ক্ষত হয়েছে। যদি এটা কিছু না বলে অগ্রাহ্য করা যায় তা হলে শরীরে যন্ত্রণা হবে। যদি সাধারণ ওষুধে ভাল না হয় তবে ডাক্তার আসবে, সেটা ছুরি দিয়ে কেটে বাদ দেবে আর সব দূষিত রক্ত, পুঁজ বার ক'রে দেবে। যদি দূষিত অংশ কেটে না ফেলা হয় তবে সেটা পচবে। তারপর যদি সেখানে পট্টি না বাঁধা হয় তবে পুঁজ হবে। আচরণ সম্বন্ধেও সেই কথা। বদ-অভ্যাস ও বদ-আচরণ যেন শরীরের ক্ষত যদি সেগুলো না ত্যাগ করা হয় তাহলে নীচ গতি হয়। সুতরাং সব ব্যারামের উপযুক্ত চিকিৎসা করা দরকার।''

অন্য একজন বললে, ''ভগবান বললেন যে বদ-অভ্যাস ত্যাগের জন্য সাধনা করা উচিত কিন্তু মন নিজে জড় আর সে নিজে থেকে কিছু করতে পারে না চৈতন্য (আত্মা) অচল (নিষ্ক্রিয়) সেও কিছু করে না। তবে সাধনা হবে কী করে?'' ভগবান বললেন, ''ও হো! কিন্তু এখন কথা বলছ কী করে?'' সে বললে, ''স্বামী! সেটা জানি না বলেই জ্ঞান লাভের জন্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি।'' ভগবান উত্তর দিলেন, ''আচ্ছা বেশ। তবে মন দিয়ে শোনো। মন জড় হলেও একটা কিছুর সংস্পর্শে আসার জন্য সব কিছু করতে পারে, সেটা অচল চৈতন্যের 'সান্নিধ্য বল'। চৈতন্যের সাহায্য ছাড়া জড় মন নিজে কিছুই করতে পারে না। চৈতন্যও অচল বলে মনের সাহায্য ছাড়া কিছু করতে পারে না। এটা অবিনাভাব বা অন্যোন্যপর ও অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সেজন্যই পণ্ডিতেরা অনেক দিক থেকে এটাকে বিচার ক'রে সিদ্ধান্ত করেছেন যে মন 'চিৎ-জড়াত্মিকা'। আমাদের বলতে হয় যে চিৎ (আত্মা) আর জড়ের সম্মেলনেই ক্রিয়া হয়।''

ভগবান এই চিৎ-জড় গ্রন্থি সম্বন্ধে সুন্দরভাবে তার সদ্‌বিদ্যার 24 পদে লিখেছেন-

জড়দেহ 'আমি' 'আমি' করে না কখন
সচ্চিতের অনুভব হয় না কখনো।

এই দুই মাঝে দেহজ্ঞানে অহং উদয়
চিৎ-জড় গ্রন্থি একেই কহে।
এই বন্ধন, সূদশরীর, জীবাত্মা
মন, অহংকার, সংসার আরও যাহা।

সদ্‌বিদ্যা- 24

* * *

13ই ফেব্রুয়ারি, 1947

(94) হৃদয়- সহস্রার

বিভিন্ন অবসরে লেখা ভগবানের তামিল কবিতাগুলো এখানে ওখানে অনেক খাতায় ছড়ানো রয়েছে। আমরা অনেকদিন ধরেই ভাবছি যে সেগুলো একটা খাতায় করা উচিত কিন্তু করা আর হয়ে ওঠেনি। চার পাঁচদিন আগে আমি নিরঞ্জনানন্দস্বামীকে এ কথা বললাম আর যদিও আমার তামিল ভাষার জ্ঞান খুব কম তা সত্ত্বেও মহা উৎসাহে একটা খাতা কিনে সেগুলো টুকতে শুরু করব ভাবলাম।

ভগবানকে সেগুলো কোথায় পাওয়া যাবে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, ''সেগুলো হয়ত এক, দুই, তিন নম্বর দেওয়া বড় খাতাতে আছে। একটু খুঁজে দেখো।'' আরও বললেন, ''যখন কেউ চেয়েছে আমি ছোট কাগজে লিখে দিয়েছি। তারা সেগুলো নিয়ে গেছে। কিছু ওই খাতায় টোকা আছে, অনেক নেই। সবগুলো থাকলে এতদিনে অনেক হয়ে যেত। পাহাড়ে থাকতে আরও অনেক লিখেছি। কত ফেলা গেছে। কার-ই বা এত আগ্রহ ও ধৈর্য ছিল? তুমি ইচ্ছা করলে সেগুলো এক জায়গায় করতে পারো।'' এমন দিব্যবাণীরূপ কবিতাগুলো ভবিষ্যতের জন্য না রেখে এভাবে নষ্ট হতে দেওয়া হয়েছে শুনে আমার খুব দুঃখ হল। আমি প্রথম খাতাটা নিয়ে দেখি 'ভগবানের রচনা' শিরোনামায় কয়েকটি কবিতা রয়েছে। সেগুলো কী জিজ্ঞাসা করাতে ভগবান বললেন-

''যখন বিরূপাক্ষ গুহায় ছিলাম নায়না একবার অরুণাচল নামে একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। সে স্কুলের শেষ ক্লাস অবধি পড়েছিল। নায়না ও আমি কথা বলছি, সে একটা ঝোপের কাছে বসেছিল। যেমন ক'রে হোক সে আমাদের কথোপকথন শোনে ও তার সারাংশ নয়টি ইংরাজি পদে রচনা করে। রচনাটা ভাল হয়েছিল তাই আমি 'অহবল' ছন্দে তামিলে অনুবাদ করি। এটা পড়তে তেলুগু 'দ্বিপদের' মত। কবিতার সারার্থ–

'ভগবানের মুখরবি হতে উদ্‌গত বাক্যরশ্মি, গণপতি শাস্ত্রীর (নায়না) মুখচন্দ্রকে উদ্ভাসিত ও উজ্জীবিত করে তাহাই আবার আমাদের মতো লোকেদের মুখমণ্ডল প্রকাশিত করে।'

''আরও একটা কথা। গণপতি শাস্ত্রী বলত যে সহস্রারই উৎস ও সব কিছুর কেন্দ্র। হৃদয় সহস্রারের অবলম্বন, তাই না? হৃদয় সহস্রারকে আলোকিত করে। আমি বলতাম যে হৃদয়ই সবের উৎস আর যে শক্তি হৃদয় থেকে বিচ্ছুরিত হয় তাই সহস্রারকে আলোকিত করে। এই ভাবটি নিয়ে কবিতাটি দ্ব্যর্থবোধক, হৃদয়ই সূর্য ও সূর্যমণ্ডল, আর সহস্রার চন্দ্র।''

* * *

15ই ফেব্রুয়ারি, 1947

(95) তেলুগু বেন্‌বা

সম্প্রতি প্রকাশিত তামিল পুরাণ 'তিরুচুড়ীর' একটা সমালোচনা গতমাসের 'ত্যাগী' পত্রিকায় বেরিয়েছিল। সেই সমালোচনায় তুলনার জন্য 'তিরুচুড়ী বেনবা অন্‌দধি' বই থেকে তিনটি পদ তুলে দেওয়া হয়েছিল। সর্বাধিকারী উৎসাহ দেওয়াতে সমালোচনাটা পড়তে ইচ্ছা হয়েছিল, সেজন্য দশদিন আগে ভগবানের কাছ থেকে পত্রিকাটি চেয়ে নিয়েছিলাম।

বেন্‌বা দ্ব্যর্থবোধক কবিতা। এটা ভূমিনাথের (শিব) উদ্দেশ্যে লেখা, গাইলে বেশ ভালই শোনায়। হলে বসে পত্রিকাটা দেখছিলাম। ভগবান

বুঝলেন যে আমি এর মানে বুঝব না তাই তিনটি পদের সারার্থ বললেন– ''তিরুচুড়ীর মন্দিরের শিবলিঙ্গের নাম ভূমিনাথ, দেবীর নাম সহায়বল্লী এই স্থানীয় পুরাণটি স্কন্দ পুরাণে 'ত্রিশূলপুর মাহাত্ম্য' নামে আছে।

'''ও ভূমিনাথ! স্বর্গের সকল দেবতা তোমায় একেশ্বর বীর বলে প্রশংসা করলে, তুমি নাকি কারও সাহায্য বিনাই নিজের শক্তিতে ত্রিপুরাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয়েছ। কিন্তু তুমি যে অর্ধনারীশ্বর (অর্ধনারী, অর্ধপুরুষ) সুতরাং তুমি আর ত্রিপুরাসুরের সঙ্গে কী করতে পারতে যদি দেবী সহায়বল্লী তোমায় সাহায্য না করত? তোমার বাঁদিক তো তার তার সাহায্য ছাড়া ধনুকে গুণও কি টানতে পারতে?' এটা একটা অর্থ।

'''পর্বতের আকার হওয়ায় তুমি তো অচল শক্তির সাহায্য ছাড়া কী বা করতে পারো? তাই তোমাকে একেশ্বর বলা ঠিক নয়। আমাদের সহায়বল্লীর সাহায্য ছাড়া তুমি কিছু করতে পারো না।' এটা আর একটা অর্থ।'' ভগবান ভক্তির ভাবাবেশে বললেন, ''এই পদগুলোর অনেকভাবে, অনেক রকম ব্যাখ্যা হয়।''

'বেন্‌বা অন্‌দধি' বইটা সম্পাদকের কাছ থেকে বোধহয় পরের দিন এসে পৌঁছাল। দুপুর আড়াইটার সময়ে গেলে ভগবান বললেন যে বইটা পাওয়া গেছে। বইটা দেখার জন্য হাতে নিলে ভগবান হেসে বললেন, ''নায়না সংস্কৃতে 'বেন্‌বা' লেখার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু প্রাস্‌ (ছন্দ) মিলল না সে দেখলে যে আর্যবৃত্ত থেকে এটা আরও কঠিন। সে নিজেই বলেছিল এটা শুক্ল ছন্দ। লক্ষ্মণ শর্মাও তাঁর সংস্কৃত সদ্দর্শন চত্বারিংশৎ বেন্‌বা ছন্দে লিখেছিল। কিন্তু প্রাস ও গণ ঠিক হয়নি । আমি কেবল মঙ্গলাচরণটা সংশোধন করেছিলাম। নরসিংহ রাও এটা তেলুগুতে লিখেছিল, সেটাও ঠিক হয়নি।'' আমি যোগ করি, ''বোধ হয় তেলুগুতে তেমন কোন ছন্দ নেই।'' ভগবান বললেন, ''হাঁ। ঠিক তাই। খুব শক্ত। লিখলে লিখতে পারতাম, কিন্তু হয়ে ওঠেনি।'' আমি ক্ষুণ্ণ মনে বললাম, ''ভগবান কি তেলুগুতে রচনা করা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছেন?'' তিনি বললেন,

''আমি 'গণ' বলে দিলে তুমি নিজেই করতে পারো। আমার করার কী দরকার?'' ''আমি সাধারণ ছন্দই জানি না তা আর এই সব বিশেষ ছন্দ কী জানব? আপনি বললেন নায়না পারেনি। তবে আর কে পারবে? ভগবান নিজেই লিখুন। ভগবানের লেখা সূত্রগুলো খুব সুন্দর হয়, তাই না? আপনি একটু কৃপা করুন না (রচনা করে)?'' আমি অনুনয় করলাম। তিনি কিছু না বলে চুপ ক'রে রইলেন। মনটা দমে গেল, বইটা নিয়ে বাড়ি চলে এলাম।

আমি তিনদিন হলে যেতে পারিনি। যখন চতুর্থ দিনে সেখানে গেলাম, ভগবান আমায় ছোট ছোট কাগজ দিয়ে বললেন, ''সেদিন আমরা তেলুগু বেন্‌বার কথা বলছিলাম। পরের দিন তেলুগুতে তিনটি পদ রচনা ক'রে তারপর তামিলে অনুবাদ করেছি। দেখো। এগুলো শঙ্করাভরণ রাগে, ঢিমে, খুব ঢিমে তালে গাওয়া যায়।''

''আরও ক'টা এই ভাবের পদ দিলে ভাল হয়'' আমি অনুরোধ করি। তিনি উত্তর দিলেন, ''ব্যস্, আর না! তেলুগুতে সুবিধাজনক ছন্দ নেই। লোকে হাসবে। লেখার বস্তুও নেই। সবই সাধারণ কথা।'' আমি বললাম, ''ভগবানের লেখার জন্য বিশেষ বিষয়ের দরকার নেই। আপনার মুখ দিয়ে যা বেরুবে তাই একটা প্রসঙ্গ, তাই বেদ। তেলুগুতে যদি ছন্দ না থাকে ভগবান একটা তৈরি করুন না।''

মুরুগনার আমাকে সমর্থন ক'রে বললে, ''ভগবান যদি কখনো সখনো এ রকম লেখেন, কালে একটা বই হয়ে যাবে। যদি তেলুগুর একটা নূতন ছন্দ হয় তবে সেটা সে ভাষার পক্ষে কম বড় কথা নয়।'' ভগবান উত্তর দিলেন না। আমি আমার খাতায় তিনটি পদ টুকে রাখলাম।

* * *

20শে ফেব্রুয়ারি, 1947

(96) একাত্মপঞ্চকম্

আমার গত চিঠিতে তেলুগু বেন্‌বার কথা লিখেছি। মনে হচ্ছিল ভগবান আরও ক'টা পদ লিখলে পারতেন কিন্তু উপযুক্ত সুযোগের অভাবে বলা হয়নি। গত 16ই বিকালে হলে গেলে দেখি ভগবান একজন ভক্তের সঙ্গে বেন্‌বা ছন্দ নিয়ে কথা বলছেন। তিনি আমায় দেখে তামিল ও তেলুগু ছন্দের পার্থক্য সম্বন্ধে বলতে লাগলেন, ''মনে হয় একবার গুহনমশিবায় স্বামী প্রতিদিন একটা ক'রে বেন্‌বা লিখবে ঠিক করেছিল। তাহলে এক বছরে প্রায় 360টা হয়। সে অনুসারে অনেক পদ লিখেছিল, কিছু নষ্ট হয়ে গেছে, বাকিগুলো তার ভক্তেরা ছাপিয়েছিল। এখনও তার কয়েকটা পাওয়া যায়।'' সেই ভক্ত বললে, ''ভগবান যদি তেমনি রচনা করেন তবে জগতের কি উপকার হবে না?'' ভগবান বললেন, ''কেন জানি না, আমার মন সে দিকে যায় না। কী করতে পারি?'' আমি বললাম, ''এত কম পদ আছে। আরও কিছু হলে ও সঠিক ছন্দ তৈরি করতে পারলে আমাদের ভাষার একটা সম্পদ বাড়ত।''

''সে তো ভাল কথা, কিন্তু আমি কি পণ্ডিত? এসব লিখতে গেলে ভাগবত, মহাভারত আরও অনেক কিছু পড়তে হবে। কী নিয়ে লিখব? লেখারই বা কী আছে?'' তিনি বললেন।

''ভগবান যা লিখবেন তাই উপাদেয় হবে'', উত্তর দিলাম।

তিনি বললেন, ''তুমি কত কবিতা লেখো। তাতে হচ্ছে না? তুমি যদি চাও, আমায় একখানা 'পেদ্দাবাল-শিক্ষা' (তেলুগু বর্ণ পরিচয়) বা 'সুলক্ষ্মণসার' এনে দাও। আমি তোমায় 'গণ' বলে দিচ্ছি, তুমি নিজেই রচনা করতে পারবে।'' আমি বললাম, ''আমি লিখতে চাই না। ভগবান লিখলে, আমি পড়ব না হলে নয়।'' তিনি হাসলেন আর নীরব হলেন।

আমি বাইরে গিয়ে বারান্দার সামনে বসে কিছু লিখছিলাম। কিন্তু দেখ, ভগবান কী স্নেহময়। যেই আমি ঘর ছেড়ে চলে গেছি মনে হয় অমনি তিনি একটা বেন্‌বা রচনা ক'রে ভক্তদের শুনিয়েছেন। তিনি আমায় দেখলেন। সন্ধ্যাবেলা তাঁর বাইরে যাওয়ার সময়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন, ''এই যে আর একটা বেন্‌বা, এখুনি লিখলাম। তুমি দেখতে পারো।'' আনন্দে আত্মহারা হয়ে সেটা দেখলাম আর রেখে দিলাম। ভগবান সেটা তামিলে অনুবাদ ক'রে মুরুগনারকে বললেন, ''আমি কি ভাল তেলুগু জানি? সেজন্য তেলুগু লিখতে চাই না, কিন্তু ও ছাড়ে না। আমি কত আপত্তি করি, ও কিন্তু শোনে না। তাই আমাকে লিখতে হল।''

মুরুগনার বললে, ''ভগবানের কথা এভাবেই আসার কথা।'' তখন সন্ধ্যা ছ'টা। আমি বাড়ি এসে ভাবলাম এটা কাল লিখব। পরের দিন সকাল ৪টায় হলে গেলাম। আমায় দেখেই ভগবান বললেন, ''এই যে কাল রাত্রে আর একটা লেখা হয়েছে। সব সুদ্ধ পাঁচটা হল। এগুলোকে ''আত্মপঞ্চকম্' বলা যায়। কিন্তু শঙ্করের এই নামে একটা রচনা আছে। তবে একে 'একাত্মপঞ্চকম্' নাম দেওয়া যাক। আমি এগুলোতে ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে দিয়েছি। তুমি মিলিয়ে টুকতে পারো।''

নির্দেশমত আমি তার নকল করলাম। আমায় লিখতে দেখে অনেক ভক্ত টুকে নিলে আর মুখস্থ করে ফেললে। আজ বিকালে একজন মহিলা ভক্ত 'একাত্মপঞ্চকম্' হলঘরে গান করলে। যখন সে তৃতীয় স্তবকটা গাইছিল, তার প্রথম কথাটা 'তানালো তানুভুন্ডা', ভগবান আমার দিকে চেয়ে বললেন, ''দেখ, আমি বিরূপাক্ষ গুহায় থাকতে সিনেমার উদাহরণ দিয়েছিলাম তখন সিনেমার এত চল্ হয়নি। শঙ্করের সময়ে সিনেমা ছিল না। তাই তিনি 'বিশ্বং দর্পণ-দৃশ্যমান নগরী' উদাহরণ দিয়েছেন। তাঁর সময়ে সিনেমা থাকলে তিনিও এ উদাহরণ দিতেন না। সিনেমা হওয়াতে আমাদের এখন বেশ সহজে উদাহরণ দেওয়ার সুবিধা হয়েছে।''

* * *

24শে ফেব্রুয়ারি, 1947

(97) জন্ম

গতকাল একজন মহিলা ভক্ত তার খাতাটা ভগবানকে দেখালে, তাতে সে 'একাত্মপঞ্চকম্'টা টুকে রেখেছিল। ভগবান তার খাতায় তাঁর প্রথম জন্মোৎসব পালনের সময়ে ভক্তদের জন্য স্বরচিত আরও দু'টি পদ দেখে আমাদের সেই ঘটনার কথা বললেন–

''বিরূপাক্ষ গুহায় থাকার সময়ে একবার আমার জন্মদিনে, বোধহয় 1912 সালে, যারা আমার কাছে ছিল তারা ধরে বসলে যে এখানে রান্না করে খেয়ে উৎসব পালন করা হোক। আমি তাদের বাধা দিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তারা প্রতিবাদ করে বললে, 'আমরা যদি রেঁধে খাই তাতে স্বামীর কি ক্ষতি হবে?' আমিও ছেড়ে দিলাম। তারা তৎক্ষণাৎ বাসনপত্র কিনলে। সেগুলো এখনও আছে। যে রান্না করাটা সেদিন একটা সামান্য উৎসবরূপে আরম্ভ হয়েছিল আজ তার বাসনপত্রের ঘটা হয়েছে। যা হওয়ার তাই হয় আমাদের চেষ্টায় বন্ধ হয় না। আমি অনেক বোঝালাম কিন্তু তারা শুনলে না। যখন রান্না খাওয়া হয়ে গেল তখন যে ঈশ্বরস্বামী আমার সঙ্গে সে সময়ে ছিল সে বললে, 'স্বামীজি! আজ আপনার জন্মদিন। দয়া ক'রে আপনি দু'টি পদ লিখুন আর আমিও দু'টি রচনা করব।' তখন আমি যে দু'টি পদ লিখেছিলাম, এ খাতায় সে দু'টি রয়েছে দেখছি। সে দু'টি–

1. জন্মদিন পালন করার ইচ্ছা মনে
   জন্ম তোমার কবে হল, সে কোন্ ক্ষণে?
   জন্ম বলি তারে যবে তত্ত্বে প্রবেশ করে,
   অনন্ত সত্তার মাঝে, জনম মরণ পারে॥

2. জন্মদিনে বিলাপ করো, এসেছ সংসারে।
   উৎসব আনন্দে পালন করা এরে
   যেন মৃতদেহ সাজানো নানা অলঙ্কারে
   খুঁজে, ডোবো আত্মতত্ত্বে, জ্ঞান বলি তারে॥

''কবিতার এই সারার্থ। মালাবারের কোনো এক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা রীতি দেখা যায় যে বাড়িতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে কান্নাকাটি পড়ে যায় আর কেউ মারা গেলে মহা ধূমধাম হয়। সত্যই, নিজের প্রকৃত সত্তা ছেড়ে সংসারে জন্মানোর জন্য শোক করা উচিত আর সেটা উৎসব আনন্দ ক'রে পালন করা ঠিক নয়।'' আমি জিজ্ঞাসা করলাম ''ঈশ্বরস্বামী কী লিখলেন?'' ''ও! সে! আমাকে অবতার ইত্যাদি বলে খুব লিখলে। এটা তার একটা সময় কাটানো ছিল। সে একটা কবিতা লিখত আর আমি একটা, এইরূপে আমরা অনেক কবিতা লিখেছিলাম, কিন্তু সেগুলো রাখার চেষ্টা করিনি। সে সময়ে বেশির ভাগ আমরা দুজনেই ছিলাম তখন খাওয়া দাওয়ার সুবিধা ছিল না কে থাকবে? এখন সব সুবিধা হয়েছে অনেকেই এসেছে আর রয়ে গেছে। কিন্তু তখন কী ছিল? যদি কোন দর্শনার্থী আসত একটুক্ষণ থেকে চলে যেত। এই তো ছিল।''

আমার অনুরোধে জন্মদিনের কবিতাগুলোর একটা তেলুগু অনুবাদ ক'রে তিনি আমায় দিলেন।

* * *

25শে ফেব্রুয়ারি, 1947

(98) আত্মা

আজ সকালে স্বামী ও পুত্রকন্যাসহ একজন গুজরাটি মহিলা বোম্বাই থেকে এলেন। মাঝবয়সি, দেখে মনে হয় বেশ সুরুচিসম্পন্না। স্বামীর পরনে খদ্দর, বোধহয় কংগ্রেসি। আচার ব্যবহার দেখে বিশিষ্ট কেউ হবেন মনে হল। সবাই স্নান সেরে 10টা নাগাদ হলঘরে এলেন ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল তাঁরা কিছু জিজ্ঞাসা করবেন। মিনিট পনেরোর মধ্যে তাঁরা প্রশ্ন আরম্ভ করলেন।

মহিলা– ভগবান! আত্মজ্ঞান কী করে লাভ হয়?

ভগবান– আত্মজ্ঞানের কী প্রয়োজন?

মহিলা– শান্তির জন্য।

ভগবান– ও! সেইজন্য? তবে শান্তি বলে একটা কিছু আছে, তাই না?

মহিলা– হাঁ। আছে।

ভগবান– বেশ তো! আর তুমি জানো যে তোমায় সেটা পেতে হবে। কী করে জানলে? সেটা জানার জন্য নিশ্চয় কখনো না কখনো সেটা অনুভব করেছ। আখ মিষ্টি জানলেই তো সেটা পাওয়ার ইচ্ছা হয়। সেইরকম, তুমি নিশ্চয় শান্তি অনুভব করেছ। কখনো কখনো অনুভব করো। তা না হলে এ আকাঙ্ক্ষা হয় কোথা থেকে? বাস্তবিকপক্ষে প্রত্যেক মানুষই এরূপ শান্তি, কোনো একরকম শান্তির জন্য কামনা করে। অতএব দেখা যাচ্ছে শান্তিই প্রকৃত বস্তু, একমাত্র সত্য, তাকে শান্তি, জীবাত্মা, পরমাত্মা বা আত্মা– যা ইচ্ছা হয় বলো। আমরা সবাই তাই চাই, চাই না?

মহিলা– হাঁ! কী করে লাভ হয়?

ভগবান– যা তোমার আছে সেটা কেবল শান্তি। একজনের যা আগে থেকেই রয়েছে তা চাইলে আমার আর কী বলার আছে? এটা যদি এমন কিছু হয় যে অন্য কোথাও থেকে আনতে হবে তবেই না চেষ্টা করতে হয়। মন তার সমস্ত ক্রিয়া–কৌশল নিয়ে তোমার আর তোমার আত্মার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। তোমাকে যা করতে হবে সেটা হল এটাকে (মনকে) ত্যাগ করা।

মহিলা– সাধনার জন্য কি নির্জনবাস প্রয়োজন? কিংবা কেবল জাগতিক সুখভোগ ত্যাগ করলেই হবে?

ভগবান কেবল প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশটির উত্তর দিলেন, ''ত্যাগ বাইরে নয়, অন্তরে'', বলে নীরব হলেন।

খাবার ঘরের ঘন্টার শব্দ শোনা গেল।

ভগবান মহিলার প্রশ্নের প্রথম অংশের কী আর উত্তর দিতে পারতেন যার এত বড় সংসার? আর সেও শিক্ষিতা ও ভদ্র। ভগবান গৃহস্থদের এরূপই বলেন আর সেটা যুক্তিযুক্তও বটে। যা হোক অন্তরে ত্যাগ বা মনের ত্যাগ কি এতই সোজা? হয়তো পরের প্রশ্ন হত ''আন্তর ত্যাগের অর্থ কী?'' আর খাওয়ার ঘন্টা না হলে তার উত্তরও হত। আমি আমার ঘরে ফিরে এলাম, সেখানে আমি একলাই থাকি। দেখ, ঈশ্বর প্রত্যেকের জন্য তার উপযুক্ত যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে রেখেছেন!

ভগবান কি একবারও আমায় জিজ্ঞাসা করেছেন, ''তুমি একলা থাকো কেন?'' কিংবা অন্য কাউকে সে কথা বলেছেন? কোনোদিন না। যদি জিজ্ঞাসা করো, কেন বলেন নি? তাহলে বলি যে, কারণটা এই যে, এটাই আমার অবস্থার উপযুক্ত, সেজন্যই বলেন নি।

* * *

26শে ফেব্রুয়ারি, 1947

(99) গুরুর স্বরূপ

আজ বিকালে একজন তামিল যুবক ভগবানের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ''স্বামীজি! কাল আপনি গুজরাটি মহিলাকে বললেন যে ত্যাগের অর্থ আন্তর ত্যাগ। সেটা কী করে লাভ করা যায়? আন্তর ত্যাগের অর্থ কী?''

ভগবান– আন্তর ত্যাগের অর্থ সব বাসনার দমন। যদি তুমি জিজ্ঞাসা করো, কী করে হয়? আমার উত্তর হবে 'সাধনা করে'।

প্রশ্ন– সাধনার জন্য গুরু চাই, তাই না?

ভগবান– হাঁ, একজন গুরু চাই।

প্রশ্ন– কে আমার প্রকৃত গুরু কী করে জানব? গুরুর স্বরূপ কী?

ভগবান– যাঁর সঙ্গে নিজের মনের সুরটা মেলে সেই তোমার প্রকৃত গুরু। যদি জিজ্ঞাসা কর গুরু কী করে চিনব আর তাঁর স্বরূপ কী, তিনি শান্ত, ধীর ও ক্ষমাশীল হবেন আর অন্যান্য সদ্‌গুণে পূর্ণ হবেন। তাঁর কেবলমাত্র চোখের দৃষ্টি অন্যকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করবে আর তিনি সবার প্রতি সমদর্শী হবেন–যাঁর এরূপ গুণাবলী আছে, তিনিই সদ্‌গুরু। গুরুর প্রকৃত স্বরূপ জানতে হলে নিজের স্বরূপ আগে জানা দরকার। প্রথমে নিজের স্বরূপ না জানলে, গুরুর প্রকৃত স্বরূপ কী করে জানবে? প্রকৃত গুরুর স্বরূপ দেখতে হলে সমস্ত জগতকে গুরুরূপে দেখা শিখতে হবে। সকল প্রাণীর প্রতি গুরুভাব থাকা উচিত। ঈশ্বর সম্বন্ধেও তাই। সকল বস্তুতে ঈশ্বরের রূপ দেখতে হবে। যে নিজের আত্মাকে জানে না সে কী করে ঈশ্বরের রূপ বা গুরুর রূপ দেখবে? কী করে ঠিক করবে? অতএব আগে নিজের প্রকৃত স্বরূপ জানো।

প্রশ্ন– এটা জানতে গেলেও তো গুরুর প্রয়োজন?

ভগবান– তা সত্য। জগতে অনেক মহাপুরুষ আছেন। যাঁর সঙ্গে মনের মিল হয় তাঁকে গুরু বলে ধরো। যার ওপর তোমার বিশ্বাস সেই তোমার গুরু।

ছেলেটি সন্তুষ্ট হল না। সে জীবিত মহাপুরুষদের লম্বা তালিকা দিয়ে বলতে লাগল, ''এঁর এই দোষ, ওঁর ওই দোষ। এঁদের কী করে গুরু বলা যায়?''

ভগবান নিজের সম্বন্ধে অনেক নিন্দা সহ্য করতে পারেন কিন্তু অন্যের প্রতি একটুও দোষারোপ সহ্য করতে পারেন না। তিনি বেশ অধৈর্য হয়ে বললেন, ''ওহো! তোমাকে নিজের সম্বন্ধে জানতে বলা হয়েছে, তার পরিবর্তে তুমি অন্যদের দোষ ধরতে শুরু করলে। নিজের দোষ সংশোধন করলেই যথেষ্ট হবে। তাঁরা তাঁদের দোষের বিষয় বুঝবেন। মনে

হচ্ছে তোমার কাছ থেকে প্রশংসাপত্র না পেলে তাঁদের মোক্ষ লাভ হবে না। কী দুঃখের কথা! তাঁরা সবাই তোমার প্রশংসাপত্রের জন্য অপেক্ষা করছেন। তুমি একজন মহাপুরুষ। তুমি অনুমোদন না করলে কি তাঁরা আর মোক্ষ লাভ করবেন? এখানে তুমি ওঁদের নিন্দা করছ, অন্যখানে আমাদের নিন্দা করবে। তুমি সবজান্তা আর আমরা কিছুই জানি না। তোমার কাছে আমাদের কৃপা প্রার্থনা করতে হবে। আচ্ছা! তাই করছি, যাও, এবার বলে বেড়াও 'আমি রমণাশ্রমে গিয়েছিলাম, মহর্ষিকে কয়েকটা প্রশ্ন করলাম, সঠিক উত্তর দিতে পারলেন না, উনি কিছু জানেন না'।''

ছেলেটি ওই ধরণের আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ভক্তেরা তাকে থামিয়ে দিল। ভগবান তাই দেখে বললেন, ''ওকে থামাচ্ছ কেন? সবাই চুপ ক'রে থাকো আর ওকে যতক্ষণ ইচ্ছা বলতে দাও। ও বুদ্ধিমান, অতএব আমাদের নীচু হয়ে থাকা উচিত। আমি ওকে আসার সময় থেকে লক্ষ্য করছি। ও বিবেচনা ক'রে সব প্রশ্নগুলো ঠিক ক'রে, বেশ একটা পুঁটলি বানিয়ে প্রথমে কোনায় বসত। তারপর দিনের পর দিন ক্রমশঃ এগিয়ে এসে শেষে সামনে পৌঁছে গিয়ে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করেছে। গতকাল মহিলাটিকে আমায় প্রশ্ন করতে দেখে ঠিক করলে যে তার জ্ঞান দেখাতে হবে আর তাই তার পুঁটলি খুলেছে। ওতে যা আছে সব বাইরে আসতে হবে, হবে কি না? ও সারা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে নিজে গুরুর স্বরূপ ঠিক করবে। মনে হচ্ছে যে, তার গুরু হতে পারে এরূপ উপযুক্ত গুণসম্পন্ন কাউকে সে পায়নি। দত্তাত্রেয় জগদ্‌গুরু, তাই না? আর তিনি বলেছেন যে সমস্ত জগতই আমার গুরু। মন্দ দেখলে মনে হয় মন্দ কাজ করা উচিত নয়। সুতরাং তিনি বলেছেন মন্দও তার গুরু। ভাল দেখলে মনে হয়, এটা করা উচিত সুতরাং সেটা তাঁর গুরু। তিনি বলেছিলেন ভালমন্দ দুই-ই তাঁর গুরু। একবার একজন ব্যাধকে তিনি পথ জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু সে একটি পাখির দিকে লক্ষ্য স্থির করে বাণ ছুঁড়ছিল, প্রশ্ন অগ্রাহ্য করলে। দত্তাত্রেয় তাকে প্রণাম করে বললেন, 'তুমি আমার গুরু। যদিও পাখি মারা ভাল নয়, কিন্তু বাণে এরূপ লক্ষ্য স্থির যে আমার প্রশ্ন শুনতে পাওনি-এটা

উত্তম এতে আমার একটা শিক্ষা হল যে, আমাকেও ঈশ্বরের প্রতি এরূপ দৃঢ় একলক্ষ্য হতে হবে। তুমিও আমার গুরু।' এরূপে তিনি সব কিছুতেই গুরু দেখতেন শেষে তিনি বলেছিলেন যে তাঁর দেহটাও তাঁর গুরু, কারণ এটার চেতনা ঘুমে থাকে না আর দেহও থাকে না অতএব এটার সঙ্গে আত্মাকে মিশিয়ে ফেলা- দেহাত্ম-ভাবনা (শরীরকে আত্মা বলে জানা) উচিত নয়। অতএব দেহটাও তাঁর গুরু হয়েছিল। যেমন তিনি সমস্ত জগৎকে গুরু বলে দেখতেন তেমনি সমগ্র জগৎ তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করে। ঈশ্বর সম্বন্ধেও তাই। যিনি সমস্ত জগৎকে ঈশ্বর বলে দেখেন তাঁকে সমগ্র জগৎ ঈশ্বর বলে পূজা করে - যদ্‌ভাবম্ তদ্ ভবতি (যা ভাববে তাই হবে)। আমরা যা জগৎও তাই। একটা বড় বাগান রয়েছে, একটি কোকিল বাগানে এলে আম খোঁজে, আর কাক খোঁজে নিমফল। মৌমাছি মধুর জন্য ফুল খোঁজে আর মাছি খোঁজে বিষ্ঠা। যে শালগ্রাম খোঁজে সে সব নুড়ি ফেলে সেটি তুলে নেবে। শালগ্রাম এক গাদা নুড়ির সঙ্গে মিশে আছে। মন্দ আছে বলেই ভালকে চেনা যায়। অন্ধকার আছে বলেই আলোর প্রকাশ হয়। মায়া আছে বলেই ঈশ্বর আছেন। যে সার খোঁজে সে শতকের মধ্যে একটা সারবস্তু পেলেও সন্তুষ্ট হয়। সে নিরানব্‌ইটা ফেলে ভালটা নেয়, এই একটা দিয়েই সে জগৎ জয় করবে জেনে খুশি হয়। তার চোখ সব সময়ে সেই একটা ভালর দিকে থাকে,'' ভগবান গম্ভীর গলায় এই বলে নীরবে হলেন।

সমস্ত ঘরটা গাম্ভীর্যপূর্ণ নীরবতায় ভরে গেল। ঘড়িতে চারটের ঘণ্টা বেজে উঠল। যেমন আদি ময়ূর অজ্ঞানরূপী সুরপদ্ম অসুর বিনাশকারী স্কন্দের চরণকমলে স্তুতিবন্দনা করেছিল সেরূপ আশ্রমের ময়ূর উত্তর দিকের দরজা দিয়ে ঢুকে অরুণাচল রমণের বন্দনা ক'রে কেকাধ্বনিতে ঘরটি অনুরণিত ক'রে তার উপস্থিতি জানাল। ভগবান তার ডাকে সাড়া দিয়ে- 'আও, আও' বলে তার দিকে ফিরে চাইলেন।

* * *

12ই মার্চ, 1947

(100) অপচয় নেই

ভগবান সম্প্রতি 'জন্মদিনের কবিতা' ও 'একাত্মপঞ্চকম্' লিখলেন, তাই না? সেগুলো খসখসে, টুকরা টুকরা, কালি চুপসে যায় এমন কাগজে লিখেছিলেন। মুক্তাহারের মতো দিব্য অক্ষরগুলো বাজে কাগজে লেখা দেখে আমার দুঃখ হল, তাই তাকে বললাম, ''একটা খাতায় লিখলে ভাল হত।'' তিনি উত্তর দিলেন, ''এই ঠিক আছে। খাতায় লিখলে আমার হাতের লেখা চিনে হয়ত নিয়ে চলে যাবে। এতে আর কোনো ভয় নেই। স্বামী সবার সম্পত্তি।'' এ বলে কোন পরামর্শ নিতে রাজি হলেন না।

আজ সকালে জন্মদিনের কবিতায় কিছু অদল বদল হল, আমার সেগুলো টুকে খাতায় আঁটবার জন্য কিছু ছোট সাদা কাগজ দরকার ছিল হলঘরে খুঁজে তেমন কিছু পাওয়া গেল না। আবার বাড়ি গিয়ে নিয়ে আসার ধৈর্য ছিল না। সেজন্য ভয় বা সঙ্কোচ না ক'রে ভগবানকে বললাম যে অফিস থেকে কাগজ নিয়ে আসি। সেখানে গেলে, তারা আমায় কিছু ভাল কাগজ দেখালে। আমি নিজের জন্য একটা নিলাম আর বললাম যে ভগবানেরও এতে লিখলে বেশ ভাল হয় তাঁকে কয়েকটা দিলে হয়। তারা ''তবে নিয়ে যাও'' বলে চারখানা কাগজ দিলে। আমি সেগুলো নিয়ে ভগবানের কাছে গিয়ে বললাম যে তাঁর লেখার জন্য এগুলো ব্যবহার করতে পারেন। আর পরে সেগুলো খাতায় এঁটে দেওয়া যাবে। কাগজ তাকে রাখব কিনা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ''কোথা থেকে এল? অফিস থেকে নিয়ে এলে?'' বললাম, ''হাঁ।'' তারপর তিনি বললেন, ''এগুলো আমার কী প্রয়োজন? তোমার দরকার থাকলে, নিজের জন্য রাখো। আমি খবরের কাগজের পাশ ছিঁড়ে বেশ গুছিয়ে রাখব আর তাতেই লিখব। এত ভাল কাগজে আমার কী দরকার?'' আমি এর কোন উত্তর দিতে পারলাম না, কাগজ তাকে রেখে দিলাম।

তখন প্রায় 9টা। চিঠিপত্র দেখা ও তার ব্যবস্থা হয়ে গেছে, ভগবান খবরের কাগজ পড়তে আরম্ভ করলেন। প্রায় চার ইঞ্চির মত একটা সাদা (না লেখা) জায়গা দেখে সেখানটা মুড়ে ধীরে ধীরে ছিঁড়তে লাগলেন। আমার দিকে চেয়ে হাসলেন কেন বুঝলাম না। সেটা ছিঁড়ে, ভাঁজ ক'রে তাকে রেখে বললেন, ''দেখ, আমার লেখার জন্য এই কাগজ ব্যবহার করব। এ ছাড়া আর কাগজ কোথায় পাব? কোথায় খুঁজতে যাব? আমার লেখার জন্য এটাই কি যথেষ্ট নয়?'' আমি উত্তর দিলাম, ''এটা আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য। ভগবান তো শিক্ষা দিয়েই যাচ্ছেন আমরা কিন্তু শিখছি না।'' ভগবান হেসে চুপ করে রইলেন।

অনেক সময়ে যারা ডাকে বই পায় তারা মোড়ক সমেত বই হলঘরে নিয়ে আসে। ভগবান জড়ানো কাগজটা ভাল ক'রে ভাঁজ ক'রে সেবকদের দিয়ে বলেন, ''দেখ, এটা ভাল করে রাখো। আমরা এটা দিয়ে অন্য কোন বই-এর মলাট দেব। দরকার হলে এমন কাগজ আর কোথায় পাব? এরকম পেলে সবটাই লাভ।'' প্রতিদিন ডাকে আসা চিঠিগুলো ভগবানের পর্যবেক্ষণের জন্য আনা হয়। তাদের মধ্যে তোমার মতো কর্মকর্তারা কাগজটা ভাঁজ করে একপৃষ্ঠায় লেখে আর বাকিটা খালি থাকে, ভগবান সেই সাদা টুকরাটা ছিঁড়ে রেখে দেন। আলপিনের বেলায়ও তাই। কাগজ পড়া হলে আলপিন খুলে সেবকদের এই বলে দেওয়া হয় ''এগুলো আমাদের কাজে লাগবে। তা না হলে এগুলো অমনি ফেলা যাবে। আমরা ব্যবহার করব। আমরা নূতন কোথায় পাব? আবার কিনতে হবে। পয়সা কোথায়?''

পাহাড়ে থাকাতে ভগবান নিজে হাতে নারিকেলের মালা থেকে হাতা, চামচ, বাটি ইত্যাদি তৈরি করতেন। এই সেদিন অবধি মালা থেকে চামচ ও বাটি তৈরি ক'রে, হাতির দাঁতের মতো পালিশ ক'রে সেবকদের বলেছেন ''দেখ, এগুলো ভাল করে রাখো। কাজে লাগবে, আমরা সোনারুপার বাসন কোথা থেকে পাব? এরাই আমাদের রুপার বাটি আর সোনার চামচ।

হাত পুড়বে না। ধাতুর বাসনের মতো ছোঁয়াও লাগবে না। এগুলো ব্যবহার করতে খুব সুবিধা।'' কেবল তাই নয়, যখন তিনি কোনো জলখাবার খান বা মালয়ালাম কাঞ্জি পান করেন তখন এগুলোই ব্যবহার করেন।

বাতাবিলেবু, কমলালেবু বা এ জাতীয় কিছু পাওয়া গেলে খোসা ফেলে দেওয়া হয় না, তা দিয়ে চাটনি বা আচার করা হয় কিংবা তাদের ঝোলে বা অন্য কিছুতে দেওয়া হয়। এছাড়া খাওয়ার সময়ে একটু কিছু ফেলা বা নষ্ট করা হয় না। এরূপে তিনি প্রয়োজনীয় একটা জিনিসেরও যে অপচয় করতে নেই তা নিজে ক'রে দেখান।

কেউ যদি গোলাপ ফুল এনে ভগবানকে দেয় তিনি সেগুলো একবার চোখের ওপর ধরে রেখে ঘড়ির ওপর রেখে দেন শুকিয়ে পড়তে থাকলে পাপড়িগুলো কখনো নিজে খান আর ধারে কাছে যারা থাকে তাদের দেন। একবার একজন একটা বড় গোলাপের মালা এনেছিল, সেটা দিয়ে মায়ের মন্দিরের ঠাকুর সাজানো হল আর তারপর অন্য ফুলের সঙ্গে পূজারি ফুল ফেলার ঝুড়িতে ফেলে দিয়েছিল। ভগবান বাইরে যাওয়ার সময়ে তাই দেখে রাগ করলেন সমস্ত পাপড়ি একটি একটি ক'রে সংগ্রহ করে পায়সে মিশিয়ে দেওয়ালেন তাতে পায়স যেমন সুগন্ধি হল তেমনি সুস্বাদুও হল। পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়ার থে যদি কোন শাকপাতা দেখেন, তবে সেবকদের সঙ্গে সেগুলো তুলে, কী করে রান্না করতে হবে ব'লে একটা ভাল ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করেন। দামি শাকসব্জির থেকে যাতে কোন খরচ নেই এরূপ তরিতরকারি তাঁর বেশি পছন্দ। হয়তো এগুলো খুবই সাধারণ মনে হবে, কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে এগুলো আমাদের খুব ভাল শিক্ষা। তার অর্থ তিনি আমাদের খুব কম আয়ে কী করে স্বচ্ছন্দে থাকা যায় তার শিক্ষা দেন।

* * *

22শে মার্চ, 1947

(101) ভ্রম ও মনের শান্তি

গতকাল আন্ধ্র প্রদেশের একজন যুবক এসেছিল। তার মুখ দেখে মনে হল বেশ সরল। আজ সকালে সে ভগবানের কাছে গিয়ে বললে, ''স্বামীজি! আমি দশমাস আগে একবার আপনার দর্শনের জন্য এসেছিলাম। এখন আবার আপনাকে দেখার ইচ্ছা হল তাই তৎক্ষণাৎ চলে এলাম, এক মুহূর্ত দেরি করতে পারলাম না। ভবিষ্যতে এরূপ ইচ্ছা হলে কি আসব?''

ভগবান উত্তর দিলেন, ''যা হওয়ার তাই হয়। আমাদের যা প্রাপ্য তাই ঘটে। তার জন্য আগে থেকে ভেবে কী লাভ?''

সে আবার জিজ্ঞাসা করলে, ''ভবিষ্যতে এরূপ ইচ্ছা হলে কি আসব? কিংবা এই ইচ্ছা দমন করব?''

''তুমি যদি ভবিষ্যতে কী হবে না চিন্তা করে থাকতে পারো তবে যা হওয়ার তা ঠিক হয়ে যাবে'', ভগবান উত্তর দিলেন।

প্রশ্ন– ''আমি এই ইচ্ছাকে এক মুহূর্তের জন্য দমন করতে পারি না। এটা কি আত্মপ্রবঞ্চনা?''

ভগবান হেসে আমার দিকে চেয়ে বললেন, ''মনে হচ্ছে এ আগে একবার এসেছে আবার এখানে আসার ইচ্ছা হয়েছে তাই তৎক্ষণাৎ এসেছে। এ জিজ্ঞাসা করছে যে ভবিষ্যতে এরূপ ইচ্ছা হলে ও আসবে কি না।''

ছেলেটি বাধা দিয়ে বললে, ''যখনই ভগবানকে দেখতে ইচ্ছা হয়, আমি এক মুহূর্তের জন্য সেটা দমন করতে পারি না। এটা মনের ভুল কি না তাই জিজ্ঞাসা করছি।''

আমি বললাম, ''একজন মহাপুরুষকে দর্শনের ইচ্ছা কী করে মনের ভুল হ'তে পারে? মনের অনেক ভুল আছে যাদের সংযম ও দমন করতে

হবে, এ ইচ্ছা কি মনের ভুল বলে মনে হয়?'' এরপর আর কোন প্রশ্ন হল না।

হলঘরে আরও কয়েকজন আন্ধ্র দর্শনার্থী ছিল, তারা তীর্থ করতে এসেছে। একজন উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ''স্বামীজি! আত্মা কী করে শান্তি লাভ করবে?'' ভগবান হেসে উত্তর দিলেন, ''কী! আত্মার শান্তি, সেটা আবার কী?'' ''না, না, আমি বলতে চাই মনের।'' ''ও, মনের! বাসনার দমন হলেই মনের শান্তি হয়। তার জন্য সে কে অনুসন্ধান আর উপলব্ধি করতে হবে। প্রথমে শান্তি কী অনুসন্ধান না করে কেবল মুখে 'আমি শান্তি চাই' 'আমি শান্তি চাই' বললে কী করে শান্তিলাভ হবে? প্রথমে যা আগে থেকেই রয়েছে তাকে চেনা ও বোঝার চেষ্টা করো।

তাদের মধ্যে একজন পণ্ডিত ছিল। সে জিজ্ঞাসা করলে, ''কোনো কোনো স্থানে জীবন অসহ্য হয়ে যায়। সেখানে কী করে সাধনা হবে?''

ভগবান বললেন, ''জায়গাটা তোমার ভিতরে তুমি জায়গায় নও। যখন তুমি সর্বস্থানে তখন কোনো একটা স্থান সুবিধাজনক আর অন্যটা নয়, এ প্রশ্ন হয় কী করে?'' সবই তোমার অন্তরে। তারা তোমার অসুবিধা করে কী ক'রে?'' সে প্রতিবাদ করলে, ''কিন্তু কোনো স্থানে মনের শান্তি একেবারে থাকে না।'' ভগবান বললেন, ''যা সব সময়ে থাকে তাই শান্তি। এটাই স্বরূপ। তুমি তোমার স্বরূপ ধরতে পারছ না। তুমি আপন স্থানচ্যুত হয়ে ভ্রমে পড়েছ আর শান্তি নেই বলে দুঃখ পাচ্ছ। যদি নিজের আত্মাকে উপলব্ধি করো তবে সব স্থানই সাধনার উপযুক্ত মনে হবে।''

* * *

3রা এপ্রিল, 1947

(102) মা অলগম্মা

একদিন শ্রীভগবানের কাছে পুরাতন গীতের কথা হচ্ছিল। ভগবান বললেন, ''মা দক্ষিণামূর্তি স্তোত্র ও অন্যান্য বেদান্ত বিষয়ক গান করতেন।

গীতগুলো তাৎপর্যময় ছিল। আজকাল আর কেউ এ সব বিষয়ে চিন্তা করে না, কিন্তু ওগুলো সংগ্রহ ক'রে ছাপালে ভাল হত।''

এ কথা শুনে আমার পুরাতন তেলুগু আধ্যাত্মিক গানের কথা মনে পড়ে গেল। ভাবলাম সেগুলো যদি সংগ্রহ ক'রে ছাপানো হয় তবে মেয়েদের আধ্যাত্মিক উন্নতির উপযোগী হয়, এ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখলাম। তাতে আমি 'পাঁপড়ের গীতে'র কথা উল্লেখ করে ছিলাম। সেটা ভগবানের মা অলগম্মাকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে বেশ প্রাধান্য পেয়েছে, আর সব গীতের মধ্যে একে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। ভগবানকে, এই প্রবন্ধটা তেলুগু 'গৃহলক্ষ্মী' পত্রিকাতে পাঠাতে চাই বললে, তিনি আমাকে সেটা পড়ে শোনাতে বললেন। শুনে ভগবান বললেন, ''এর পিছনে একটা বড় গল্প আছে'' আর আমার অনুরোধে সেটা দয়া ক'রে আমাদের বললেন।

''প্রথম দিকে মা যখন বিরূপাক্ষ গুহায় আমার কাছে থাকতে এলেন, তখন কোনো রান্না হত না। এচম্মা বা অন্য কেউ কিছু খাবার আনলে, তিনি তাই খেতেন ও বাসন ধুয়ে শুয়ে পড়তেন। এইরকম ছিল। একদিন কী মনে হল ভাবলেন যে আমার ভাল কিছু খাওয়া হচ্ছে না আর আমি পাঁপড় খেতে ভালবাসতাম বলে, তিনি কিছু পাঁপড় তৈরি করলে ভাল হয়, ঠিক করলেন। অনেক দিনের অভ্যাস, তাই না করে থাকতে পারলেন না। আমার অজ্ঞাতে মুদালিয়ার বৃদ্ধা, এচম্মা আরও অন্যদের সব জিনিস জোগাড় করতে বললেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা গ্রামে যাচ্ছি বলে বেরিয়ে পড়লেন। কোথায় যান দেখার জন্য, বেরিয়ে যাওয়ার পর বাইরে গাছের তলায় আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি ভেবেছিলেন যে আমি কিছু জানি না। কয়েকটা বাড়ি গিয়ে, সব জিনিসপত্র জোগাড় ক'রে একটা বড় হাঁড়িতে সব নিয়ে, তিনি ফিরলেন। আমি চোখ বন্ধ ক'রে বসে রইলাম যেন কিছুই জানি না। দর্শনার্থীরা না যাওয়া অবধি সেগুলো সযত্নে গুহার ভিতর রাখলেন। রাত্রি হলে, যা খাই খেয়ে ঘুমের ভান ক'রে শুয়ে পড়লাম। তখন তিনি ধীরে ধীরে চাকি, বেলন, ময়দা, বেসমের তাল বার ক'রে পাঁপড়

তৈরি করতে বসলেন। প্রায় দু'তিনশ' পাঁপড় হবে। একলা হাতে করা শক্ত। আমি বেলতে পারতাম। তাই মৃদুস্বরে বলতে আরম্ভ করলেন, ''বাবা, আমায় একটু সাহায্য কর না।' যার জন্য অপেক্ষা করছিলাম সেই সুযোগ পেয়ে গেলাম। একবার যদি দয়া ক'রে সাহায্য করি তিনি আবার অন্য কিছু শুরু করবেন। যথা সময়ে সেটা বন্ধ করতে চেয়েছিলাম। আমি বললাম, 'তুমি সন্ন্যাস নিয়ে এখানে এসেছ, তাই না? তবে এ সব কী? যা পাওয়া যায় তাতে সন্তুষ্ট থাকো। আমি সাহায্য করব না। তৈরি করলেও খাব না। নিজে তৈরি করে নিজেই খেয়ো।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলতে শুরু করলেন, 'ও বাবা! একটু সাহায্য কর না।' আমি আমার জেদ ধরে রইলাম। তিনি ডেকেই যেতে লাগলেন। দেখলাম তর্ক করে কিছু হবে না, শেষে বললাম, 'বেশ তুমি তোমার পাঁপড় তৈরি করো আমিও আর এক রকম পাঁপড় তৈরি করি' এই বলে পাঁপড়ের গীতটা গাইতে লাগলাম। তিনি ভাতের গীত, ঝোলের গীত ইত্যাদি অনেক বেদান্তমূলক গীত গাইতেন। পাঁপড় সম্বন্ধে তাঁর একটাও জানা ছিল না। ভাবলাম একটা লিখে ফেলি! মা গান শুনতে খুব ভালবাসতেন। তিনিও ভাবলেন যে আরও একটা গান শেখা হল। পাঁপড় তৈরি শেষ হল আর আমার গান লেখাও শেষ হল। তাঁকে বললাম, 'আমি আমার তৈরি পাঁপড় (গীত) খাব আর তুমি যা তৈরি করেছ সেটা খেয়ো।' এটা বোধহয় 1914 কি 15 সালের ঘটনা।''

''কী বড় গল্প! আমি প্রবন্ধে এটা সংক্ষেপে লিখেছি। ওটা চলবে না'', বললাম। ''প্রবন্ধে এত কী দরকার?'' ভগবান বললেন। তখন বললাম যে এসব আমি চিঠিতে (দাদার কাছে) লিখব, ভগবান সম্মতি দিলেন। ভগবানের আরও কিছু ঘটনা মনে পড়ে গেল, বললেন, ''পাঁপড়ের গীত লেখার কিছুদিন পরে, একদিন আমরা গিরিপ্রদক্ষিণে গিয়েছি। একজন বললে, ''স্বামীজি! পাঁপড়ের গীতের অর্থটা আমাদের দয়া করে বলুন।' আমিও ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করলাম মনে কর 'তনুগণি পঞ্চকোষ ক্ষেত্রমুন্নাডু' (পঞ্চভূতাত্মক দেহ) কথাটা। 'পঞ্চকোষ ক্ষেত্র' শব্দের অনেক প্রামাণিক গ্রন্থ আছে যেমন ভগবদগীতা ও আরও অন্যান্য

বেদান্তের বই। সব উল্লেখ করলাম। অনুরূপভাবে প্রত্যেক শব্দের অনেক প্রামাণিক বিবৃতি আছে। এই সব উদ্ধৃত ক'রে অর্থ ও ব্যাখ্যা করলাম। তারপর প্রদক্ষিণ শেষ ক'রে বিরূপাক্ষ গুহায় ফিরে এসে বসলাম। তখনও ব্যাখ্যা করে যাচ্ছি। সমস্ত বেদান্তের সার সংগ্রহ এই একটা গীতেই আছে। যদি ঠিকমতো ব্যাখ্যা করা যায়, একটা মস্ত বড় বই হয়ে যাবে।''

আমি বললাম, ''ভগবান যখন ব্যাখ্যা করেছিলেন তখন কেউ যদি লিখত তাহলে ভাল হত। ভগবানের মতো আর কে ব্যাখ্যা করবে! এখনও তো কেউ লিখতে পারে?''

ভগবান হেসে বললেন, ''বেশ তো!'' সব কথা শোনার র আমি বললাম, ''প্রবন্ধটা ঠিক হয়নি, 'গৃহলক্ষ্মী'তে পাঠাব না।'' ভগবান ''তোমার যা ইচ্ছা'' বলে আবার বলতে লাগলেন, ''যদিও আমি আপত্তি করে যাচ্ছি, মা কিন্তু ধীরে ধীরে রান্না শুরু করলেন, প্রথমে একটা তরকারি, একদিন ঝোল, এই রকম। পরে আমরা স্কন্দাশ্রমে গেলাম। মা সমস্ত পাহাড় ঘুরে 'ও এই শাকটা আর এই ফলটা খেতে ভালবাসে' বলে এটা ওটা তুলে বেড়াতেন। আমার প্রতিবাদ গ্রাহ্যই করতেন না। একবার পাহাড়ের এই দিকের জঙ্গলে আসতে গিয়ে তাঁর কাপড় কাঁটা গাছে জড়িয়ে যায়। তারপর এদিকের রাস্তার ঝোপঝাড় পরিষ্কার করা হয়। মা বলতেন যে আমায় ছেড়ে কোথাও যাবেন না। যদি কোথাও যেতেন, পাছে সেখানে গিয়ে মারা যান বলে ভয় পেতেন। তাঁর কামনা ছিল যে তিনি আমার কোলে দেহত্যাগ করবেন। আলামেলু (ভগবানের ছোট বোন) যখন মানা মাদুরাই-এর কাছে গ্রামে নূতন বাড়ি করলে, সে মাকে একটি বার গিয়ে বাড়িটা দেখতে কত অনুরোধ করলে! সে বলেছিল, 'মা যদি একবার সেখানে পদধূলি দেন'। মা কিন্তু কিছুতেই গেলেন না। তাঁর আপত্তির কারণ তাঁর ভয়, পাছে সেখানে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন আর সে সময়ে যদি এখানে আসার কোন ট্রেন না থাকে তবে তাঁর আর ছেলের কোলে মরা হবে না। তিনি বলতেন, 'যদি আমার মৃতদেহটা কাঁটা ঝোপেও

ফেলে দাও তাতে কিছু ক্ষতি নেই, কিন্তু আমি প্রাণটা তোমার কোলেই ত্যাগ করব।'' বলতে বলতে আবেগে তাঁর গলা ধরে এল। আমার চোখে জল এসে গেল। আমি বললাম, ''প্রত্যেকের বৈরাগ্য এরূপ দৃঢ় হওয়া উচিত।'' ''ঠিক কথা!'' বলে তিনি নীরব হলেন। ''আমার দেহটা কাঁটা ঝোপে ফেলে দিলেও'' বলেছিলেন বলেই না আজ তাঁর সমাধির ওপর রাজারাজড়াদের পূজা করার উপযুক্ত মন্দিরের শোভা দেখা যাচ্ছে।

* * *

4ঠা এপ্রিল, 1947

(103) পুরুষকার

একজন নিয়মিত ভক্ত দু'তিন দিন আগে এসেছে। আসা অবধি সে হলের চারিদিকে বার বার দেখছে। আমি আশা করেছিলাম যে, সে ভগবানকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে। আজ বিকালে ভগবানের কাছে বসে সে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করতে শুরু করলে, ''স্বামীজি! সবাই এখানে চোখ বন্ধ ক'রে বসে আছে। তারা কি সবাই ফল পায়?'' ভগবান পরিহাসের সুরে বললেন, ''নিশ্চয়ই। যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ।''

প্রশ্ন– 'বাশিষ্ঠে'ও তাই বলে। এক জায়গায় বলে পুরুষকারই সকল শক্তির মূল আর এক জায়গায় বলে সবই দৈবকৃপা। কোন্‌টা ঠিক বোঝা যায় না।

ভগবান– হাঁ, তারা বলে পূর্বজন্মার্জিত কর্ম ছাড়া কোন ঈশ্বর নেই, শাস্ত্রসম্মত ইহজন্মের কর্মই পুরুষকার আর এই দুই কর্ম যেন দু'টি অজার (ছাগলের) মতো মাথায় মাথায় লড়ে যায়, তার মধ্যে যেটি দুর্বল সেটি হেরে যায়। সেজন্য তারা বলে পুরুষকার বাড়াও। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে কর্মের আরম্ভ কোথায়, তারা বলে এ প্রশ্ন তোলা ঠিক নয় কারণ এটা সেই বীজাঙ্কুরের ন্যায় (বীজ আগে না গাছ আগে) 'অতি প্রশ্ন'। এরূপ প্রশ্ন কেবল বাদানুবাদ করার জন্য, এ থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

সেজন্য আমি বলি, প্রথমে খোঁজো তুমি কে? যদি একজন জিজ্ঞাসা করে 'আমি কে?' ও 'কী করে আমি সংসাররূপ দোষ পেলাম?'' তাহলে আত্মোপলব্ধি হবে। দোষ চলে যাবে শান্তি আসবে। আসবেই বা কেন? এটা (আত্মা) যা আছে তাই থাকে।''

'যোগবাশিষ্ঠে' মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণে চতুর্দশ সর্গে এই ভাবের শ্লোক আছে–

কোহহং কথময়ং দোষঃ সংসারাখ্য উপাগতঃ।
ন্যায়েনেতি পরামর্শো বিচার ইতি কথ্যতে॥59
বিচারাৎ জ্ঞায়তে তত্ত্বং তত্ত্বাদ্বিশ্রান্তিরাত্মনি
অতো মনসি শান্তত্বং সর্বদুঃখপরিক্ষয়ঃ॥ 53

''আমি কে? কোথা হতে সংসাররূপ দোষ উৎপন্ন হয়েছে?' ন্যায় অনুসারে এরূপ অনুসন্ধান করার নাম বিচার।

''বিচার থেকে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তত্ত্বজ্ঞান থেকে আত্মবিশ্রান্তির আবির্ভাব হয় আর আত্মবিশ্রান্তি হতে সর্বদুঃখক্ষয়রূপ পরম শান্তি লাভ হয়।''

* * *

5ই এপ্রিল, 1947

(104) মঠের মহান্তগিরি

গতকাল যে ভক্ত ব্যক্তিগত কর্মে পুরুষকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিল, সে আজ ভগবানকে তার শারীরিক অসুস্থতা, ডাক্তারদের চিকিৎসা ও লোকজনের সেবার বিষয়ে বললে, ''স্বামীজি! আমরা আমাদের শরীরটা ঠিক রাখতে পারিনা তাই ডাক্তারদের ও লোকজনের ওপর ছেড়ে দিতে হয়। শরীরটাই যখন আমাদের হাতে নয় তখন আর সমাজ–সংস্কারের কথা বলে কী লাভ?''

তুমি কি জানো যে, গত পাঁচ ছয়মাস যাবৎ ভগবান কাউকে তাঁর পা ছুঁতে বা তেল মালিশ করতে দেন না, দরকার হলে নিজেই করেন? সেজন্য তখন তিনি ভক্তটির প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় সব ভক্তরা একত্র হলে, তিনি তেল দিয়ে নিজের পা মালিশ করতে লাগলেন আর প্রশ্নকারীর দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললেন, ''আমরাই আমাদের ডাক্তার আর আমাদের সেবক।'' সে আবার বললে, ''ভগবানের মতো নিজের কাজ করার শক্তি না থাকলে কী করা যাবে?'' ভগবানের উত্তর হল, ''আমাদের যদি খাওয়ার শক্তি থাকে তবে আর এটা করার শক্তি থাকবে না কেন? লোকটি আর কোন উত্তর দিতে না পেরে চুপ করে মাথা হেঁট করে রইল। সেই সময় চিঠির উত্তরগুলো আনা হল। চিঠিগুলো দেখতে দেখতে ভগবান বলতে লাগলেন–

''একবার এক সন্ন্যাসীর মঠাধিপতি হওয়ার ইচ্ছা হল। তার কিন্তু কোন শিষ্য ছিল না। শিষ্য জোটাতে অনেক চেষ্টা করলে। যারাই আসত, লোকটি বিশেষ কিছু জানে না দেখে চলে যেত। কেউ থাকল না। সে আর কী করবে? একদিন তাকে অন্য শহরে যেতে হবে। নিজের মান রাখতে হবে অথচ কোন শিষ্য নেই। আবার কাউকে একথা বলাও চলবে না। মাথায় পুঁটলি নিয়ে সে চলল। সে ভাবলে কাউকে না দেখিয়ে পুঁটলিটা কারও বাড়ি রেখে তারপর সে যেন এল, এরকম ভান করবে। চারিদিকে ঘুরে বেড়ালে, যেখানেই রখতে যায় কেউ না কেউ বাড়ির সামনে রয়েছে। বেচারা! কী আর করে? প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল। সেও ক্লান্ত। যাক, শেষে একটা বাড়ি পেল যেখানে বাড়ির সামনে কেউ নেই। দরজাটাও খোলা সেও বেঁচে গেল পুঁটলিটা বাড়ির এক কোণায় রেখে বারান্ডায় বসলে। একটু পরে বাড়ির গৃহিণী বাইরে এসে তাকে দেখে সব বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলে। 'আমি! আমি অমুক মঠের মহান্ত। একটা কাজে এখানে এসেছি। শুনলাম তোমরা সদ্‌গৃহস্থ তাই আমার শিষ্যকে দিয়ে আমার জিনিসপত্র তোমাদের এখানে পাঠিয়ে দিয়েছি, ভাবছি একরাত্রি এখানে থেকে আমরা কাল সকালে চলে যাব। সে কি জিনিস রেখে গেছে?' মহিলা বললে, 'কই!

কেউ তো আসেনি, বাবা'। সে বললে, 'না, তা নয় আমি তাকে জিনিস রেখে বাজারে গিয়ে কিছু আনতে বলেছি। দেখতো, কোনো কোনে পুঁটলি রেখে গেছে কি না?' তারপর মহিলা চারিদিক খুঁজে পুঁটলিটা দেখতে পেল। এরপর গৃহকর্ত্রী ও তার স্বামী তাকে বাড়ির ভিতর ডেকে নিয়ে গেল, খেতে দিলে ও শোবার জন্য ঘরও দিলে। বেশ রাত্রি হলে তারা জিজ্ঞাসা করলে, 'এ কী রকম হল, বাবা, আপনার শিষ্য তো এখনও ফিরল না?' সে বলল, 'কে জানে, হতভাগা হয়ত বাজারে কিছু খেয়ে এদিক-ওদিক ঘুরছে। তোমরা শুয়ে পড়ো। সে এলে, আমি তাকে দরজা খুলে দেব।'

''ইতিমধ্যে তার সন্ন্যাসীর আসল অবস্থা বুঝে গেছে। তারা দেখা যাক আর কী রগড় হয় ভেবে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর লোকটির ভণ্ডামি আরম্ভ হল। সে বেশ শব্দ করে দরজা খুললে আর বন্ধ করলে যাতে বাড়ির সবাই বুঝতে পারে। তারপর জোরে বলতে লাগল 'কী! ব্যাপার কী? এতক্ষণ কী করছিলি? সাবধান, আর যদি এরকম করিস তাহলে মার খাবি। এরপর থেকে সাবধান, বুঝেছিস।' তারপর গলা নামিয়ে যেন কাকুতি মিনতি করছে এরূপ ভান করে বললে, ''স্বামী! স্বামী! ক্ষমা করুন, আর এরকম হবে না।' আবার নিজের গলায় 'আচ্ছা বেশ, এদিকে আয়, আমার পাটা এখানে টিপে দে, না, ওখানে মুঠো দিয়ে আস্তে করে মেরে মেরে টেপ। হাঁ, আর একটু জোরে', এই বলে সে নিজেই নিজের পা মালিশ করতে লাগল আর তারপর বললে, 'হয়েছে অনেক রাত হয়েছে, যা শুতে যা'। এই বলে ঘুমাতে গেল। ঘরে একটা ফুটো ছিল তাই দিয়ে কর্তা-গিন্নি সব মজাটা দেখলে। সকালে উঠে আবার গত রাত্রির অভিনয় আরম্ভ করে বললে, 'কুড়ের বাদশা, মুরগি ডাকছে, ওঠ্, ওঠ্। এই, এই লোকের বাড়ি যাবি আর এই কাজগুলো করবি।' এই বলে দরজা খুলে তাকে বার করে দেওয়ার ভান করে শুয়ে পড়ল। তারা এটাও দেখলে। সকালে উঠে জিনিসপত্র পুঁটলি করে এক কোণে রেখে সে নিকটের এক পুকুরে স্নান ইত্যাদি করতে গেল। বাড়ির লোকেরা পুঁটলি নিয়ে অন্য জায়গায় লুকিয়ে রাখলে। সন্ন্যাসী ফিরে এসে সব ঘর খুঁজলে কিন্তু পুঁটলি

দেখতে পেল না। তখন বাড়ির গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করলে, 'আমার পুঁটলি কোথায় গেল?' তারা বললে, 'কেন বাবা, আপনি তাকে ওটা নিয়ে যেতে বলেছেন, আপনার শিষ্য এসে ওটা নিয়ে গেল। কাল রাত্রে যে আপনার পা টিপছিল সেই লোকটি। এইখানেই কোথাও আছে। আপনি একটু খুঁজে দেখুন।' সে আর কী করবে, চুপ করে রইল তারপর বাড়ির দিকে রওনা দিলে।''

* * *

6ই এপ্রিল, 1947

(105) আহার, বিহার ও নিদ্রা সংযম

গতকাল একজন ভক্ত ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলে, ''স্বামীজি! আত্মার অনুসন্ধানের জন্য ধ্যান করতে হবে। ধ্যান করতে বসলেই ঘুম পেয়ে যায়। কী করব? কিছু উপায় কি আছে?'' ভগবান উত্তর দিলেন, ''আগে জাগ্রত অবস্থায় ভাল করে জাগতে শেখো। তারপর আমরা ঘুমের কথা ভাবব। আমরা জেগেও অনেক স্বপ্ন দেখি, আমাদের জাগ্রত অবস্থায় এগুলো থেকে সাবধান হতে হবে। চারিদিকে যা কিছু দেখছি সবই স্বপ্ন। এই স্বপ্নময় জগৎ থেকে জেগে উঠতে হবে।''

প্রশ্নকারী বললে, ''এই সতর্কতা লাভ করার জন্যই তো সাধনা। যখন কোন প্রণালী ধরে সাধনা করতে যাই, ঝিমুনি আসে। ভগবান কৃপা করে বলুন কী করে এটা দমন করা যায়?''

ভগবান উত্তর দিলেন, ''সব আবরণ-বিক্ষেপের মধ্যে প্রথম আবরণ ঘুম। আমাদের প্রথমে চেষ্টা করতে হবে যাতে ঘুম না আসে। কেন ঘুম পায় খুঁজে দেখতে হবে। খাওয়া, ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদি সংযত করতে হবে। যাতে ঘুম না পায়, সে চেষ্টা করতে হবে কিন্তু একবার ঘুম পেয়ে গেলে তাকে রোধ করবার চেষ্টা করে লাভ নেই। ভরপেট খেলে ঘুম পায়, তাই না? তখন ধ্যানে বসলে মাথা ঢুলতে থাকে। অনেকের মনে হয় তাদের

চুলের টিকি (শিখা) দেওয়ালের পেরেকের সঙ্গে বেঁধে জেগে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে ঘুমে মাথা ঝুঁকে গেলে জেগে ওঠা ছাড়া ধ্যানের আর কী লাভ হয়? আমার ছেলেবেলার ঘুমের কথা সবার জানা আছে। যখন লেখাপড়া করতাম পাছে ঘুমিয়ে পড়ি সেজন্য দেওয়ালের পেরেকের সঙ্গে সূতা বেঁধে চুলের সঙ্গে বেঁধে রাখতাম, মাথা ঝুঁকে গেলেই সূতায় টান পড়ত আর আমায় জাগিয়ে দিত। তা না হলে মাস্টার মহাশয় কান মলে জাগিয়ে দিতেন,'' এই বলে ভগবান হাসতে লাগলেন।

মুরুগনার জিজ্ঞাসা করলে, ''ভগবান কি বানিয়ে গল্প বলছেন?''

ভগবান বললেন, ''না, না! সব সত্য। আমি এই সব করতাম কারণ মাস্টার মহাশয়ের পড়া না শুনলে শাস্তির ভয় ছিল। তখন সেই রকম ছিল। এখানে যখন প্রথম এলাম, চোখ বন্ধ ক'রে গভীর ধ্যানে থাকতাম, রাত কি দিন প্রায় বুঝতে পারতাম না। কখনো চোখ খুললে ভাবতাম এটা দিন না রাত্রি। কোনো খাওয়া ছিল না, ঘুমও ছিল না। শরীরের চলা ফেরার জন্যই খাওয়ার দরকার। খেলেই ঘুমের দরকার হয়। যদি ঘোরাফেরা না থাকে, ঘুমেরও কোন দরকার হয় না। খুব সামান্য খেলেই শরীর থাকে। আমার তো এই অভিজ্ঞতা। চোখ খুললে কেউ না কেউ এক গেলাস কিছু খেতে দিত। ব্যস্। কিন্তু একটা কথা, নির্বিকল্প সমাধি না হলে খাওয়া ও ঘুম একেবারে ছাড়া যায় না। শরীর যখন সাধারণ কাজ করে তখন খাওয়া ও ঘুম ছেড়ে দিলে মাথা ঘোরে। অতএব আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য খাওয়া, চলাফেরা সংযত করা একান্ত দরকার। মহাত্মারা যতটুকু না হলে নয় ততটুকু ঘুমিয়ে, ঘুম কমিয়ে ফেলেন তাতে নিঃস্বার্থভাবে সৎকাজ করার সময় পান। কেউ বলে রাত্রি 10টায় শোওয়া আর 2টায় ওঠা স্বাস্থ্যকর। তার অর্থ চার ঘন্টা ঘুমই যথেষ্ট। অন্যেরা বলে চার ঘন্টা নয়, ছ'ঘন্টা হওয়া উচিত। ঘুম ও খাওয়া বেশি না হলেই হল। যদি এগুলো একেবারে ছাড়তে চাও তাহলে কেবল সেই চিন্তাই হবে। অতএব সাধকদের সবই সংযতভাবে করা উচিত।''

ভগবদগীতায় বলা হয়েছে–

নাত্যশ্নতস্তু যোগোহস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন॥ 616
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ 617

''হে অর্জুন! অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণে কিংবা অনাহারে যোগ সিদ্ধ হয় না, অতি নিদ্রা কিংবা অধিক জাগরণেও হয় না।

''যার আহার–বিহার (আনন্দ উপভোগ), কর্মচেষ্টা নিয়ন্ত্রিত, যার নিদ্রা–জাগরণ নিয়মিত তারই দুঃখনাশক যোগ লাভ হয়।''

* * *

7ই এপ্রিল, 1947

(106) নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ঠা

গতকাল ভগবান আহার, বিহার ও নিদ্রা সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তোমায় লিখেছি। তিনি নিজের করা বাস্তব উদাহরণ দিয়ে অনেকভাবে শিক্ষা দেন। দুধ পান করেন না আর আজকাল সকালে মাত্র একটি ইড্‌লি (দক্ষিণ ভারতীয় আস্‌কে পিঠার মত খাদ্যদ্রব্য) খান, বলেন একজন যে শারীরিক পরিশ্রম না ক'রে বসে থাকে তার দুটো ইড্‌লি খাওয়ার দরকার নেই। মধ্যাহ্ন ভোজনও তাই। তরকারি ইত্যাদি সব খাদ্য নিয়ে বোধহয় এক মুঠো হবে সেটাও আবার আমরা যেমন প্রত্যেক ব্যঞ্জন আলাদা খাই তাও না। তিনি তরকারি, ঝোল, চাটনি সব মিশিয়ে একটা তাল করে তাই ভাতের সঙ্গে মেখে খান। একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, ''এতগুলো পদের থেকে একটা পদ দিয়ে ভাত খেলে বেশি সুস্বাদু হয়। এত রকম ব্যঞ্জনের কী দরকার? আগে আমরা একটাই তরকারি খেতাম। সে অভ্যাস এখনও ছাড়ি নি। যখন পাহাড়ে ছিলাম অনেকে ভাত, ফল, মিষ্টি আনত।

তারা যাই আনুক, তিনটি আঙ্গুল দিয়ে যতটা ওঠে ততটুকু খেতাম। যা কিছু আনা হোক তার থেকে একটু তুলে নিতাম তাতে সমস্ত দিনের খাওয়া এক মুঠোর বেশি হত না, এইভাবে খাওয়াতে খুব আনন্দ হত। আজকাল একটা পাতা পেতে দেয় আর অনেক কিছু পরিবেশন করে। আমি নষ্ট করতে পারি না, সবটা খেতে হয়, পরে পেট ভার হয়।''

ঘুমের সম্বন্ধেও তাই। বিশেষ উৎসবের সময়ে যেমন জয়ন্তী (জন্মদিন) ও মহাপূজার দিন বিদ্যার্থীরা আগের দিন রাত্রে পরিশ্রমের জন্য ব্রাহ্মমুহূর্তে (সূর্যোদয়ের 2 ঘন্টা আগে) বেদপারায়ণ করতে পারে না ভগবান কিন্তু ঠিক সময়ে উঠে প্রস্তুত হয়ে বসে থাকেন। তাঁর শরীর খারাপ হলে, সেবকেরা তাঁকে আরও একটু শুয়ে থাকতে অনুরোধ করলে তিনি বলেন, ''ব্রাহ্মমুহূর্তে শুয়ে থাকার কী অর্থ? তোমাদের ইচ্ছা হলে শুতে পারো।''

ধনুর্মাসে (ডিসেম্বর-জানুয়ারি) অরুণাচলেশ্বর মন্দিরে ভোরবেলা পূজা হয়। এখানেও ভগবান সেই সময়ে উঠে পড়েন। যারা তামিল পারায়ণ করে তাদের হয়ত উঠে, এখানে আসতে দেরি হয় কিন্তু তিনি সর্বদা তাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকেন। স্বভাবতঃ তাঁর চলাফেরা সীমাবদ্ধ। বলা হয় যে, এরূপ সংযম কেবল সাধকদের জন্য, জ্ঞানীর জন্য নয়। কিন্তু জ্ঞানীরাও কেবল জনকল্যাণের জন্য এসব নিয়ম পালন করেন। পূর্ণ অনাসক্তির উচ্চ শিখর হতে তাঁদের কখনই পতন হয় না। যা প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ নয়, সেই সব নীতির প্রতি আনুগত্য, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ইত্যাদি তাঁদের স্বাভাবিক ভাবেই হয়। তাঁদের প্রত্যেক কাজ আমাদের শিক্ষার জন্য।

* * *

৪ই এপ্রিল, 1947

(107) আশীর্বাদ

সম্প্রতি বড়দার ছেলেরা শাস্ত্রী ও মূর্তি ভগবানকে একটা চিঠি লিখেছে, ''চিরঞ্জীবী ভগবান দাদুকে নমস্কার। আপনি কী কোন মন্ত্র জানেন যাতে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়? যদি জানেন তাহলে আমাদের এখুনি লিখে পাঠাবেন। আপনার নাতি শাস্ত্রী ও মূর্তি।''

যখন বললাম, '''চিরঞ্জীবী দাদু' এ আবার কী? বোকা'' (চিরঞ্জীবীর অর্থ দীর্ঘজীবী আর এটা বড়রাই ছোটদের লেখে), তখন সুন্দরেশ আইয়ার মন্তব্য করলে, ''ওরা ঠিকই লিখেছে। ভগবান ছাড়া আর কে চিরঞ্জীবী হবে? যে দাদু চিরকাল আছেন ওরা তাঁকেই নমস্কার জানিয়েছে। তাদের ইচ্ছা যে, তিনি যেন আশীর্বাদ করেন যাতে ওরা যা চাইবে তাই পায়। ভুল আর কী হয়েছে?'' ভগবান হেসে বললেন, ''আমিও ছোটবেলায় একবার আমার জ্ঞাতি মামার ছেলে ও ভগ্নিপতি রামস্বামীকে এই রকম চিঠি লিখেছিলাম। যখন ডিন্ডিগুলে পড়তাম তখন কিছুদিন তাদের কাছে ছিলাম। ছুটিতে তিরুচুড়ী এলাম। ভাবলাম রামস্বামীকে একটা চিঠি লিখি, কী করে যে সম্বোধন করতে হয় জানি না। তাকে লেখা বাবার চিঠিতে দেখেছি যে, 'রামস্বামীকে আশীর্বাদ জানিয়ে' লেখা থাকত। আমিও তাই 'জামাইবাবুকে আশীর্বাদ জানিয়ে' এই সম্বোধন করে চিঠি লিখলাম। সে আমার থেকে বয়সে বড় তাকে যে নমস্কার লেখা উচিত তা জানতাম না। ভাবলাম ওটা বুঝি সবার জন্য। সে যখন এই লেখা নিয়ে ঠাট্টা করতে লাগল তখন বুঝলাম।''

একজন ভক্ত বললে, ''ভগবানের সঙ্গে সেই রামস্বামীর মনে হয় খুব হৃদ্যতা ছিল।'' ভগবান উত্তর দিলেন, ''তিরুচুড়ীর সুন্দর মন্দিরে এখন যেখানে আমার একটা ছবি রাখা হয়েছে সেখানে একটা নেয়ারের খাটিয়া ছিল। বাবা শুতেন। রামস্বামী ও আমি ছাড়া সে খাটিয়াতে আর কেউ

উঠতে সাহস করত না। বাবা শহরে না থাকলে আমরা দু'জনে তাতে ঘুমাতাম। রামস্বামী ছাড়া বাবার কাছে কেউ ঘেঁস্‌তে পারত না কারণ তার মা ছিল না আর আমি এ সব বিষয়ে স্বভাবতঃই বেশ সাহসী ছিলাম। বাবার দারুণ ব্যক্তিত্ব ছিল।''

সেই ভক্ত বললে, ''সেই রামস্বামী কি কখনো এখানে এসেছে?'' ভগবান বললেন, ''অনেক দিন আগে একবার এসেছিল। তার নিজের জায়গা ছেড়ে আসার খুব অসুবিধা ছিল। যারা এখানে আসত মনে হয় তারা আমার কথা তাকে বলত। সেও প্রায় আসব আসব করত কিন্তু হয়ে ওঠেনি। তারপর এই বিশ্বনাথ বিয়ে করবে না বলে বাড়ি থেকে এখানে পালিয়ে এল। বিশ্বনাথ রামস্বামীর ছেলে। সে ভেবেছিল বিশ্বনাথকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। যা হোক, এটা তার ছেলের ব্যাপার তাই আর দেরি করা চলল না। তিনি আসছেন এই মর্মে বিশ্বনাথ একটা চিঠি পেল। খবরটা না বলে বিশ্বনাথ চিঠিটা আমায় দিয়ে বললে, 'ডিন্ডিগুলের পাহাড় নড়তে আরম্ভ করছে।' চিঠি দেখে বুঝলাম যে সে কী বলতে চায়। পরের দিন রামস্বামী এসে পৌঁছাল। সম্প্রতি সে আমায় চিঠি লেখার সময়ে নিজেই 'স্বামীকে নমস্কার জানিয়ে' লিখতে শুরু করেছে। সে লেখে 'স্বামী আমায় আশীর্বাদ করবেন।' তার অর্থ আমার ছোটবেলা থেকেই সে আমার আশীর্বাদ পেয়েছে। তখন কে জানত যে, এই রকম হবে? আমি লিখে ফেলেছিলাম। ব্যস্।''

* * *

9ই এপ্রিল, 1947

(108) উপদেশগুচ্ছ

গতকাল সকালে একদল আন্ধ্র ভদ্রলোক এল আর আসার দশ মিনিটের মধ্যে প্রশ্ন করতে শুরু করলে।

প্রশ্ন– ''ভগবান সব সময়ে আমাদের নিজেকে জানতে বলেন। তিনি কৃপা করে, কী করে নিজেকে জানা যায় বলুন আর আশীর্বাদ করুন।''

ভগবানের উত্তর– ''আশীর্বাদ সব সময়ে রয়েছে। যা নেই তাই চাইতে হয়, যা আগে থেকে রয়েছে তাকে চাওয়া উচিত নয়। কৃপা যে আছে সমস্ত হৃদয় নিয়ে সেটা বিশ্বাস করো। ব্যস্।''

আর একজন বললে, ''এখানে প্রত্যেকদিন বেদপারায়ণের সময়ে বলা হয় 'তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ' 'শিখায়া মধ্যে'র অর্থ কি?''

ভগবানের উত্তর, '''শিখায়া মধ্যে'র অর্থ অগ্নি শিখার মধ্যে, এটা বেদের শিখার (কেশগুচ্ছের) মধ্যে নয় । তার অর্থ বেদমন্থন ক'রে যে জ্ঞানাগ্নি উদ্দীপ্ত হয় তার মধ্যে পরমাত্মা রয়েছেন।

প্রশ্ন– ''ভগবান সচরাচর কী আসনে বসেন ?''

ভগবান– ''কী আসন? হৃদয়াসন। যেখানে সুখ সেখানেই আমার আসন। একেই সুখাসন বলে। সেই হৃদয়ের আসন শান্তিময় আর তাতেই সুখ। যারা এ আসনে বসে আছে তাদের আর অন্য কোনো আসনের প্রয়োজন নেই।''

অন্য একজন বললে, ''গীতা বলে 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' (সকল ধর্ম ত্যাগ ক'রে 'আমার' শরণ নাও)। ''সর্ব– ধর্মান্' বলতে কোন্ কোন্ ধর্ম বোঝায়?''

ভগবান– ''সর্বধর্মান্' বলতে জীবনের সব ধর্ম। 'পরিত্যজ্যে'র অর্থ সেগুলো ত্যাগ ক'রে। 'মামেকং'–এর অর্থ 'আমি' একেশ্বরের (একমাত্র আত্মার), 'শরণং ব্রজ' শরণ নাও।

প্রশ্ন– '' 'হৃদয় গ্রন্থি ভেদনম্' শব্দটি 'শ্রীরমণগীতা'য় আছে। এর অর্থ কী?

উত্তর- ''যাকে আমি 'চলে যাওয়া', 'নাশ', 'বাসনা-ক্ষয়', 'অহংকারের লয়', 'আমি', 'জীবত্বের বিলয়', 'মনোনাশ'- আরও অনেক শব্দে ব্যাখ্যা করি। সকলেরই এক অর্থ। মনোনাশই 'হৃদয় গ্রন্থি ভেদনম্'। জ্ঞান শব্দেও তাই বুঝায়- বোঝাবার জন্য কয়েকটা পরিভাষা।''

যখন কথাবার্তা শুরু হয় তখন হলঘরটা গুমোট হওয়ার জন্য একজন সেবক পাখাটা চালিয়ে দিয়েছিল। ভগবান, ''ওটা কেন?'' মন্তব্য ক'রে সেটা বন্ধ করালেন। যারা কাছে ছিল তাদের দিকে ফিরে বললেন, ''এ দিকে দেখো! অনেকেই জিজ্ঞাসা করে, জ্ঞানী হওয়ার পরও কী করে কর্ম হয়। এ প্রশ্নের উত্তরে আগের দিনে তাঁরা কুমোরের চাকের উদাহরণ দিতেন। চাকটা ঘোরে আর মাটির পাত্র তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসে। পাত্র তৈরি হয়ে গেলে আর চাকটা ঘোরানো বন্ধ হয়ে গেলেও সেটা আরও কিছুক্ষণ না ঘুরে একেবারে থামে না। এখনকার দিনে আমরা ইলেক্ট্রিক পাখার উদাহরণ দিতে পারি। পাখাটা বন্ধ করা হয়েছে তবু আরও কিছুক্ষণ না ঘুরে এটা একেবারে থামবে না। অনুরূপভাবে জ্ঞান লাভ হলেও সেই শরীরটা যা করতে এসেছে তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞানীর শরীর ত্যাগ হয় না।''

হঠাৎ আমার পিছনে প্রায় আটমাসের একটি শিশু 'তাতা' 'তাতা' বলে উঠল। ভগবান সেই মিষ্টি বুলি শুনে ঘাড় তুলে কে জানতে চাইলেন। আমি বললাম, ''ও আমাদের মঙ্গলম্।'' ভগবান শিশুদের খুব ভালবাসেন। তিনি বললেন, ''তাই নাকি? আমি ভেবেছি কোনো বড় মেয়ে । ও কি এর মধ্যে 'তাতা' 'তাতা' বলতে শিখে গেছে?'' শিশুটি 'তাতা' 'তাতা' বলেই চলল। যারা কাছে ছিল ভগবান তাদের বললেন ''কী আশ্চর্য দেখো। শিশুরা প্রথমেই 'তাতা' শব্দ বলতে শুরু করে, যারা অর্থ 'তন্ তন্'। 'তন্ তন্' ('আমি'র তামিল প্রতিশব্দ)- এটা তার সত্তা- একে মনও বলা যায়। যেমন শিশুদের 'তাতা' বলার পরই অন্য সব কথা ফোটে তেমনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'আমি' কথাটাই প্রথমে আসে। তারপরই তুমি, সে

ইত্যাদি কথা বলা হয়। 'অহম্' বোধ হওয়ার পরেই অহংকার জাগে তারপর অন্যান্য বোধ অনুভূত হয়।''

তখন প্রায় 9টা, কৃষ্ণস্বামী সময় মেলাবার জন্য রেডিও খুলে দিলে। ঘড়িতে 9টা বাজার পর ''সবাইকে নমস্কার জানিয়ে'' রেডিও বন্ধ হয়ে গেল। ভগবান হাসলেন ও বললেন, ''বেতার ঘোষণাকারী বলে 'সবাইকে নমস্কার' যেন সে আর অন্যেরা পৃথক। সেও কি ওদের একজন নয়? অতএব দাঁড়াচ্ছে যে, সে নিজেকেও নমস্কার করছে। এটা তারা বোঝে না। সেটাই আশ্চর্যের কথা।''

* * *

10ই এপ্রিল, 1947

(109) পূর্ণসমর্পণ

আজ সকালে একজন আন্ধ্র যুবক ভগবানকে একটা কাগজ দিলে, তাতে লেখা ছিল, ''স্বামীজি! লোকে বলে যে যদি অন্য চিন্তা না ক'রে একান্তভাবে ও সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের শরণ নেওয়া যায় তবে সবই পাওয়া যায়। এর অর্থ কি একস্থানে বসে সব চিন্তা ত্যাগ ক'রে, এমন কি শরীর ধারণের জন্য খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে ঈশ্বরের চিন্তা করা? এর অর্থ কি শরীর অসুস্থ হলেও ওষুধ ও চিকিৎসার কথা না ভেবে, রোগ ও আরোগ্য সবই ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দেওয়া? গীতায় যে স্থিতপ্রজ্ঞের সংজ্ঞা দেওয়া আছে যেমন-

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহংকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ 271

''যে সকল কামনা ত্যাগ ক'রে আসক্তিহীন হয়ে 'আমি' ও 'আমার' বোধশূন্য হয়ে থাকতে পারে সেই শান্তি লাভ করে।''

এর অর্থ সব বাসনা ত্যাগ করা। তবে কি আমরা সর্বান্তঃকরণে কেবল ঈশ্বর চিন্তা করব আর না চাইতে যা আহার-পানীয় পাওয়া যাবে

তা গ্রহণ করব? কিংবা সামান্য কিছু চেষ্টা থাকবে? ভগবান! দয়া করে এই শরণাগতির রহস্য বুঝিয়ে দিন।''

ভগবান কাগজটা ধীরে ধীরে দেখলেন আর যারা নিকটে ছিল তাদের বললেন, ''দেখ! যদিও অনন্যশরণাগতির অর্থ অন্য কোন চিন্তায় আসক্ত না হওয়া তা বলে কি স্থূল শরীরের জন্য যা দরকার সেই আহার-পানীয়ের চিন্তাও ছাড়তে হবে? ও জিজ্ঞাসা করছে 'না চাইতে ঈশ্বরের ইচ্ছায় কিছু পাওয়া গেলে তবেই কি খাওয়া উচিত? কিংবা কিছু চেষ্টা করা উচিত?' বেশ কথা! ধরে নেওয়া যাক, যা খেতে হবে তা আপনা হতেই এল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কে খাবে? ধরে নিলাম যে, কেউ সেটা মুখেও পুরে দিলে তবু আমাদেরই তো গিলতে হবে! সেটাও কি একটা চেষ্টা নয়? ও জানতে চায় 'আমি অসুস্থ হলে, ওষুধ খাব কিংবা ভাল হওয়া বা না হওয়া ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিয়ে চুপ করে থাকব?' বলা হয়েছে 'ক্ষুদ্ ব্যাধেঃ আহারাম্'। এর দু'টি অর্থ। একটা, যেহেতু ক্ষুধা একটা ব্যাধি সেই ক্ষুধারূপ ব্যাধির জন্য খাদ্যরূপ ওষুধ দেবে অন্যটা, ব্যাধিতে ওষুধের মত ক্ষুধাতে খাদ্য দেবে। শঙ্করের লেখা 'সাধনপঞ্চকমে' বলা আছে 'ক্ষুদ্ব্যাধিশ্চ চিকিৎস্যতাং প্রতিদিনং ভিক্ষৌষধং ভূজ্যতাম্' তার অর্থ ক্ষুধারূপ ব্যাধির চিকিৎসার জন্য ভিক্ষালব্ধ খাদ্য আহার করো। তাহলে অন্ততঃ ভিক্ষায় যেতে হবে। সবাই যদি চোখ বুঁজে খাবার এলে খাব বলে বসে থাকে তবে সংসার চলবে কী করে? এজন্য প্রচলিত রীতি অনুসারে যা করার তাই করতে হবে আর সে নিজেই যে এগুলো করছে এই ভাবটা ত্যাগ করতে হবে। 'আমি করছি' এই ভাবটা বন্ধন। অতএব অসুখ হলে ওষুধ দেওয়া হবে কি না ক্ষুধা পেলে খাওয়া যাবে কি না ইত্যাদি সংশয় যা ক্রমাগত হতেই থাকবে আর কোনকালে মিটবে না, তা না ভেবে 'আমি করছি' ভাবটা কী করে ত্যাগ করা যায় তার উপায় বিবেচনা ও খোঁজা প্রয়োজন। এমন কি যন্ত্রণা হলে 'উ, আঁ' করব কি? শ্বাস ফেলে তুলব কি? এরূপ সংশয়ও হতে পারে। প্রত্যেকের মানসিকতা অনুযায়ী কোন একজন কর্তা, তাঁকে ঈশ্বর বা কর্ম যাই বলো, জগতের সব কিছু করছেন। যদি দায়িত্বটা তাঁর

ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে যা হওয়ার তা ঠিকই হয়ে যাবে। আমরা রাস্তায় চলি। চলার সময়ে কি প্রত্যেক পা তোলার সময়ে অন্যটা কোথায় ফেলব বা কোথায় থেমে যাব ভাবি? চলাটা কি আপনা হতে হয়ে যায় না? শ্বাস-প্রশ্বাসের সম্বন্ধেও তাই। এর জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করতে হয় না। জীবনের সম্বন্ধেও তাই। আমরা কি ইচ্ছা করলেই কিছু ছাড়তে পারি বা যা ইচ্ছা করি তাই করতে পারি? অনেক কিছুই আমাদের অজ্ঞাতসারে আপনা হতে হয়ে যাচ্ছে। পূর্ণসমর্পণের অর্থ সব চিন্তা ত্যাগ ক'রে মনটা তাতে একাগ্র করা। তাঁতে মন একাগ্র করলে অন্য চিন্তা চলে যাবে। যদি কায়-মন- বাক্যের কর্ম ঈশ্বরে মিশে যায়, জীবনের সব ভারই তাঁর হবে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে বললেন-

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ 922

''যে অন্য সব চিন্তা ত্যাগ ক'রে একান্তভাবে আমাকে উপাসনা করে এরূপ নিত্যযোগীর রক্ষার ভার আমি গ্রহণ করি ও তার যা প্রয়োজন তাও এনে দেই।''

''অর্জুনকে যুদ্ধ করতে হবে। সুতরাং কৃষ্ণ বললেন, 'সব ভার আমায় দিয়ে, তোমার কাজ ক'রে যাও তুমি যন্ত্রমাত্র। আমি সব দেখব, তোমাকে কিছু বিচলিত করবে না।' তা সত্ত্বেও ঈশ্বরে সমর্পণ করার আগে কে সমর্পণ করছে তাকে জানা উচিত। সব চিন্তা দূর না হলে সমর্পণও হয় না। যখন কোন চিন্তা থাকে না, যা থাকে তা আত্মা। সুতরাং সমর্পণটা নিজের আত্মাকেই করা হয়। ভক্তির ভাষায় সমর্পণ হলে সব ভার ঈশ্বরকে অর্পণ করতে হবে, আর কর্মের ভাষায় যতক্ষণ না নিজেকে জানা যায় ততক্ষণ কর্ম (বিচার) করতে হবে। দু'ভাবেই ফল এক। সমর্পণের অর্থ নিজের আত্মার অনুসন্ধান ও তাকে জানা আর তারপর তাতেই থাকা। আত্মার অতিরিক্ত আর কী আছে?''

সেই যুবক বললে, ''কী উপায়ে এটা জানা যাবে?'' ভগবান বললেন, ''গীতায় অনেক পথের কথা বলা হয়েছে। ধ্যান করতে বলা হয়েছে। যদি তা না করতে পারো তবে ভক্তি বা যোগ কিংবা নিষ্কাম কর্ম করো। অনেক প্রকার পথের কথা বলা হয়েছে। এর যে কোন একটা ধরো। নিজের আত্মা সব সময়ে নিজের কাছে রয়েছে। সংস্কার অনুযায়ী ঘটনা ঘটে। 'আমি কর্তা' বোধটা বন্ধন। যদি বিচার ক'রে এই বোধটা ত্যাগ করা যায় তবে আর এ প্রশ্নগুলো ওঠে না। শরণাগতি কেবল চোখ বুঁজে বসে থাকা নয়। সবাই যদি এরূপ বসে থাকে তবে সংসার চলে কী করে?'' এই কথা বলতে বলতে খাওয়ার ঘণ্টা বেজে উঠল। ওই ঘণ্টা বাজল, আমরা উঠব কি না?'' বলে হেসে হেসে ভগবান উঠে পড়লেন।

* * *

17ই এপ্রিল, 1947

(110) স্বপ্নে দেখা

গত পরশু সকাল ৪টা কি 9টার সময়ে একজন মধ্যবিত্ত, বয়স্ক আয়ুর্বেদ জানা ভদ্রলোক এসে ভগবানকে প্রণাম ক'রে, ''স্বামী! এটা কফের পক্ষে ভাল, খাবেন,'' বলে একটা ওষুধ দিতে গেল। সেবকেরা তাকে বাধা দিতে গেলে ভগবান তাদের বারণ করলেন আর ওষুধ নিয়ে সেবকদের বললেন, ''দেখ, সেই পাহাড়ে থাকার সময় থেকে এ আমাকে কিছু না কিছু ওষুধ দেয়। ওকে দিতে দাও। বোধহয় কোন স্বপ্ন দেখেছে।'' বেশ খুশি হয়ে সেই বৃদ্ধ বললে, ''এবার কোন স্বপ্ন দেখিনি, স্বামী। আপনার বছরের এই সময়ে কফ বৃদ্ধি হত, তাই না? সেজন্য এনেছি।'' বলে প্রণাম ক'রে চলে গেল।

সে চলে যেতেই, ভগবানের কাছে বসা একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করলে, ''আপনি যে স্বপ্নের কথা বললেন, সেটা কী?'' ভগবান বললেন,

''ও সেটা! পাহাড়ে থাকতে একদিন পলনীস্বামীকে এমনি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে লেবু আছে কি না। সে বললে, 'না'। আমি বললাম, 'তাহলে থাক।' মনে হয় সেই রাত্রে এই লোকটি স্বপ্ন দেখলে যে আমি তার কাছে একটা লেবু চাইছি। পরের দিন সকালে আমি বাইরে যাওয়ার আগে সে সেখানে উপস্থিত হয়ে বললে, 'স্বামী, লেবুটা নিন।' আমি বললাম, 'গতকাল পলনীস্বামীকে লেবু আছে কি না জিজ্ঞাসা করেছিলাম তা তুমি কী করে জানলে?' উত্তরে সে আমায় বললে, 'আপনি স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন যে আপনার একটা লেবু চাই। তাই নিয়ে এলাম।' বলে সে আমার হাতে লেবুটা দিলে। এই রকম হয়েছিল।'' ভক্ত জিজ্ঞাসা করলে, ''ভগবান তাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়েছেন, এটা কি সত্য?'' ভগবান হেসে বললেন, ''আমি জানি না। কে জানে? সে বললে। ব্যস্।''

আর একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করলে, ''কে. কে. নাম্বিয়ারের খাতাও এইভাবে এখানে এসেছিল, তাই না?'' ভগবান উত্তর দিলেন, ''হাঁ, তা ঠিক। তখন মাধব ছিল। শ্রীরমণগীতা ও তার মালয়ালাম ব্যাখ্যা লেখার জন্য আমি মাধবকে আলমারি থেকে একটা কালো মলাটের লম্বা খাতা বার ক'রে দিতে বলেছিলাম। সে বললে দেবে, কিন্তু চার পাঁচদিন ভুলে গেল। ইতিমধ্যে নাম্বিয়ার এল আর যা আমি চাইছিলাম ঠিক সেই মাপের ও সেই ধরণের একটা খাতা আমায় দিলে। যখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে আমি যে রকমটা চাইছিলাম ঠিক সেই রকম খাতা সে কী করে আনলে, সে বললে, 'ভগবান আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়ে কত পাতা, কত লম্বা, কতটা চওড়া বর্ণনা ক'রে খাতা চাইলেন। দোকানে গিয়ে দেখি ঠিক সেই রকম একটা খাতা রয়েছে। আমি নিয়ে এলাম।' ইতিমধ্যে মাধব এল। তাকে বললাম, 'দেখ, এই খাতা, তুমি আমায় দিয়েছ, তাই না?' সে অবাক হয়ে গেল আর আমার নির্দেশ স্মরণ ক'রে আলমারি থেকে খাতা বার করলে। দেখা গেল দু'টি ঠিক এক মাপের। সেটা শ্রীরমণগীতা ও তার ব্যাখ্যা ধরে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কাজটা হয়ে গেল, নাম্বিয়ার এসে ছাপাবে বলে নিয়ে গেল কিন্তু সেই সঙ্গে ভগবানের হাতের লেখা ছাপাখানায় পাঠাতে

ইতস্ততঃ করতে লাগল। সেজন্য আর একটা নকল করে ছাপাখানায় দিয়ে মূলটা নিজের কাছে রেখে দিলে। সেটা নিশ্চয় এখনও তার কাছে আছে। রাজাগোপালও একবার এই রকম করেছিল। আমাদের শিশিতে লেখার কালি ফুরিয়ে যাওয়াতে এখানকার লোকেদের দু'একবার সেটা ভরে দিতে বললাম। সেদিন কি পরের দিন রাজাগোপাল ফেরার থে একটা বড় শিশিতে ক'রে কালি নিয়ে এল। সে কী করে জানলে যে এখানে কালির দরকার জিজ্ঞাসা করাতে, সে বললে যে ভগবান স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছেন যে এখানে কালির প্রয়োজন তাই 'আমি নিয়ে এলাম'। কখনো কখনো এরকম ঘটনা ঘটে।''

সেই ভক্ত বললে, ''তারা বলে, ভগবান নিজে বলেছেন, এটা কি সত্য?'' ভগবান উত্তর দিলেন, ''কী করে জানব? তারা বলে। বাস্।'' সেই ভক্ত আবার বললে, ''তা সত্ত্বেও, কী আশ্চর্য, যা এখানে প্রয়োজন তাই তারা স্বপ্নে দেখেছে?'' ভগবান সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে নীরব হলেন।

* * *

18ই এপ্রিল, 1947

(111) দিব্যদর্শন

আজ সকাল 8টার সময়ে ভগবান একজন আগন্তুক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে আমায় বললেন, ''একে চেনো?'' আমি বললাম, ''না''। ভগবান বললেন, ''আমার জীবনীতে যাকে আমার দুধবোন বলে লেখা হয়েছে, এ আমার সেই জ্ঞাতি বোনের স্বামী।'' (ভদ্রলোকের নাম মানামাদুরাই রামস্বামী আইয়ার)। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ''তাঁর নাম কী ছিল?'' ভগবান বললেন, ''মীনাক্ষী।'' এই ভদ্রলোককে কয়েকবার দেখেছি কিন্তু সম্পর্কটা আগে জানা ছিল না। পাশে বসা আর একজন ভক্তকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, সে চেনে কি না। সে বললে, ''কেন? খুব ভালভাবেই চিনি। সেই মহিলার মৃত্যু সময়ে ভগবান তাঁকে দর্শন

দিয়েছেন।'' আমি একটু অবাক হয়ে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলাম, ''এটা কি সত্য?'' ভগবান উত্তর দিলেন, ''হাঁ। তিরুভোট্টিয়ুরে নায়নার বেলায় যা হয়েছিল, এর বেলায়ও তাই হয়েছিল। মনে হয়, আমি গিয়ে তাকে স্পর্শ করেছিলাম। সে চমকে উঠে বলেছিল, 'আমায় কে স্পর্শ করলে?' ব্যস্। তারপরই তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। পরে জানা গেল যে এটা তার জীবনের শেষ মুহূর্তে ঘটেছিল।''

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ''সে কী তার অভিজ্ঞতা আশপাশের কাউকে বলেছিল?'' ভগবান বললেন, ''আমরা সেটার খোঁজ নিয়েছিলাম, কিন্তু তখন তার আর কথা বলার ক্ষমতা ছিল না।'' আমি বললাম, ''তার অর্থ, আপনি নায়নার মত এঁকেও দর্শন দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন। আপনার মায়ের স্তন্যপানের সৌভাগ্য কি বৃথা যাবে?'' ভগবান বললেন, ''তা ঠিক, মা আমাদের দু'জনকে স্তন্যপান করাতেন। আমি পাঁচ বছর পর্যন্ত মায়ের স্তন্যপান করেছি। বাবা দেখলেই মাকে বকতেন 'এ কী, এত বড় ছেলেকে স্তন্যপান করানো কেন?' সেজন্য আমি তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করতাম তারপর স্তন্যপান করতাম। মার খুব দুধ ছিল।''

একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করলে, ''ভগবান গণপতি শাস্ত্রীকে 'নায়না' (বাবা) বলেন কেন?'' তিনি বললেন, ''একটা কারণ আছে। আমার সবাইকে বেশ সম্মান দিয়ে কথা বলার অভ্যাস। তাছাড়া সে আমার থেকে বয়সে বড় ছিল। অতএব আমি তাকে 'গণপতি শাস্ত্রীগারু' বলতাম। এটা তার পক্ষে খুবই কষ্টদায়ক ছিল। তাই সে আমায় অসংখ্যবার এটা না করার জন্য অুননয় করত, 'আমি কি আপনার শিষ্য নই? একটা ডাক নাম ধরে কথা বলেন না কেন? এটা অন্যায়।' আমি তার প্রতিবাদ শুনতাম না। শেষে একদিন ধরে পড়ল যে একটা অন্তরঙ্গ ঘরোয়া সম্বোধন করতেই হবে। দেখ, তার সব শিষ্যেরা তাকে 'নায়না' বলত। আমিও সেই ওজর দিলাম আর বললাম যে আমিও তাকে অন্যদের মতো 'নায়না' বলে ডাকব। সে এতে রাজি হল কারণ 'নায়নার' অর্থ 'ছেলে'ও হয় আর শিষ্যকে নিজের ছেলে বলে সম্বোধন করা যায়। আর আমিও রাজি হলাম কেন না 'নায়নার'

অর্থ 'বাবা'ও হয় সুতরাং আমার কিছু এসে যাবে না। আমি সম্মান করেই সম্বোধন করছি। তাকে যখন গুরুজনদের মতো 'আপনি' করে কথা বলতাম তাতে সে খুবই কুণ্ঠিত হত।''

আমি বললাম, 'আপনি বললেন যে মীনাক্ষীর দর্শন বিষয়ে বলার ক্ষমতা ছিল না। তা ঠিক আছে, কিন্তু নায়নার কী দর্শন হয়েছিল সেটা সবাইকে বলেছে, তাই না? বেদান্তের ভাষায় এই দু'জনার একই সময়ে একরূপ অভিজ্ঞতাকে কী বলে?'' ভগবান হেসে বললেন, ''একে দিব্যদর্শন বলে।''

20শে এপ্রিল, 1947

(112) শ্বেতময়ূর

এ মাসের 12ই একজন একটা সাদা ময়ূর এনে বললে যে বরোদার মহারানি আশ্রমে উপহারস্বরূপ এটি পাঠিয়েছেন। তাই দেখে ভগবান বললেন, ''এখানে দশ বারোটা রঙিন ময়ূর কি যথেষ্ট নয়? ওরা হয়তো এর অন্যরকম রঙ দেখে লড়াই করবে। তাছাড়া একে বিড়ালের হাত থেকে বাঁচতে হবে, কী দরকার? একে বরং নিজের জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া ভাল।'' লোকটি কোন ভ্রূক্ষেপ না করে ময়ূর রেখে চলে গেল। অতএব ঠিক হল যে কৃষ্ণস্বামী এর দেখাশোনা করবে আর অন্যেরা তাকে সাহায্য করবে।

সেদিন বিকালে আশ্রমে গিয়ে দেখি যে ভগবান কাছে বসা লোকদের ময়ূর সম্বন্ধে বলছেন, ''দেখ! একবার একজন দিয়াশলাই-এর বাক্স তৈরির কারখানার মালিক একটা 'বল্লী' নামে ছোট হরিণ এনে এখানে রেখে গিয়েছিল, এটা আশ্রমে ঘুরে বেড়াত। ছোলার ডাল ও মুরুমুরু (কাঠিভাজা) মিশিয়ে তাকে থালায় ক'রে দিলে এটা মুরুমুরু না খেয়ে সব ডাল ক'টি বেছে খেয়ে ফেলত, একটিও থালার বাইরে ফেলত না। তারপর যখন ছাগলের পালের সঙ্গে পাহাড়ে যেতে আরম্ভ করলে, লোকেরা জানত

যে এটা আশ্রমের তাই একেও ফিরিয়ে আনত। পরে নিজেই ফিরে আসত। সেজন্য আমরাও ছেড়ে দিয়েছিলাম। একজন পঞ্চমা (চার বর্ণ থেকে নীচু জাতি) মেরে খাওয়ার জন্য এর পা ভাঙ্গলে, একজন যে একে চিনত সে একে সমস্ত রাস্তা ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে এল। খুব রক্তপাত হচ্ছিল। আমরা সেবা-শুশ্রূষা করলাম, কোন ফল হল না। কয়েকদিন পরে সে আমার কোলে শুয়ে মারা গেল। অপ্পামলইস্বামী ও আমি ওইদিকে ধাপের কাছে পাহাড়ের তলায় তার একটা সমাধি তৈরি করেছিলাম।''

এই শুনে অবাক হয়ে আমি বললাম, ''ঋষিরা বলেছেন যে ভারতখণ্ডে ঈশ্বর অবতাররূপে পশুপাখিদের মুক্তি দেন, এও দেখছি তাই।''

ময়ূরটা কোথাও পালিয়ে গিয়েছিল, কৃষ্ণস্বামী তাকে ধরে নিয়ে এল। ভগবান এক হাতে ঘাড়টা ধরে অন্য হাত দিয়ে গলা থেকে বুক অবধি হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, ''দুষ্টু ছেলে, কোথায় গিয়েছিলে? এ রকম করে পালালে আমরা তোমায় কী করে সামলাব? যেও না, বুঝলে। ওদিকে হিংস্র জানোয়ার আছে। এখানে থাকো না কেন?'' এই রকম মিষ্টি কথায় বোঝালেন।

এরপর সে আর অনেক দিন আশ্রমের বাইরে যায়নি, কিন্তু আশ্রমের মধ্যে অন্যান্য কুটিরে যেতে শিখেছিল। এটা দেখে ভগবান বলতেন, ''এ যেন ঠিক সর্বাধিকারী।'' আজ বিকাল আড়াইটার সময়ে গিয়ে দেখি রেডিও বাজছে, ইলেক্ট্রিক পাখা ঘুরছে, ময়ূরটা রেডিওর কাছে চোখ বুঁজে চুপ ক'রে বসে আছে, যেন ধ্যান করছে। এ দেখে একজন বললে ''দেখ, কী মন দিয়ে শুনছে।'' ভগবান বললেন, ''ময়ূরেরা সঙ্গীতপ্রিয়, বিশেষতঃ বংশীধ্বনি।''

''যদিও এটা সাদা কিন্তু অন্যগুলোই বেশি সুন্দর'', কেউ একজন ময়ূরকে দেখিয়ে বললে। ভগবান বললেন, ''তা সত্ত্বেও এর একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। অন্যদের অনেক সুন্দর সুন্দর রঙ। এটি কোন রঙ ছাড়া একেবারে খাঁটি সাদা। তার অর্থ অন্য গুণ (উপাধি) ছাড়া শুদ্ধসত্ত্ব (শুদ্ধ

আত্মা)। দেখ, বেদান্তের পরিভাষায় ময়ূরের উদাহরণ নেওয়া যায়। অন্য ময়ূরদেরও জন্মাবার সময়ে এত রঙ থাকে না। একটাই রঙ থাকে। বড় হলে অনেক রঙ হয়। যখন তাঁদের পুচ্ছ হয় তখন কত চন্দ্রক হয়। দেখ, কত রঙের বাহার আর কত চন্দ্রক। আমাদের মনও এরূপ। জন্মানোর সময়ে এর কোন বিকার থাকে না পরে ময়ূরের রঙের মতো কত রকম কর্মপ্রেরণা আর কত কল্পনার উদয় হয়।''

* * *

24শে এপ্রিল, 1947

(113) কোন্‌টা পা আর কোন্‌টা-ই বা মাথা

আজ বিকাল তিনটার সময়ে একজন ভক্ত ভগবানের সোফার কাছে দাঁড়িয়ে বললে, ''স্বামী! আমার একটি মাত্র ইচ্ছা যে, একবার আপনার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করি। ভগবান আমায় অনুমতি দিন।'' ভগবান বললেন, ''ও! এই ইচ্ছা! কিন্তু বলো তো পা-ই বা কী আর মাথা-ই বা কী?'' কোন উত্তর নেই। একটু থেমে ভগবান বললেন, ''যেখানে একজন নিজে মিশে যায় সেটাই পা।'' ভক্ত জিজ্ঞাসা করলে,''সেটা কোথায়?'' ভগবান বললেন,''কোথায়? নিজের আত্মায়। 'আমি' 'আমি' অহংকারই মাথা। যেখানে অহংবৃত্তি লয় হয় সেটাই গুরুর শ্রীচরণ।''

সে বললে, ''বলা হয় যে, মাতা, পিতা, গুরু ও ঈশ্বরকে ভক্তির সঙ্গে সেবা করা উচিত, কিন্তু যদি ব্যক্তিগত আমিত্ব লয় হয়ে যায় তবে সেবা কী করে হবে?'' ভগবান বললেন, ''ব্যক্তিগত আমিত্ব লয় হওয়ার অর্থ কী? তার অর্থ ভক্তির বিস্তার করা। সবই নিজের আত্মা থেকে উদয় হয়। সেজন্য সে যদি নিজের আত্মায় থাকে তবে সব কিছুর আধার হওয়ার শক্তি লাভ করে।'' ভক্ত বললে, ''নিজেকে আপন স্থানে মিলিয়ে দেওয়া কি বুদ্ধি নিয়ে অন্নময় কোষ ইত্যাদি ত্যাগ করা আর অবশেষে বুদ্ধিকেও ত্যাগ করা?'' ভগবান উত্তর দিলেন, ''বুদ্ধিকে ত্যাগ ক'রে তুমি

কোথায় যাবে? বুদ্ধির আপন স্থানে থাকার অর্থই স্বরূপে থাকা। আগে বলা ভৌতিক পদার্থগুলো (অন্নময় ইত্যাদি) নিরসন বা ত্যাগ করার জন্য বুদ্ধি একটা পাচনবাড়ি (গরু তাড়াবার লাঠি)। বুদ্ধিও দু'রকম বলা হয়, মলিন ও শুদ্ধ। যখন অন্তঃকরণের ক্রিয়ার সহিত যুক্ত তখন মলিন। তাকেই মন বা অহংকার বলা হয়। বুদ্ধি যখন পাচনবাড়ির মতো এইগুলো সরাবার ও আত্মার (অহম্ সুরণ) অর্থাৎ 'আমি'র উদ্দীপনের জন্য ব্যবহৃত হয় তখন শুদ্ধ বুদ্ধি। যদি সেটাকে ধরে বাকিগুলো ত্যাগ করা যায় তবে যা আছে তাই একমাত্র থাকে।''

আরও প্রশ্ন হল, ''বলা হয় বুদ্ধিকে আত্মার সঙ্গে এক করতে হবে। সেটা কী?'' ভগবান উত্তর দিলেন, ''বুদ্ধি যখন বাইরে থেকে কিছু আসে না তখন আর তাকে আত্মার সঙ্গে এক করা যাবে কী করে? এটা একজনের নিজের মধ্যেই রয়েছে। আত্মার অনুভূতি বা ছায়াই বুদ্ধি। কেউ 'বুদ্ধি' বলে, কেউ 'শক্তি' বলে, কেউ বা 'অহম্' বলে। যে নামই হোক, অন্যস্থান থেকে আগন্তুক বিষয়গুলো সরিয়ে দেওয়ার জন্য একে বেশ শক্ত করে ধরে থাকতে হবে।''

* * *

15ই মে, 1947

(114) আত্মহত্যা

আজ বিকালে তিরুচিরাপল্লীর একজন যুবক একটা চিঠি লিখে ভগবানের হাতে দিলে। চিঠির সারার্থ ছিল, দেশে অসংখ্য লোক খাদ্যাভাবে কষ্ট পাচ্ছে, আরও কত প্রকার বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে, তাদের কষ্ট চোখে দেখা যায় না এইসব কষ্ট দূর করার জন্য ভগবানের কোন উপায় বলা উচিত তাঁর মতন মহাত্মার এরূপ উদাসীন হয়ে থাকা ঠিক নয়!

ভগবান চিঠিটা পড়লেন, তারপর সমালোচনার ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলেন, ''এইটা তোমার চাই? তুমি বলছ তাদের দুঃখ দেখে তোমার কষ্ট

হচ্ছে। তার অর্থ কি তুমি তাদের থেকে ভাল আছ ও বেশ সুখে আছ?'' যুবক বললে, ''না, আমিও কোন না কোন ভাবে কষ্ট পাচ্ছি।'' ভগবান বললেন, ''ও! তাই বলো। তুমি নিজের কিসে ভাল হয় জানো না আর অন্যদের জন্য ব্যস্ত হচ্ছ। সবাইকে সমান করা কি সম্ভব? সবাই যদি পাল্‌কি চড়ে, বইবে কে? সবাই যদি রাজা হয় তবে একজনকে বিশেষভাবে রাজা বলার আর কী অর্থ হয়? কেউ গরিব থাকলে তবেই অন্যদের ধনী বলা যায়। অজ্ঞানী থাকলেই একজন জ্ঞানীকে চেনা যায়। আলো থাকলেই অন্ধকারের অনুভব হয়। দুঃখ থাকলে সুখ বোধ হয়। ক্ষুধা থাকলে খাবার ভাল লাগে। সেজন্য যতটুকু সম্ভব ততটুকুই সাহায্য করা যায়, কিন্তু সবাইকে যদি সমান ভাবে সুখী করার চেষ্টা করা যায়, সেটা কখনো সম্ভব হয় না। অনেক বড় বড় নেতা কাজ করছেন। কেউ বলেন যে, যে কাজ করার কথা ছিল তা ঠিকভাবে করা হয়নি অতএব তাঁরা বক্তৃতা দেবেন। কিসের জন্য? একজনের পর একজন নেতা হচ্ছেন আর কাজও চলছে। একটা শক্তি সকলকে পরিচালিত করছে। সেই শক্তি যা করা উচিত তা করবে এই বিশ্বাসে আমরা যদি তার ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি তবে কোনো রকমে চলে যায়। অনেকে প্রাণীহত্যার ওপর বক্তৃতা দিচ্ছেন। যদি লোকেরা তাঁদের কথা না শোনে, তাঁরা বলেন, তাহলে তাঁরা আমরণ অনশন করবেন। 'আমরা আত্মহত্যা করব বা জীবন দিয়ে দেব।' যদি কেউ বলে যে প্রাণীহত্যা বন্ধ না হলে সে আত্মহত্যা করবে, আত্মহত্যা কি একটা জীবের প্রাণহত্যা করা নয়? তারা মনে করে আত্মহত্যার অর্থ দেহ ত্যাগ করা। শরীরটা কি আত্মার একটা অংশ নয়? আত্মা সদাসর্বদা ও সর্বস্থানে রয়েছে। যা সত্য ও নিত্য সেই আত্মার দিকে না দেখে যদি শরীর ইত্যাদিকে নিজের আত্মা মনে করা হয়, সেটাই তো আত্মহত্যা। এর অপেক্ষা অধিক হত্যা আর কী হতে পারে? যে ব্যক্তি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাহায্যে নিজেকে দেখতে সক্ষম, সে চতুর্দিকে যতই বিক্ষোভ হোক না কেন বিচলিত হয় না। সে সংসারের সুখদুঃখকে রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের মতো দেখে। তার দৃষ্টিতে জগতটা একটা রঙ্গমঞ্চ। সেই মঞ্চে একই লোক

কখনো রাজার পোশাক, কখনো মন্ত্রীর, সেবক, ধোপা, নাপিতের এবং আরও কত পোশাক প'রে অবস্থানুযায়ী অভিনয় করে কিন্তু যেহেতু সে নিজের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন আর সে ভালভাবেই জানে যে, সে যে সকল ভূমিকায় অভিনয় করছে তার কোনোটাই সে নয় সেহেতু সে প্রত্যেক অবস্থায় জীবনের উত্থান- পতনের জন্যে চিন্তিত হয় না। অনুরূপ ভাবে জগতটা ঈশ্বরের রঙ্গমঞ্চ। সেই মঞ্চে তুমি একজন অভিনেতা। তুমি তোমার সাধ্যমতো অন্যদের সাহায্য করতে পারো, কিন্তু তুমি সবাইকে সুখী করতে পারবে না। অতীতে কারও দ্বারা এটা হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না।''

যুবকটি বললে, ''এই জন্যেই সংসারে শান্তি নেই। আমি এর জন্য অসুখী।'' ভগবান উত্তর দিলেন, ''দেখ, তুমি যেখানে আরম্ভ করেছিলে আবার সেইখানেই ফিরে এসেছ। সংসারে শান্তি নেই ভেবে ও তার জন্য দুশ্চিন্তা না ক'রে বরং এ সংসারে তুমি কী করে শান্তি পাবে তাই খোঁজা ও তার জন্য চেষ্টা করা ভাল। যদি তুমি তোমার সেই দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করো তবে সংসারে শান্তি থাকল কি না, সে দুশ্চিন্তায় তোমার কী এসে যায়? যদি তোমার নিজের মনে শান্তি থাকে তবে সমস্ত জগৎ শান্তিময় মনে হয়। বলো দেখি, তোমার কি সেই শান্তি আছে?'' সে বললে, ''না।'' ''ও, তাই বলো। তোমার শান্তি নেই। কী করে শান্তি পাওয়া যায় তাও জানো না। যদি নিজে শান্তি পাওয়ার চেষ্টা না করে সংসারের শান্তির জন্য চেষ্টা করো তবে সেটা ঠিক যেন সেই লোকের মতো যার খাবার নেই, নিজেই খাবার চাইছে, পেলে, সে বলে যে অন্য সকলকে খাওয়াবে। প্রায় সেই খোঁড়া লোকটির মতো যে বলেছিল 'একবার তুলে ধরলে কি আমি চোর তাড়াতে পারি না'!''

* * *

16ই মে, 1947

(115) শক্তি এক

গতকালের যুবকের মতন একজন উত্তর ভারতীয় ভদ্রলোক ভগবানকে একটা প্রশ্নভরা চিঠি দিলে, তার মধ্যে প্রধান প্রশ্ন হল যে ভগবান কেন সংসারের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন না। ভগবান সেটা পড়ে কাছের লোকেদের বললেন, ''গতকালও আমরা এই ধরণের প্রশ্ন পেয়েছিলাম। যারা সংসারের কল্যাণের জন্য কাজ করার উপদেশ দিয়ে বেড়ায় তারা যদি প্রথমে নিজেদের মঙ্গলের চেষ্টা করে তাহলেই যথেষ্ট হয়। তারা নিজেরা কে তাই খুঁজে জানতে পারে না, জগতের সংস্কার করতে চায়! তারা আগে, কে এরূপ ভাবছে খুঁজে বার করুক। তা তারা করবে না। আর তারা বলে যে জগতের সংস্কার করবে। এটা ঠিক সেই খঞ্জের গল্পের মতো।''

প্রশ্নকারী বললে, ''স্বামী! আপনার মত জ্ঞানীরা কী করে চুপ করে বসে থাকেন? সংসারে এত দ্বন্দ্ব-কলহ, জ্ঞানীদের কি শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করা উচিত নয়?'' ভগবান বললেন, ''হাঁ, তাঁদের করা উচিত কিন্তু তাঁরা সাহায্য করছেন কি না তা তুমি কী করে জানলে? তাঁরা যেখানেই থাকুন, সেই উপস্থিতিই সংসারের কল্যাণ। বাইরে থেকে মনে হয় যে তাঁরা কিছু করছেন না। মনে করো, একজন বড়লোক। সে স্বপ্ন দেখলে যে, সে ভিক্ষা করছে, মোট বইছে আর রাস্তা ঝাড়ু দিচ্ছে। যখন জেগে উঠল, সে বুঝলে যে, সে এগুলোর কোনটাই নয় আর সে নিজেকে বড়লোক জেনে বেশ সম্ভ্রান্তভাবে রইল। অনুরূপভাবে জ্ঞানী তাঁর প্রারব্ধানুসারে অনেক কিছু করতে পারেন কিন্তু তিনি সর্বদা অনাসক্ত থাকেন ও মর্যাদাপূর্ণ দূরত্ব বজায় রাখেন। তাঁর শক্তি অনেক ভাবে কাজ করে কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টার সফলতা ও বিফলতায় তাঁর সুখ বা দুঃখ কিছুই অনুভব হয় না। তার কারণ, তিনি সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় দেখেন সুতরাং তার কাছে কেউ সুখী

বা দুঃখী নেই। যদি তিনি নিজেকে শরীরের মধ্যে আছেন অর্থাৎ তিনি একজন মানুষ ও এই একটা জগৎ রয়েছে বলে অনুভব না করেন, তবে তাঁর তৃপ্তি বা বিরক্তি হবে কী করে? এই জন্য বলা হয়– 'দৃষ্টিং জ্ঞানময়ীং কৃত্বা পশ্যেদ্ ব্রহ্মময়ং জগৎ', যখন একজন জ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করে, সেই মুহূর্তে সব কিছু ব্রহ্মময় হয়ে যায়। সেখানে আর 'আমি করছি' বলার স্থান কোথায়? তখন তাঁরা বুঝতে পারেন যে সব কিছু একটা শক্তির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ব্যস্।''

আর একজন বললে, ''জ্ঞানীরা বর ও শাপ দিতে পারেন, বলা হয়। আপনি বলছেন তাঁরা কিছুই করে না। এ কী করে হয়?'' ভগবান বললেন ''হাঁ। কে বললে, তাঁরা পারেন না? কিন্তু তাঁদের শক্তি বা ঈশ্বর ও নিজেদের মধ্যে পার্থক্যবোধ নেই। শক্তি যা আছে, সেটা এক। তাঁরা জানেন যে তাঁদের কর্ম সেই শক্তি দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে। তাঁরা 'আমি কর্তা' এই বোধ থেকে নিজেদের দূরে রাখেন। তাঁদের বিদ্যমানতাই জগতের কল্যাণ। তাঁরা তাঁদের প্রারব্ধানুসারে বা করণীয় তাই করে যান। ব্যস্।''

* * *

17ই মে, 1947

(116) প্রারব্ধ (ভাগ্য)

আজ সকাল 9টার সময়ে একজন ভক্ত ভগবানকে উদ্দেশ্য করে বললে, ''আপনি কাল বললেন যে জ্ঞানীরা প্রারব্ধানুসারে কাজ করেন। কিন্তু বলা হয় যে জ্ঞানীর কোন প্রারব্ধ নেই!''

ভগবান ধীরেসুস্থে বললেন, ''তাঁদের যদি প্রারব্ধ না থাকে তবে শরীর হয় কী করে আর তাঁরা বহুবিধ কাজই বা করেন কী করে? জ্ঞানীর কাজগুলোই প্রারব্ধ। বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মা থেকে সদাশিব অবধি সবার আর রাম ও কৃষ্ণ অবতার এবং অন্যদেরও প্রারব্ধ আছে।

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ গীতা 48

''সাধুদের রক্ষার জন্য, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য আর ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।''

এই শ্লোকে বলা হচ্ছে, যখন সাধুদের গুণ ও দুষ্কৃতকারীদের দোষ মিলে প্রারব্ধ সৃষ্টি হয় তখন তাঁকে ধর্ম সংস্থাপন করতে হয়। তাকে পরেচ্ছা (অন্যের ইচ্ছায়) প্রারব্ধ বলে। শরীরটাই প্রারব্ধ। যে কাজের জন্য শরীরটা হয়েছে সেটা নিজে থেকেই হয়ে যাবে।''

গতকালের প্রশ্নকারী বললে, ''গীতাতে কর্মযোগের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।'' ভগবান বললেন, ''ওহো! তাই নাকি? কেবল কর্মযোগই নয়। অন্যগুলোর কী হল? তুমি যদি সবগুলো বোঝো তবেই কর্মযোগের রহস্য বুঝবে, তা তো করবে না।''

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোহহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥ 916

''আমি ক্রতু (অগ্নিহোত্রাদি), আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা (শ্রাদ্ধাদি), আমি ঔষধ (ঔষধীয় গাছ-গাছড়া), আমি মন্ত্র, আমি যজ্ঞের হবি, আমি যজ্ঞের অগ্নি আর আমিই হোম।''

এই কথা বলার আগে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন-
ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু॥ 99

''হে ধনঞ্জয়! এ সকল কর্ম করেও আমি আসক্ত না হয়ে উদাসীন থাকি, সুতরাং তারা আমায় আবদ্ধ করতে পারে না।''

এ ছাড়াও-

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥ 1423

''যিনি উদাসীন হয়ে থাকেন, তিনি গুণের কর্মের জন্য বিচলিত হন না, গুণেরাই কর্ম করে জেনে, স্থির হয়ে থাকেন।''

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥ 1424

''সুখে দুঃখে যাঁর সমভাব, যিনি আত্মস্থিত, যাঁর কাছে মাটির ডেলা, পাথর ও সোনা সমান, প্রিয় ও অপ্রিয়ে যাঁর তুল্য বোধ, যাঁর নিন্দাস্তুতিতে সমভাব ও যিনি ধীর,

মানাপমানয়োস্তল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে। 1425

যাঁর মান অপমানে সমান বোধ, যাঁর নিকট শত্রু মিত্রের ভেদ নেই, যাঁর কোন কর্মপ্রেরণা নেই, তাঁকেই গুণাতীত বলে।''

''এই সবই বলা হয়েছে। যে মহাপুরুষদের কথা বলা হয়েছে তাঁরা আত্মোপলব্ধি করেছেন। তাঁদের বাহ্য আচার-ব্যবহার যাই হোক, শিষ্য, ভক্ত, উদাসীন ও পাপাত্মা এই চার প্রকার ব্যক্তিই জ্ঞানীর কৃপায় রক্ষা পায়। শিষ্য তাঁদের গুরু বলে পূজা করে সত্য নির্ণয় ক'রে মুক্তি লাভ করে। ভক্ত তাঁদের ঈশ্বর স্বরূপ জেনে প্রার্থনা করে ও মুক্তি লাভ করে। গুরু যা বলেন শুনে উদাসীন উৎসাহিত হয়ে ভক্ত হয়। পাপাত্মারা লোকমুখে শুনে আসা-যাওয়া করে ও তাতে তারা পাপ থেকে মুক্তি পায়। এই চার রকম লোকই জ্ঞানীর কৃপায় রক্ষা পায়,'' ভগবান বললেন।

কেউ একজন বললে, ''আপনি বললেন পাপীরা পাপ থেকে মুক্ত হবে। সেটা কী অন্যদের কথা শুনে কিংবা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে?'' ভগবান বললেন, ''অন্যেরা যা বলে তাই শুনে। তারা পাপী, তাই না? তবে আর তারা ভাল লোকের সম্বন্ধে কথা কইবে কী

করে?'' গতকালের প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞাসা করলে, ''আপনি বলছেন পাপীরা মুক্তি পাবে। তার অর্থ কি তাদের শারীরিক ও মানসিক কষ্ট দূর হবে?'' ''কেবল মানসিক কষ্ট'', ভগবান উত্তর দিলেন, ''মন ঠিক থাকলেই সুখ লাভ সম্ভব। মন ঠিক না থাকলে যতই যাই হোক শান্তি হয় না। প্রত্যেকের অধিকার অনুসারে মনের পক্কতা হয়। একজন নাস্তিক বিশ্বাসী হয় একজন বিশ্বাসী ভক্ত হয় একজন ভক্ত জিজ্ঞাসু হয় আর জিজ্ঞাসু জ্ঞানী হয়। এ সবই মনের সম্বন্ধে বলা হয়। শরীর সম্বন্ধে এ সব বলে কী লাভ? মনে শান্তি থাকলেই কেবল শরীরে নয় জগৎ-সংসারেও শান্তি হয়। সুতরাং কী করে নিজে শান্তিতে থাকা যায় তার উপায় খোঁজা উচিত। আত্মানুসন্ধানের দ্বারা আত্মাকে জানা ছাড়া এটা হয় না। এটা না ক'রে জগৎ উদ্ধারের চেষ্টা করা ঠিক যেন চলার সময়ে কাঁটা-খোঁচার আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিজের পায়ে জুতা না পরে সমস্ত জগৎকে চামড়া দিয়ে ঢেকে দেওয়ার মতলব করা। নিজের মাথায় ছাতা ধরলেই রৌদ্র হতে রক্ষা পাওয়া যায়, সমস্ত জগৎ জুড়ে চাঁদোয়া খাটিয়ে রৌদ্র বাঁচানো কি সম্ভব? যদি মানুষ নিজের অবস্থা বোঝে ও নিজের আত্মায় থাকে তবে যা হওয়ার হবে। জগতে যে শক্তি আছে, সেটা একটাই। এ সব দুশ্চিন্তা কেবল নিজেকে সেই শক্তি থেকে পৃথক বলে জানার জন্য হয়।''

* * *

18ই মে, 1947

(117) স্বপ্নে সিংহ দেখা

আজ অপরাহ্ন প্রায় তিনটার সময়ে প্রশ্নাবলী শুরু হল। ''ব্রহ্মকে 'সচ্চিদানন্দ স্বরূপ' বলা হয়, তার কী অর্থ?'' একজন বললে। ভগবান উত্তর দিলেন, ''হাঁ। তাই, যা আছে তা কেবল সৎ। তাকেই ব্রহ্ম বলা হয়। সৎ-এর বিচ্ছুরণই চিৎ আর তার স্বরপই আনন্দ। এগুলো সৎ থেকে পৃথক নয়। এই তিনটিকে একসঙ্গে 'সচ্চিদানন্দ' বলা হয়। জীবের গুণের পক্ষে

এটাই সত্ত্ব, ঘোর ও জড়। ঘোরের অর্থ রজোগুণ আর জড় তমোগুণ। এরা সত্ত্বগুণের অংশ, এ দু'টি চলে গেলে যা থাকে তা কেবল সত্ত্ব। যা নিত্য ও বিশুদ্ধ তাই সত্য। একে আত্মা, ব্রহ্ম, শক্তি বা যা ইচ্ছা হয় বলতে পারো। যদি তুমি একে আপন সত্তা বলে জানো তবে সবই জ্যোতির্ময়। সবই আনন্দ।

সেই প্রশ্নকারী বললে, ''ঋষিরা বলেন যে প্রকৃত স্বরূপ জানতে হলে সাধনা, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন শেষ অবধি করে যেতে হবে।'' ভগবান উত্তর দিলেন, ''বাইরে থেকে যা কিছু আসে তাকে দূরে রাখার জন্যই এগুলোর দরকার আর সাধনারও তাই লক্ষ্য আত্মোপলব্ধির জন্য নয়। নিজের আত্মা সবসময়ে সবস্থানে আছে। কেবল বাইরের প্রভাব থেকে মনকে সরিয়ে রাখার জন্যই শ্রবণ ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া হয়, কিন্তু তা না করে যদি এদের প্রাধান্য দেওয়া হয় তবে এরাও আবার 'আমি পণ্ডিত' 'আমি একজন মহাত্মা' ইত্যাদি অহংকার সৃষ্টির কারণ হয়। এটাও একটা বিরাট সংসার। আর পরে এটা ত্যাগ করা খুবই কষ্টকর হয়। একটা বুনো হাতির থেকেও এটা (এই সংসার) মারাত্মক। সহজে দমন হবে না।''

''বলা হয়, সেই বুনো হাতি দমনের জন্য গুরুকটাক্ষ (গুরুকৃপা) যেন তার স্বপ্নে সিংহ দেখা,'' প্রশ্নকারী বললে। ভগবান বললেন, ''তা সত্য! একটা হাতি যদি সিংহের স্বপ্ন দেখে চমকে জেগে ওঠে তবে পাছে আবার স্বপ্নে সিংহ দেখে এই ভয়ে সে আর সেদিন ঘুমায় না। অনুরূপভাবে মানুষের জীবনে যেটা স্বপ্নেরই সমপর্যায়, কেবল গুরুকটাক্ষ নয়, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ইত্যাদি সবই স্বপ্নে সিংহ দেখার মত। এরূপ স্বপ্ন দেখতে থাকলে তারা জেগে ওঠে আর আবার শুয়ে পড়ে, কালপ্রবাহে কোন একদিন হয়ত নিদারুণ ভাবে গুরুকটাক্ষরূপ সিংহের স্বপ্ন দেখে ফেলে। তারা চমকে ওঠে আর জ্ঞান লাভ করে। তারপর আর স্বপ্ন নেই এবং তারা যে কেবল সর্বদাই সজাগ থাকে তা নয় উপরন্তু জীবনের আর কোন স্বপ্নকে প্রশ্রয় না দিয়ে যতক্ষণ না প্রকৃত স্থায়ী জ্ঞান লাভ হচ্ছে তার জন্য সদাসতর্ক থাকে। এই সিংহের স্বপ্ন অনুভব করতেই হবে, এটা অপরিহার্য।''

সে একটু অবাক হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলে, ''শ্রবণ ইত্যাদি ও গুরুকটাক্ষ কি স্বপ্নের মত?'' ভগবান বললেন, ''হাঁ, তাইতো। যারা সত্য উপলব্ধি করে তাদের পক্ষে সবই স্বপ্ন। তাই যদি হয়, তবে এখন তুমি বল, সত্য কী? ঘুমের সময়ে তোমার শরীরের ওপর কোনো জোর থাকে না, তুমি কত শরীর ধারণ ক'রে কত জায়গায় ঘুরে বেড়াও। কত কী করে বেড়াও। তখন সে সব সত্য মনে হয়। তুমি যেন নিজেই কর্তা ভেবে সব কিছু করে বেড়াও। ঘুম থেকে জাগলেই তুমি বুঝতে পারো যে তুমি ভেঙ্কিয়া (উচ্চ জাতি) কিংবা পুলিয়া (নিম্ন জাতি) আর যা স্বপ্নে দেখেছ তা মিথ্যা, সেটা কেবল স্বপ্ন মাত্র। শুধু এই নয়। কোনদিন হয়ত পেটভরে লাড্ডু ও জিলাপি খেয়ে শুয়েছ, ঘুমে স্বপ্নে দেখছ যে কত জায়গায় ঘুরছ, কিছু খেতে পাচ্ছ না, অনাহারে মৃতপ্রায় অবস্থা। চমকে জেগে উঠে দেখলে, ঢেঁকুর তুলছ। তখন বোঝো যে এটা একটা স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্নে কি তোমার ভারী খাওয়ার কথা মনে ছিল? আর একজন হয়ত উপবাস ক'রে শুতে গেল, সে হয়ত স্বপ্নে লাড্ডু ও জিলাপির খুব ভোজ খেল। সে কি সে সময়ে মনে করতে পারে যে, সে উপবাস ক'রে শুয়েছে? না, সে জেগে উঠে দেখে যে, সে ভীষণ ক্ষুধার্ত। সে ভাবে, 'হে ঈশ্বর! এ সব মায়া, একটা স্বপ্ন।' ব্যস্! তুমি জাগ্রতে ছিলে, স্বপ্নে ছিলে, আবার সুপ্তিতেও ছিলে। যখন তুমি তোমার যে অবস্থাটা সব সময়ে আছে, তাকে জানবে, তখন বুঝবে যে বাকি সব একটা স্বপ্ন। যখন এটা জানা হয় তখন গুরু যে তোমার থেকে পৃথক এ বোধটাও চলে যাবে। তা সত্ত্বেও, যেহেতু এই অনুভূতি গুরুকটাক্ষ দ্বারাই হয় তাই একে সিংহের স্বপ্ন দেখার সঙ্গে তুলনা করা হয়। সে স্বপ্ন তীব্র হওয়া চাই আর মনে গভীরভাবে রেখাপাতও করা চাই। তবেই প্রকৃত জাগরণ আসবে। তারজন্য সময় হওয়া চাই। যদি কঠোরভাবে সাধনা ক'রে যাওয়া যায় তবে কোনো না কোনো সময়ে এই সুফল লাভ হবে। ব্যস্।'' এই বলে ভগবান গম্ভীর হলেন।

ঘড়িতে চারটা বাজল। ঘরে এতক্ষণ যারা ভগবানের আধ্যাত্মিক আলোচনা তন্ময় হয়ে শুনছিল তাদের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল। ভগবানের

কণ্ঠস্বর কানে বাজতে লাগল। আমার এ জীবনে কি সিংহের স্বপ্নরূপ গুরুকটাক্ষ লাভ হবে আর মনে তীব্রভাবে রেখাপাত করবে, ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরলাম।

* * *

19শে মে, 1947

(118) কোথায় রাজা, কোথায় রাজত্ব?

আজ অপরাহ্নে প্রাচীন 'শঙ্কর বিজয়ম্' সম্বন্ধে আলাপ- আলোচনায় ভগবান একজন ভক্তকে জিজ্ঞাসা করলেন যে শঙ্করের জীবনী গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিদ্যারণ্যের 'শঙ্কর বিজয়ম্' বইটি কি সব থেকে ভাল নয়? ভক্ত বললে, ''তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন তাই তাঁর বই প্রামাণিক বলে মনে করা হয়।'' ভগবান হেসে বললেন, ''হাঁ, তাঁর ধীশক্তি খুব প্রখর ছিল। দেখ, তিনি 'শ্রীবিদ্যার' উপাসক ছিলেন, সেজন্য 'শ্রীচক্রে'র অনুরূপ একটা নগর তৈরি করবেন বলে ঠিক ক'রে হাম্পি তৈরি করতে শুরু করেন কিন্তু শেষ করতে পারেন নি। তাই বলেছিলেন যে ভবিষ্যতে একজন মহারাজা এই দেশে রাজত্ব করবেন আর শ্রীচক্রের অনুরূপ নগর তৈরি করবেন। পাহাড়ে থাকতে একথা নায়নাকে বলাতে নায়না এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা করলে- 'শ্রীশঙ্করের 'অরুণাচল অষ্টকে' 'শ্রীচক্রাকৃতি শোণশৈল বপুষম, শ্রীষোড়শার্ণাত্মকম্' পদটি আছে। এ ছাড়া অরুণাচল পুরাণে বলা হয়েছে যে এই পাহাড়টি শ্রীচক্রের অনুরূপ। সুতরাং আমরা না খুঁজেই ভাগ্যক্রমে শ্রীচক্রের মত স্থান পেয়ে গেছি। ভগবানই চক্রবর্তী (সম্রাট)। পাহাড়ের চারিদিকে দশটা বাড়ি করলেই একটা সাম্রাজ্য হয়ে যাবে। শঙ্কর নিশ্চয়ই এই ভেবেই লিখেছিলেন।' সে এইভাবে বলে যেতে লাগল আর সব কর্ম-পরিষদ সাজিয়ে ফেললে, 'ইনি সেনাপতি, উনি কোষাধ্যক্ষ ইনি এই, উনি ওই।' সে থাকলে খুব তামাশা হত। সবাই একসঙ্গে বসত আর বলত, 'আজ আমাদের দরবারে কী জলখাবার?' তারপর একটা

কর্মসূচী তৈরি করে রান্না ক'রে খেত। তারা এমন হাবভাব দেখাত যেন রাজত্ব চালাচ্ছে। এই সুন্দরেশন্ আর কল্যানম্ কি তখন এরকম ছিল? ও! তারা প্রত্যেকেই কর্মঠ ও সুর্তিবাজ ছিল। তারা মনে করত সবাই বড় বড় বীরপুরুষ।''

শিবানন্দ জিজ্ঞাসা করলে, ''এ সব কখন হয়েছিল?'' ভগবান বললেন, ''বিরূপাক্ষ গুহায় থাকতে। নায়না নগরের একটা নক্শাও কাগজে এঁকে ফেলেছিল, সেই নক্শায় আমারও একটা বিশেষ স্থান ছিল। তারপর রাজত্ব চালাবার কত ব্যবস্থা করত। রাজাও নেই রাজত্বও নেই, পরিকল্পনা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। এরকম কত পরিকল্পনা হল। রাজা-ই বা কোথায়? রাজত্ব-ই বা কোথায়?'' নায়নার একজন শিষ্য সুব্রারাও বললে, ''কেন, রাজা নেই কেন? তিনি তো সামনেই বসে আছেন, কেবল তিনি কৌপীন পরেন এই যা। অভাবটা কিসের? পাহাড়ের চারিপাশে কি বাড়ি হয়নি? যেখানে ভগবান বসেন সেটা কি রাজপুরী নয়? এখানে রাজপ্রাসাদের মতই সব কর্মসূচী হয়ে যাচ্ছে। কেবল যা অন্য রাজ্যের থেকে একটু তফাত এই তো!''

''সে তো ঠিক কথা। নায়নাও বলত যে মহারাজা ও মহাজ্ঞানীর একই মর্যাদা। যখন জ্যোতিষীরা বিচার ক'রে বললে যে তথাগত হয় সম্রাট কিংবা জ্ঞান ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন সন্ন্যাসী হবে তখন তার বাবা তাকে কোথাও যেতে না দিয়ে প্রাসাদ রেখে, আমোদ-প্রমোদে মাতিয়ে রাখার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। শেষে বুদ্ধ কোন একটা ছলে বাইরে গিয়ে সংসারের দুঃখ-দুর্দশা দেখলেন আর পালিয়ে সন্ন্যাস নিলেন। দু'টি সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি, বস্তুতান্ত্রিক বা আধ্যাত্মিক'', ভগবান বললেন।

* * *

21শে মে, 1947

(119) নিদিধ্যাসন (গভীর ধ্যান)

গতকাল সকাল প্রায় ৪টার সময়ে আর্য বিজ্ঞান সংঘের কর্মী ও ভগবানের ভক্ত ডঃ সৈয়দ ভগবানের দর্শনের জন্য এসে বললে, ''ভগবান বলেন যে সমস্ত সংসার আত্মার স্বরূপ। তা যদি হয় তবে সংসারে এত কষ্ট রয়েছে কেন ?''

ভগবান বেশ খুশি হয়ে উত্তর দিলেন, ''এটাই তো মায়া। 'বেদান্ত চিন্তামণি'তে মায়াকে পাঁচভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিজগুণ যোগী নামে একজন কানাড়া ভাষায় বইটা লেখে। এই বইতে বেদান্ত এত ভালভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে একে বেদান্ত পরিভাষার প্রামাণিক গ্রন্থ বলা যায়। একটা তামিল অনুবাদও আছে। মায়ার পাঁচটি নাম যথা তমঃ, মায়া, মোহ, অবিদ্যা ও অনিত্য। যা জীবনের জ্ঞানকে গুপ্ত রাখে তাই তমঃ। যে জগতের রূপকে অন্যভাবে দেখায় সে মায়া। মোহ, যা অন্য বস্তুকে সত্য বলে দেখায়- 'শুক্তি রজত ভ্রান্তি', ঝিনুককে রূপার মতো দেখানো। অবিদ্যা যা বিদ্যাকে (জ্ঞান) নষ্ট করে। অনিত্য- যা সত্য ও নিত্য হতে পৃথক, অস্থায়ী। এই পাঁচটি মায়ার জন্য সিনেমার মতো আত্মাতে কষ্টের আরোপ হয়। এই মায়া দূর করার জন্য জগৎকে মিথ্যা বলা হয়। আত্মা একটা পর্দার মতো। যেমন তুমি জেনেছ যে, যে ছবিগুলো দেখানো হয় সেগুলো পর্দার ওপর নির্ভর করে ও পর্দা ছাড়া তাদের অস্তিত্ব থাকে না ঠিক তেমনি যতক্ষণ না আত্মানুসন্ধানের দ্বারা জগৎকে আত্মার সঙ্গে এক বোধ হচ্ছে ততক্ষণ একে মিথ্যা বলতেই হবে। কিন্তু একবার প্রকৃত সত্তা জানা হলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেবল আত্মা বলেই বোধ হবে। এজন্য যারা জগৎ মিথ্যা বলেছিল তারাই আবার জগৎকে আত্মস্বরূপ বলে। যাইহোক দৃষ্টিভঙ্গিই আসল। যদি দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায় তবে সংসারের দুঃখের জন্য দুশ্চিন্তা হবে না। ঢেউগুলো কি সমুদ্র থেকে পৃথক? ঢেউগুলো ওঠে কেন? প্রশ্ন হলে, আমরা কী উত্তর দিতে পারি? সংসারের দুঃখকষ্টও

সেরূপ। ঢেউ আসে আর যায়। যদি সেগুলো আত্মা ছাড়া ভিন্ন নয় বোঝা যায় তবে এই দুশ্চিন্তাও থাকবে না।''

সেই ভক্ত অনুযোগের সুরে বললে, ''ভগবান যতই বলুন, আমরা বুঝতে পারি না।'' ভগবান বললেন, ''সবাই বলে যে সর্বব্যাপক আত্মাকে তারা বুঝতে পারে না। আমি কী করতে পারি? একটি শিশুও বলে, 'আমি রয়েছি, আমি করি আর এটা আমার।' সুতরাং সকলেই জানে যে 'আমিটা' সর্বদাই রয়েছে। এই 'আমিটা' থাকলেই তো তুমি একটা শরীর ও 'সে ভেনকান্না' 'এ রমণ' আর সব কিছু বোধ হয়। যা নিজের আত্মা, সব সময়ে দেখা যাচ্ছে, তাকে জানার জন্য কি একটা আলো নিয়ে খুঁজতে হয়? যা পৃথক নয়, নিজেরই আত্মা, সেই আত্মস্বরূপকে জানি না বলা ঠিক যেন 'আমি আমাকে জানি না' বলা।''

ভক্ত বললে, ''তার অর্থ, যারা শ্রবণ ও মননের দ্বারা জ্ঞান লাভ করেছে আর সমস্ত জগতকে মায়া বলে দেখে তারা অবশেষে নিদিধ্যাসনে প্রকৃত স্বরূপ খুঁজে পাবে।''

''হাঁ, ঠিক তাই। 'নিদি'র অর্থ স্বরূপ, নিদিধ্যাসনের তাৎপর্য গুরু বাক্য শ্রবণ ও মননের দ্বারা গভীরভাবে স্বরূপে একাগ্র হওয়া। তার অর্থ আকুতির সহিত অটলভাবে তার ধ্যান করা। এভাবে বহুদিন ধ্যান হলে সে তাতেই মিশে যায়। তখন এটা (স্বরূপ) স্ব-প্রকাশ হয়। সেটা সব সময়ে আছে। সেটা যেমন ভাবে আছে তাকে যদি ঠিক সেইভাবে দেখতে পারে তবে এরকম কোন দুর্ভাবনা হয় না। নিজের সত্তা যা সব সময়ে রয়েছে তাকে দেখার জন্য এত প্রশ্ন কিসের?'' ভগবান বললেন।

* * *

23শে মে, 1947

(120) অজপাতত্ত্ব

আজ সকলে ৪টার সময়ে একজন গৈরিকধারী ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলে, ''স্বামী! মন দমনের জন্য অজপা মন্ত্র বা ওঁকার জপের মধ্যে কোনটা ভাল? কোনটা বেশি কার্যকরী আমায় দয়া করে বলুন?'' ভগবান উত্তর দিলেন, ''অজপা বলতে তুমি কী বোঝো? তুমি যদি মুখে 'সোহহম্' 'সোহহম্' বল সেটা কি অজপা হয়? মুখে উচ্চারণ না ক'রে যে জপ আপনা হতে হয়ে চলেছে তাকে জানাই 'অজপা' জপ। এই জপের প্রকৃত অর্থ না জেনে, লোকে মনে করে যে এটা হাতে কিংবা মালায় সংখ্যা রেখে মুখে একলক্ষ 'সোহহম্' 'সোহহম্' জপ করা। জপের আগে 'প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ' করার বিধি আছে। তার অর্থ আগে প্রাণায়াম করো তারপর জপ আরম্ভ করো। প্রাণায়ামের অর্থ প্রথমে মুখ বন্ধ করা, তাই না? নিঃশ্বাস বন্ধ করলে পঞ্চভূত রুদ্ধ ও সংযত হয়, তখন যা থাকে তাই আত্মা। আত্মা সর্বদা নিজেই 'অহম্' 'অহম্' জপ করে চলেছে। এটাই অজপা। এই অবস্থাটা জানাই অজপা। যা মুখে জপ করা হয় তা কী করে অজপা হয়? স্বতঃসূর্তভাবে নিরবচ্ছিন্ন আজ্য (ঘি) ধারার মতো যে প্রকৃত আত্মা অখণ্ড জপ করে চলেছে, তাকে দর্শন করাই অজপা, গায়ত্রী আর যা কিছু। উপনয়নের সময়ে অঙ্গন্যাস, করন্যাস ইত্যাদির দ্বারা শ্বাস সংযম ক'রে প্রাণায়াম শেখানো হয়। আর অন্যান্য বিধির দ্বারাও তাদের অজপা বুঝতে বলা হয়। এসব না ভেবে লোকে অজপার কথা বলে। ওঁকার সম্বন্ধেও তাই। ওঁ সর্বব্যাপী ও স্বয়ং সম্পূর্ণ। মুখে সেই অক্ষর উচ্চারণ ক'রে কি জপ করা যায়? সূত্র সব সময়ে আছে 'ওমিত্যেক্ষরম্ ব্রহ্ম, অদ্বিতীয়ম্ সনাতনম্'। মূলবস্তু না বুঝে কোথায় কত সংখ্যক নাম জপ করতে হবে তার জন্য বড় বড় বই লেখা হয়েছে যেমন গণপতির জন্য মূলাধারে এত হাজার আর অন্যান্য চক্রের জন্য এত হাজার, ব্রহ্মার জন্য এত, বিষ্ণু ও সদাশিবের জন্য এত ইত্যাদি। তুমি যদি কে জপ করছে জানতে পারো তবে জপ কী

তাও বুঝতে পারবে। তুমি যদি যে জপ করছে তাকে খোঁজো আর পেয়ে যাও তবে সেই জপই আত্মা হয়ে যাবে।''

আর একজন বললে, ''তবে কি মুখে জপ করার কোন ফল নেই?'' ''কে বললে নেই? সেটা চিত্ত শুদ্ধির জন্য। জপ করতে করতে অভ্যাসের পরিপক্কতা হয় আর আজ হোক কিংবা দশদিন পরে হোক ঠিক পথে নিয়ে যায়। ভাল বা মন্দ যাই করো কিছুই নষ্ট হয় না। কেবল ব্যক্তি বিশেষের উন্নতির অবস্থানুযায়ী বিশেষ পার্থক্য এবং তার উপকারিতা ও অপকারিতা বলা হয়,'' ভগবান বললেন। এ বিষয়ে তাঁর 'উপদেশ সারই' প্রমাণ।

* * *

28শে মে, 1947

(121) গোপনতা কেন?

প্রায়ই এমন হয় যে ভগবানের সামনে ফল মিষ্টি আনা হয় আর তাঁকে দেওয়া হয় কখনো খাবার সময়ে তাঁর পাতায় পরিবেশন করা হয় আবার কখনো হলঘরে সকলের সামনে তাঁকে খেতেও বলা হয়। নিবেদনকারী যদি নবাগত হয় তবে ঠিক আছে যদি পুরাতন ভক্ত হয়, ভগবান মন্তব্য করেন, ''আর কী করার আছে? নৈবেদ্য হয়ে গেল। কর্পূর আরতি হবে নাকি? কিংবা যখন খেতে বলা হবে তখন না খেলে আর যা করতে বলা হবে, না করলে বোধহয় স্বামীত্ব (সাধুগিরি) চলে যাবে?'' তারা যদি আশ্রমিক হয় তবে নরম বকুনিও দেন, ''যে কাজের জন্য এখানে এসেছ তার বদলে এসব কেন?'' বোধহয় এক বছর আগে আমি একদিন জোয়ার ভেজে সকালে জলখাবারের সময় নিয়ে গিয়ে রান্নাঘরের লোকেদের কিছু না বলে দিয়েছিলাম। তাতে কী হল? হলঘরে যাওয়া মাত্র ভগবান অভিযোগ করলেন, ''আমি সব রকম খাবার খেয়েছি। নিজের কাজ বাড়াও কেন?'' সেই থেকে বাড়ির তৈরি কোন কিছু আর আশ্রমে দিই না। সম্প্রতি যখন তুমি মেওয়া ইত্যাদি পাঠালে, পাছে সবার সামনে হলঘরে দিলে

ভগবান কিছু বলেন সেই ভয়ে আমি চুপি চুপি ভগবানের সেবকদের দিয়ে দিয়েছিলাম। তারাও সময় বুঝে ভগবানকে দিয়েছিল। সে সময়ে তিনি কিছু বলেন নি কিন্তু চার পাঁচদিন পরে কী হল জানো ? আমি অপরাহ্ন আড়াইটার সময়ে আশ্রমে গিয়েছিলাম। তখন ভগবানের কাছে সেবকেরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। কাঠবিড়ালেরা সোফার ওপর ছুটাছুটি করছে, তার অর্থ খাবার চাইছে। ভগবান একটা টিন খুলে বললেন, ''যাঃ, কিচ্ছু নেই,'' আর আমার দিকে চেয়ে বললেন, ''কাজুবাদাম ফুরিয়ে গেছে, এরা আবার চিনাবাদাম খায় না। আমি এখন কী করি?'' আমি সেবকদের দিকে জিজ্ঞাসু হয়ে চাইলাম। তারা বললে ভাঁড়ারেও কাজুবাদাম নেই। কাঠবিড়ালেরা বিরক্ত করা ছাড়লে না। আমায় একটা কিছু করতে হয়। আবার এও ভাবলাম যে বাজার থেকে কিছু আনালে ভগবান যদি রাগ করেন।

সন্ধ্যাবেলা একজন শহরে যাচ্ছিল, আমি তাকে দশপালি কাজুবাদাম আনার জন্য টাকা দিলাম। যাকে বাদাম আনতে দিয়েছিলাম সে আমায় সেদিন সেটা না দিয়ে পরের দিন সকালে 9টায় দিলে। ভগবানের সামনে দিলে পাছে তিনি কিছু বলেন তাই 9টা 45 মিনিটে তিনি বাইরে গেলে, সেবক কৃষ্ণস্বামীর হাতে মোড়কটা দিলাম। দুপুরে কী হয়েছে জানি না। আড়াইটার সময়ে আশ্রমে গিয়ে 4টা অবধি ছিলাম, এসব কথা কিছু উঠল না। খুব বেঁচে গেছি ভেবে বাড়ি এলাম। আবার সন্ধ্যা 6টার সময়ে ফিরে গিয়ে হলঘরে একটু দূরে বসলাম। বেদপারায়ণ হয়ে গেছে। আমি যে কাজুবাদাম দিয়েছিলাম কৃষ্ণস্বামী সেগুলো একটা টিনের কৌটায় ঢাললে। ভগবান দেখলেন আর জিজ্ঞাসা করলেন যে, কে দিয়েছে। সে বললে, ''নাগম্মা'', ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ''কখন?'' ''আজ সকালে ভগবান যখন বাইরে গিয়েছিলেন, তখন,'' সেবক বললে।

''তাই নাকি? আমার সামনে নয় কেন? এ গোপনতা কেন? মনে হচ্ছে, পাছে ভগবান রাগ করেন, তাই ভয় পেয়েছে। এসব ছেলেমানুষি এখনও গেল না। বোধহয় তার দেখাদেখি শুভলক্ষ্মীও একটু আগে

কাজুবাদাম এনে চুপি চুপি জানলা গলিয়ে সত্যানন্দকে দিয়ে চলে গেল। তার ওপর আবার ওজর দেখালে যে অথৈ (ভগবানের বোন) দিতে বলেছে। সে অথৈ–এর ওপর দোষটা চাপালে, ভেবেছে, তাহলে আমি আর কিছু বলব না। এখানের এদের এ সব ছেলেমানুষি। যার জন্য এখানে এসেছে তাতে না লেগে থেকে এসব করে বেড়ায় কেন? তারা ভেবেছে স্বামীকে ঠকাবে। তারা জানে না যে নিজেরাই ঠকবে। এতবছর এখানে থেকেও এই দুর্বলতা গেল না এরই জন্য কি তারা এখানে এসেছে?'' ভগবান বজ্র গম্ভীর স্বরে বললেন।

আমি বসেছিলাম, পাথর হয়ে গেলাম। আমি শুভলদাম্মাকে কিছু বলিনি আর সে যে কাজু দিয়েছে তাও জানতাম না। সে কথা বলার জন্য আমি মুখ খুলতে সাহস করলাম না। যাই হোক, আমি যে কাজের জন্য এসেছি সেটা আবার মনে করিয়ে দেওয়া হল। ভাবলাম, সিংহের স্বপ্ন, যাকে গুরুকটাক্ষ বলা হয়, সেটা বোধহয় এমনি হয়। ঘড়িতে আধঘন্টা বাজল। চমকে উঠে চেয়ে দেখি সাড়ে ছ'টা। মেয়েদের আশ্রম ছেড়ে চলে যাওয়ার সময়, তারা একে একে চলে যাচ্ছে। কোন রকমে উঠলাম আর প্রণাম করলাম। তিনি আমার দিকে বিরক্তি ও সহানুভূতি মেশানো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। সেই মহান ব্যক্তিত্বের দিকে মুখ তুলে চাইতে পারলাম না, বাড়ি এসে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙ্গল, বেশ আলো হয়ে গেছে। আমি বুঝলাম যে বকুনিটা আসলে উপদেশ, এটা কাজুবাদামের জন্য নয় কিন্তু যে কাজের জন্য অর্থাৎ জ্ঞানলাভের জন্য আশ্রমে এসেছি সেকথা ভুলে যাওয়ার জন্য বকুনিটা দেওয়া হয়েছিল। এরকম হয়তো অনেক সময়ে ভুল হয়ে যায়, সেজন্য মনে মনে ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম।

সূর্যোদয়ের আগে উঠে তাড়াতাড়ি সকালের কাজ সেরে আশ্রমে গেলাম। ঘরে প্রবেশ করতেই ভগবান হাস্যোজ্জ্বল মুখে আমার ব্যাপারটার খোঁজ নিলেন। তখন পরিষ্কার হল যে আমি শুভলদাম্মাকে বলিনি আর

আলামেলু অথৈ নিজেই তাঁর স্বামীর ষষ্ঠীঅব্দপূর্তি দিবস উপলক্ষে উদ্‌বৃত্ত কাজুবাদাম কাঠবিড়ালদের জন্য শুভলদাম্মাকে দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। ''তাই নাকি! ঘটনা এখন অন্য রকম হল। তাহলেও লুকোচুরি কেন? যাহোক, সব মিটে গেছে'', বলে ভগবান কথা ঘোরালেন আর সান্ত্বনার ভাষায় ঘটনাটা চাপা দিলেন। কিন্তু আমি আজ অবধি সেটা ভুলতে পারিনি।

আশয়া বধ্যতে লোকো কর্মণা বহু চিন্তয়া।
আয়ুক্ষীণং ন জানাতি তস্মাৎ জাগ্রত জাগ্রত॥

''আশায় বদ্ধ হয়ে, কর্মে ও নানা চিন্তায় প্রতিদিন আয়ু হয় ক্ষীণ, এ কারণে জাগো! জাগো!''

এই প্রাচীনবাক্য মনে রাখা উচিত। আমার পক্ষে, সময় কত দ্রুত চলে যায় তা না ভেবে এ মেয়েটি বাজে কাজে সময় নষ্ট করছে ভেবে, ভগবান যে ভাবে আমার দিকে চাইলেন ও যা বললেন, আমার হৃদয়ে গাঁথা হয়ে রইল। দাদা, এই ঘটনার প্রকৃত তত্ত্ব আমি কী করে লিখব! যাই হোক, ভগবান জ্ঞানদাতা।

* * *

5ই জুন, 1947

(122) কৃতি সমর্পণ- বই উৎসর্গ

গত পরশু রাত্রে মাদ্রাজে তোমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গতকাল সকালে আশ্রমে এসে পৌঁছেছি। যদিও মাত্র চারদিন আশ্রমে ছিলাম না, মনে হচ্ছে যেন চার যুগ। সুতরাং স্টেশন থেকে সোজা আশ্রমে গেলাম। ভগবান সকালের জলখাবার খাচ্ছিলেন। প্রণাম করে উঠলে তিনি বললেন, ''ফিরে এসেছ? এত তাড়াতাড়ি?'' আমি বললাম, ''হাঁ'' আরও বললাম, ''দশখানা 'লেখলু' তৈরি হয়ে গেছে, সঙ্গে নিয়ে এসেছি,

বাকিগুলো ছাপাখানা সরাসরি আশ্রমে পাঠাবে।'' ভগবান উদাসীন ভাবে ''বেশ'' বললেন।

স্নান ক'রে বই-এর মোড়কটা নিয়ে আশ্রমের অফিসে গেলাম, কিন্তুসর্বাধিকারী ছিলেন না। সুতরাং একবার ভগবানকে দেখিয়ে তারপর সেগুলো অফিসে ফিরিয়ে নিয়ে আসব ভেবে হলঘরে গেলাম। আমি বই দেওয়ার জন্য নিয়মানুসারে প্রথমে অফিসেই গিয়েছিলাম, কিন্তু প্রথমে ভগবানকে দেওয়ার ইচ্ছাটা মনে বেশ প্রবলভাবেই ছিল। সে যা হোক, সর্বাধিকারীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে, আমি প্রথমে হলে গেলাম। ভগবান খবরের কাগজ পড়ছিলেন। মনে হল আমায় দেখতে পেলেন না। তাঁর হাতে বই দিতে সঙ্কোচ হওয়ায় নিকটের একটা টুলের ওপর সেগুলো রাখলাম। বই উৎসর্গ করার সময়ে যাঁকে উৎসর্গ করা হয় তাঁকে ফল, ফুল ও লেখকের সাধ্যমত উপহার দেওয়ার প্রথা আছে। কিন্তু প্রবাদটা জানো তো ''বিরাট পর্বত-প্রমাণ দেবতার কাছে পাহাড়- প্রমাণ ফুল ইত্যাদি কি দেওয়া যায়?'' আমরা কী দিয়ে ভগবানকে পূজা করতে পারি? সত্ত্বেও যদি প্রচলিত রীতি অনুসারে পত্র, পুষ্প, ফলম্, তোয়ম্ দিতে চাইতাম তবে সম্প্রতি যেমন আমায় বকেছেন সেরূপ বকুনি খাওয়ার ভয় ছিল সুতরাং কেবল হাত জোড় ক'রে প্রণাম করলাম। একটা কী সুন্দর ঘটনা ঘটল জানো? আমি যখন মাথা নিচু ক'রে প্রণাম করছিলাম তখন একজন ভক্ত একদল ব্রাহ্মণের সঙ্গে এসে, থালা ভরা ফুল, ফল, ধূপ, পান-সুপারি ইত্যাদি নিয়ে বইগুলোর পাশে রাখলে। প্রণাম সেরে এই ঘটনার সমাবেশ দেখে অত্যন্ত আনন্দ হল। তারা সবাই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে 'ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন' দিয়ে আরম্ভ ক'রে বেদপাঠ করতে লাগল। পাঠ শেষ হয়ে গেলে সবাই প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ালাম। কৃষ্ণস্বামী তাদের প্রসাদ দিয়ে বিদায় দিলে। ভগবান কাগজটা রেখে ধীরে সুস্থে বললেন, ''ওর বোধহয় আজ ষষ্ঠীঅব্দপূর্তি দিবস।'' ''তাই নাকি?'' আমি বলি। সে যাহোক, যদিও আমি কিছু আনিনি তথাপি অভাবিত রূপে অন্য একজন ফুল-ফল এনে সেটা পূরণ করে দিলে সেজন্য আমি আনন্দিত হলাম।

কৃষ্ণস্বামী বইগুলো সেখানেই রেখে দিলে। সুতরাং আমি সেগুলো ভগবানের হাতে দিলাম। এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে দেখে ভগবান বললেন, ''অফিসে দাও, অফিসের সীলমোহর হলে, আসুক।'' আমি একটা বই খুলে ভগবানকে দেখালাম যে তাঁর ছবির তলায় ছাপাখানা নাম দিতে ভুলে গেছে। ''ও! একটা ভুল হয়েছে। কিছু এসে যায় না। নাম রূপে মিশে গেছে। অফিসে দাও'', ভগবান বললেন। আমি অফিসে গিয়ে সেগুলো সর্বাধিকারী শ্রীনিরঞ্জনানন্দ স্বামীর হাতে দিয়ে এলাম। 9টার পর মৌনস্বামী দু'খানা বই এনে ভগবানকে দিলে। ভগবান দেখে, একখানা তাঁর ও অন্যখানা নাগম্মার কি না জিজ্ঞাসা ক'রে, নিকটের একজন ভক্তকে বললেন, ''ওকে এই বইটা দাও তো। ও লিখেছে আর ওর ভাই ছাপিয়েছে। ও নিজেই নিয়ে এসেছে আর আমাদের কয়েকখানা দিয়েছে, তাই থেকে আমরা ওকে একখানা দিচ্ছি। এটা ঠিক যেন সেই গুড়ের পিল্লাইয়ার (গণেশ) মূর্তি তৈরি করে পূজার শেষে এক টুকরো খুঁটে নিয়ে তাকেই নৈবেদ্য অর্পণ করা হল। আমাদের যখন ফল এনে উপহার দেওয়া হয় আমরা কি তখন প্রসাদ দিই না?''

* * *

20শে জুন, 1947

(123) করতল ভিক্ষা

চার পাঁচ দিন আগে মাধবস্বামীর একটা খাতা পাওয়া গেল। সেটা দেখতে গিয়ে ভগবান অনেক দিন আগে তাঁর লেখা একটা তামিল কবিতা পেলেন। সেটা মালয়ালাম লিপিতে লেখা ছিল, তিনি সেটা তামিলে লিপ্যান্তর করতে করতে আমাদের তার অর্থ বললেন, ''মানুষের যখন জ্ঞান হয় তখন তার আর শরীরের ওপর কোন আসক্তি থাকে না। যেমন খাওয়া হয়ে গেলে, পাতাটা যতই ভাল হোক তাকে ফেলে দেওয়া হয়

তেমনি জ্ঞান লাভ হয়ে গেলে, সে কখন শরীর ত্যাগ হবে তার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে। কবিতার সারার্থ এই।''

একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করলে, ''ভগবান এটা কী জন্য লিখেছিলেন?'' ভগবান বললেন, '''প্রভুলিঙ্গ-লীলা' নামে একটা বই-এ এই ভাবের একটা চার পঙ্‌ক্তির কবিতা ছিল, সেটা দেখে ভাবলাম যে দুই পঙ্‌ক্তির হলে ভাল হয়।'' তারপর সেটা তামিলে লেখা হয়ে গেলে আমাদের বলতে লাগলেন, ''এঁটো পাতার উদাহরণ অনেকেই দিয়েছেন। যত ভাল ক'রেই পাতা সেলাই করা হোক না কেন তার প্রয়োজন খাওয়া অবধি। তারপর কি কেউ আর তার খোঁজ করে? সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দেওয়া হয়। বড় লোকেরা সোনার কাজ করা রুপার থালায় খায়। ঈশ্বরের দেওয়া হাত থাকতে এসব কী দরকার? পাহাড়ে থাকতে কেউ একজন রুপার খাওয়ার পাতা তৈরি করিয়ে আমায় তাতে খেতে অনুরোধ করে। আমি দরকার নেই বলে ফেরত পাঠিয়ে দিলাম। হাতেই যদি খাওয়া যায় তবে সোনা-রুপায় কী দরকার? অনেক দিন অবধি আমি বসে পাতায় খাইনি। কেউ খাবার আনলে, আমি হাত পাততাম, হাতের চেটোয় দিলে খেতাম। কেবল সম্প্রতি পাতায় সাজিয়ে খেতে আরম্ভ করেছি।''

আর একজন বললে, ''এজন্যই কি গণপতি মুনি আপনাকে 'করতামরসেন সুপাত্রবতা' বলে স্তুতি করেছিলেন?'' ভগবান উত্তর দিলেন, ''হাঁ। হাত থাকতে এসব জিনিস কেন? সেসব দিনে একটা অপূর্ব অভিজ্ঞতা হত। যখন ভিক্ষায় যেতাম তখন করতলে ভিক্ষা নিতাম আর খেতে খেতে রাস্তায় চলতাম। খাওয়া হয়ে গেলে হাত চেটে ফেলতাম। কখনো কিছু গ্রাহ্য করতাম না। আমার কারও কাছে কিছু চাইতে লজ্জা ছিল সেজন্য করতল ভিক্ষা খুব মজার হত। হয়তো এদিকে ওদিকে বড় বড় পণ্ডিত, কখনো বড় বড় সরকারি কর্মকর্তা রয়েছে কিন্তু কে থাকল বা না থাকল কী এসে গেল? গরিব লোকেদের ভিক্ষা করতে লজ্জা হতে পারে কিন্তু যে অহংকার জয় ক'রে অদ্বৈত হয়েছে তার পক্ষে এটা একটা

মহামুক্তি। সে সময়ে একজন রাজ-চক্রবর্তী এলেও সে গ্রাহ্য করে না। এইভাবে যখন ভিক্ষায় গিয়ে হাততালি দিতাম, লোকে বলত, 'স্বামী, এসেছেন' আর সম্ভ্রম ও ভক্তির সহিত ভিক্ষা দিত। যারা আমায় চিনত না তার বলত, 'বেশ তো শক্ত-সমর্থ। এরকম ভিখারির মত না ঘুরে কুলির কাজ করো না কেন?' আমার মজা লাগত। আমি মৌন সাধু সুতরাং কথা বলতাম না। মনে মনে হেসে চলে যেতাম, ভাবতাম সাধারণ লোকে তো এরকম বলবেই। যতই লোকে এরূপ বলত আমার ততই আনন্দ হত। সে এক মহা মজা।

'' 'বাশিষ্ঠে' গঙ্গা আনয়নের আগে ভগীরথের সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। তিনি একজন রাজাধিরাজ ছিলেন। কিন্তু তাঁর আত্মজিজ্ঞাসার পক্ষে সাম্রাজ্য একটা বাধা মনে হত। সুতরাং গুরুর উপদেশে যজ্ঞের ছলে তিনি তাঁর ধনসম্পত্তি সব কিছু দান করে দিলেন। সাম্রাজ্য আর কেউ নেয় না। সুতরাং যে শত্রু ও প্রতিবেশী রাজা তাঁর রাজত্ব কেড়ে নেওয়ার সুযোগ খুঁজছিল তাকে সাম্রাজ্য দান করে দিলেন। বাকি রইল দেশ ছাড়া। মাঝরাতে ছদ্মবেশে দেশ ছাড়লেন। দিনের বেলায় পাছে লোকে তাঁকে চিনে ফেলে তাই অন্য দেশে লুকিয়ে থাকতেন আর রাত্রে ভিক্ষা করতেন। শেষে তাঁর মনে হল এবার মনের উন্নতি হয়ে অহংকারশূন্য হয়েছে। তখন নিজের দেশে গিয়ে পথে পথে ভিক্ষা করতে লাগলেন। যখন দেখলেন যে কেউ চিনতে পারলে না তখন একদিন রাজপ্রাসাদে গেলেন। দ্বারের প্রহরীরা তাঁকে চিনতে পেরে প্রণাম ক'রে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে রাজাকে গিয়ে জানালে। রাজাও শশব্যস্তে এসে ভগীরথকে তাঁর রাজত্ব ফিরিয়ে নিতে বললেন, কিন্তু ভগীরথ রাজি হলেন না। তিনি বললেন, 'আপনি আময় ভিক্ষা দেবেন কী না?' উপায়ান্তর না দেখে তারা ভিক্ষা দিলে, ভগীরথ খুব খুশি হয়ে চলে গেলেন। পরে ভগীরথ কোন কারণে অন্য দেশের রাজা হয়েছিলেন ও তাঁর দেশের রাজা মারা গেলে প্রজাদের অনুরোধে নিজের দেশও শাসন করেছিলেন। 'বাশিষ্ঠে' গল্পটি বিস্তারিত ভাবে আছে। যে রাজ্য প্রথমে তাঁর ভার মনে হয়েছিল, জ্ঞানী হওয়ার পর

সেটা আর তাঁকে বিচলিত করত না। যা বলতে চাই তা হল, ভিক্ষার কী আনন্দ অন্যে কী জানবে? কেবল ভিক্ষাতে বা যে পাতা ফেলে দেওয়া হবে তাতে খাওয়ায় কেনা মহত্ব নেই। যদি কেনা রাজাধিরাজ ভিক্ষায় যায় সেই ভিক্ষায় মহত্ব আছে। এখন ভিক্ষার অর্থ 'বড়া' আর 'পরমান্ন' দেওয়া হবে। কোন কোন মাসে কয়েকবার এ সব হবে। এমন কি পদপূজার জন্য টাকাও চাওয়া হয়। ধার্য টাকা না দিলে তারা 'উপস্তরণ' (খাওয়ার আগে গণ্ডুষ) করতে অস্বীকার করে। করতল ভিক্ষার অসামান্য মহিমার এমনই অধঃপতন হয়েছে'', ভগবান বললেন।

মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ।
পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমমন্ত্রয়ন্তঃ।
কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ।
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

''তরুমূলে বাস, করতল গ্রাস, সম্পদশ্রী জীর্ণ বস্ত্রসব বর্জন, যাঁরা কৌপীনবন্ত তাঁরাই ভাগ্যবান।''

* * *

21শে জুন, 1947

(124) উপনয়ন

দু'তিনদিন আগে সকালে কয়েকজন লোক সদ্য উপনীত একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসে ভগবানকে প্রণাম ক'রে চলে গেল। তারা চলে যেতে একজন ভক্ত উপনয়নের প্রকৃত তাৎপর্য জানতে চাইলে ভগবান আমাদের বললেন–

''গলায় তিন গোছা সূতা পরলে উপনয়ন হয় না। এর অর্থ, কেবল যে দু'টি চোখ আছে তা নয়, আরও একটা তৃতীয় নয়ন আছে। সেটা জ্ঞাননেত্র। সেই চোখ খোলো আর নিজের স্বরূপ জানো এটা শেখানো হয়। উপনয়নের অর্থ সহকারী চোখ। ওরা বলে সেই চোখ খুলতে হবে,

তার জন্য প্রাণায়াম শিক্ষা দেয়। তারপর ব্রহ্মোপদেশ (দীক্ষা) দেয়, একটা ভিক্ষা পাত্র দেয় আর বলে ভিক্ষায় যাও। প্রথম ভিক্ষা মাতৃ-ভিক্ষা। বাবা যখন ব্রহ্মোপদেশ দেন, মা তিন মুঠো ভিক্ষা (চাল) দিয়ে পিতৃদত্ত উপদেশ মনন করার সাহায্য করেন। সে তখন ভিক্ষান্নে উদরপূরণ করবে, শিক্ষার জন্য গুরুগৃহে বাস করবে আর জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত ক'রে আত্মোপলব্ধি করবে। উপনয়নের প্রকৃত অর্থ এই। সে সব ভুলে এখন কী করা হয়, না-প্রাণায়ামের অর্থ আঙ্গুল দিয়ে নাক বন্ধ ক'রে শ্বাস সংযমের ভান করা। ব্রহ্মোপদেশের অর্থ বাবা যখন কানে ফিস্‌ফিস্ ক'রে কিছু বলেন তখন বাবা ও ছেলেকে একটা নূতন ধুতি দিয়ে ঢেকে দেওয়া। ভিক্ষা, ভিক্ষার ঝুলি টাকায় ভরিয়ে দেওয়া। যে বাবা উপদেশ দেন ও যে পুরোহিত উপনয়ন করান, তাঁরাই যদি উপনয়নের প্রকৃত অর্থ না জানেন, তবে তাঁরা আর ছেলেকে কী শেখাবেন? কেবল তাই নয়। গুরুর কাছে বহুদিন থেকে শিক্ষা লাভ করলে, গুরু তার মন সংসারে আবদ্ধ হয় কিংবা সন্ন্যাস নিতে চায় দেখার জন্য বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। কিছু দিন বাড়িতে থাকার পর ছেলেটি সংসার বাসনাশূন্য হয়ে সন্ন্যাস নেওয়ার জন্য কাশী যাত্রা করত। সে সময়ে বিবাহযোগ্য কন্যাদের অভিভাবকেরা তাকে কাশীযাত্রায় নিবৃত্ত ক'রে বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন করত। যারা সন্ন্যাসের জন্য বদ্ধ-পরিকর হত তারা এ সব বিবাহ-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে চলে যেত। আর যারা অন্য রকম হত তা বাড়ি ফিরে বিয়ে করত। সেসব ভুলে, কাশীযাত্রা এখন যুবকটির জরি পেড়ে ধুতি পরে, চোখে কাজল দিয়ে, কপালে ফোঁটা কেটে, পায়ে লাল-হলুদ প্রলেপ লাগিয়ে, শরীরে চন্দন লেপে, গলায় ফুলের মালা, মাথায় ছাতা, পায়ে খড়ম প'রে, আড়ম্বর ক'রে বাদ্য বাজনাসহ শোভাযাত্রা করা। যখন মেয়ের ভাই বিয়ের প্রস্তাব করে আর জোর করতে থাকে তখন ছেলেটি বলে, 'আমার একটা ঘড়ি চাই, আমার একটা মোটর সাইকেল চাই, আমার এটা চাই, ওটা চাই, এ সব দিলে বিয়ে করতে পারি, না হলে নয়।' পাছে বিয়ে ভেঙ্গে যায় তাই যা চাওয়া হয় কন্যাপক্ষও তাই দেয়। তারপর ফোটো তোলা হয়, খুব ধূমধাম ক'রে খাওয়া-দাওয়া আর কাপড়-চোপড় উপহার

দেওয়া হয়। এখনকার দিনে ভিক্ষা দেওয়া হল ভিক্ষার ঝুলি টাকায় ভরিয়ে দেওয়া আর কাশীযাত্রা পণ আদায়।''

* * *

27শে জুন, 1947

(125) জোর ক'রে খাওয়ানো

আজ বিকাল তিনটার সময়ে 'ঈশান্য' মঠ থেকে একজন ভক্ত এসে ভগবানকে প্রণাম করলে। তাকে দেখে ভগবান বললেন, ''একটা তার পাওয়া গেছে সে কোভিলুর মঠের স্বামী আর নেই। নটেশস্বামী চলে গেলেন না কি?'' সে বললে, ''হাঁ। দু'দিন আগে। আমরা আগে থেকে জানতাম যে তিনি অসুস্থ।'' একজন জিজ্ঞাসা করলে, 'নটেশস্বামী কে?'' ভগবান বললেন, ''কোভিলুর মঠে যিনি মারা গেলেন তিনিই আগে ঈশান্য মঠের কর্তা ছিলেন। যখন কোভিলুর মঠাধিপতি মারা যান তখন নটেশস্বামীকে সেখানে মঠাধিপতি করা হয়। এটাই এদিকের সব থেকে বড় বেদান্ত মঠ। যদিও তিনি খুব পণ্ডিত ছিলেন না, কিন্তু ভাল সাধক ছিলেন তাই তাঁকে মনোনয়ন করা হয়। সেও প্রায় বিশবছর হয়ে গেল।''

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ''ইনিই কি তিনি, যিনি ভগবানকে বাণ্ডীতে (গরুর গাড়ি) উঠতে বাধ্য করেছিলেন?'' ভগবান বললেন, ''না। তিনি নটেশস্বামীর আগে যিনি ছিলেন। তিনি এঁর মতন ছিলেন না। তাঁর দারুণ ব্যক্তিত্ব ছিল।'' কেউ একজন জিজ্ঞাসা করলে, ''সেটা কবে হয়েছিল?'' ''সেটা আমি যখন বিরূপাক্ষ গুহায় ছিলাম, তিরুভণ্ণামলই আসার চার কি পাঁচ বছর পরে। সে একটা মজার গল্প। একদিন যখন পলনীস্বামী ও আমি গিরিপ্রদক্ষিণ ক'রে মন্দিরে এলাম তখন রাত্রি ৪টা। ক্লান্ত ছিলাম তাই সুব্রহ্মণ্যম মন্দিরে শুয়ে পড়লাম। পলনী চোলট্টি (সদাব্রত) থেকে খাবার আনতে গেল। তিনি (মঠাধিপতি) মন্দিরে যাচ্ছিলেন। যথারীতি তাঁকে ঘিরে কয়েকজন শিষ্য রয়েছে। একজন আমায় দেখতে পেয়ে সবাইকে

বললে। সেই যথেষ্ট। ফেরার পথে, তিনি দশজন শিষ্য নিয়ে আমায় ঘিরে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করলেন, 'উঠুন স্বামী, এবার আমরা যাই।' আমি তখন মৌন ছিলাম তাই ইঙ্গিতে জানালাম যে আমি তাঁদের সঙ্গে যাব না। তিনি কি আমার কথা শোনার পাত্র? তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'তোলো, পাঁজাকোলা ক'রে তুলে ফেলো।' কোন উপায় নেই দেখে উঠে পড়লাম। বাইরে এসে দেখি বাণ্ডী তৈরি রয়েছে। তিনি বললেন, 'উঠে পড়ুন স্বামী।' আমি অস্বীকার ক'রে ইঙ্গিতে জানালাম যে হেঁটেই যাব, বরং তিনি বাণ্ডীতে উঠুন। আমার আপত্তি গ্রাহ্য করলেন না। তার পরিবর্তে শিষ্যদের বললেন, 'কী, দেখছ কী? স্বামীকে তোলো আর গাড়িতে বসিয়ে দাও।' তারা দশজন আর আমি একলা। কী করতে পারি? তারা ধরে তুলে গাড়িতে বসিয়ে দিলে। আর কিছু না বলে মঠে পৌঁছে গেলাম। সেখানে তিনি আমার সামনে একটা বড় পাতা পাতিয়ে অনেক প্রকার খাবার দেওয়ালেন, খুব ভক্তির সঙ্গে বললেন, 'অনুগ্রহ ক'রে এইখানেই বরাবর থাকুন।' পলনী মন্দিরে ফিরে আমার খোঁজ ক'রে তারপর মঠে এল। সে এলে পরে কোনরকমে সেখান থেকে পালালাম। তিরুভণ্ণামলই আসার পর সেই একবার মাত্র গাড়ি চড়েছিলাম। তারপর থেকে নূতন লোক এলে তারা তাদের বাড়ি যাওয়ার জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দিত। একবার রাজি হলে এরূপ নিমন্ত্রণ চলতে থাকার ভয় ছিল, সেজন্য যাব না বলে গাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দিতাম। শেষে তারা গাড়ি পাঠানো বন্ধ করলে। এইটাই তাদের শেষ নয়। নিমন্ত্রণ করলে মঠে যেতাম না, গিরিপ্রদক্ষিণ করার সময়ে কখন মঠে গেলে, তিনি ভিতরে রাঁধুনিকে কিছু বলে আসতেন। খাওয়ার সময়ে বড় একটা পাতা পাতিয়ে পাশে বসে পাচককে দিয়ে বার বার পরিবেশন করাতেন। সাধারণ দিনে তিনি শিষ্যদের সঙ্গে খেতেন না। কিন্তু আমি মঠে গেলে আমার পাশে বসে খেতেন। পাতার ওপর পাহাড় প্রমাণ খাদ্য, আমি কী করে খাই? আমি সব ব্যঞ্জন থেকে একটু একটু তুলে নিতাম। বাকি সব খাবার মিশিয়ে আশ্রমবাসীরা স্বামীর প্রসাদ বলে খেত। এই দেখে আমি পাতায় খাওয়া ছেড়ে দিলাম। যখন মঠে প্রসাদ পাওয়ার ইচ্ছা

হত, তখন পাচিয়াম্মান মন্দিরে কিংবা কাছাকাছি কোথাও বসে থাকতাম, ভোগের ঘন্টা হলে বড় ফটকের কাছে গিয়ে প্রসাদ চাইতাম। তারা এনে আমার হাতে দিত, আমি পাতা ছাড়াই খেতাম। শিবমন্দির বলে ভোগে নুন দেওয়া হত না। তা সত্ত্বেও আমার কিছু মনে হত না। আমার তো কেবল ক্ষুধা মেটানো। মঠাধিপতি দোতলায় থাকতেন, অনেকদিন এসব জানতে পারেননি। একদিন হঠাৎ দেখে ফেললেন, 'কে স্বামীকে আলোনা খাবার দিচ্ছে?' বলে রেগে উঠলেন। পরে সব ঘটনা জানলেন আর কিছু বলেন নি। সেদিন যিনি মারা গেলেন, তিনি ওরূপ ছিলেন না। ইনি বেশ শান্ত আর ঢিলেঢালা ছিলেন। ইনিও আমার সঙ্গে পাশে বসতেন আর সবার সঙ্গে পরিমাণ মতো ভোগ পরিবেশন করাতেন'', ভগবান শেষ করলেন।

একজন বললে, ''ভগবান একবার ওখানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাই না?'' তিনি উত্তর দিলেন, ''হাঁ। যিনি মারা গেলেন, তিনি একদিন মঠের অধিবাসীদের পড়াচ্ছিলেন আর আমি গিয়ে পড়েছি। তিনি আমায় আদর-আপ্যায়ন ক'রে বসালেন। আমি বললাম, 'আপনি পড়ান'। তিনি বললেন, 'স্বামীর সামনে আমি কি পড়াতে পারি? স্বামী কিছু বলুন।' এই বলে একটা 'গীতাসার' নিয়ে শিষ্যদের দিয়ে পড়িয়ে আমায় ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করলেন। কোন উপায় নেই দেখে আমি ব্যাখ্যা করলাম।''

প্রশ্নকারী বললে, 'বোধহয় রামচন্দ্র আইয়ারের ঠাকুরদাদা একবার ভগবানকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল।'' ''সে অনেকদিন আগে, বোধহয় 1896 সালে। তখন আমি গোপুর সুব্রহ্মণ্যেশ্বর মন্দিরে থাকি। সে রোজ আসত, কিছুক্ষণ বসত আর চলে যেত। আমি মৌন ছিলাম। সুতরাং কোন কথা বা আলোচনা হত না। তা সত্ত্বেও তার খুব ভক্তি ছিল। একদিন মনে হয় সে কাউকে বাড়িতে খেতে বলেছিল। খাওয়ার আগে মধ্যাহ্ন সময়ে সে আর একজনের সঙ্গে এল। দু'জনে দু'পাশে দাঁড়িয়ে বললে, 'স্বামী উঠুন, চলুন যাই।' আমি ইঙ্গিতে বললাম 'কেন?' তারা কারণটা বললে। আমি অস্বীকার করলাম। কিন্তু তারা কি ছাড়বে? তারা আমায় হাত ধরে

তুললে। তারা আমায় কোলে ক'রে নিয়ে যেতেও প্রস্তুত ছিল। সে খুব লম্বা, বেশ শক্তসমর্থ ও বিশাল-ভুঁড়িওলা ছিল। সে সময়ে আমি রোগা আর দুর্বল। তার কাছে কিছু না। আর তার বন্ধু তার থেকেও বলিষ্ঠ। আমি আর কী করতে পারি? বেশি জেদ করলে ওরা পাছে আমায় পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিয়ে যায় ভেবে ভয় পেলাম। জানতাম যে বেশ ভক্তিভাবেই খেতে যেতে বলছে। বাড়ির দরজা থেকে খুব আদর-আপ্যায়ন ক'রে নিয়ে গিয়ে মস্ত বড় কলাপাতা পেতে দিয়ে পেটভরে খাওয়ালে আর তারপর বিদায় দিলে। সেই একমাত্র গৃহস্থের বাড়ি, যেখানে আমি পাতা পেতে বসে খেয়েছি'', ভগবান বললেন।

* * *

28শে জুন, 1947

(126) অল্প জেনে প্রশ্ন

কয়েকদিন আগে শহরে বৈশ্য সঙ্গম (সম্মেলন) হয়েছিল। আন্ধ্রপ্রদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট বৈশ্যও তাতে যোগ দিয়েছিল। দুদিন আগে সকালে সবাই আশ্রমে এসেছিল আর তাদের মধ্যে যে প্রধান সে ভগবানকে উদ্দেশ্য ক'রে বললে, ''স্বামী, ঈশ্বর জীব হয়েছেন। জীবের দুঃখ কি তাঁকে বিচলিত করে কিংবা করে না?''

ভগবান তৎক্ষণাৎ কিছু উত্তর দিলেন না, চুপ ক'রে রইলেন। প্রশ্নকারী কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে আবার জিজ্ঞাসা করলে, ''স্বামী, আপনি যতক্ষণ না উত্তর দেন ততক্ষণ আমরা কি অপেক্ষা করব?'' ভগবান বললেন, ''যে প্রশ্ন করছে, সে কে?'' সে বললে, ''জীব''। তিনি বললেন, ''জীবটা কে? কী রকম দেখতে? কোথায় জন্মেছে? কোথায় লয় হয়? তুমি যদি এটা খোঁজো আর পেয়ে যাও তবে যাকে 'জীব' বলা হয় তাকেই ঈশ্বর বলে জানা যাবে। তারপর জীবের দুঃখে ঈশ্বর বিচলিত হন কি না জানা যাবে। এটা জানা হলে আর কোন দুঃখ থাকবে না।'' প্রশ্নকারী বললে,

''এটাই তো জানতে পারি না।'' ''নিজের আত্মাকে জানতে কোন কষ্ট নেই। সুপ্তিতে তুমি থাকো কিন্তু এখন জগতে যা কিছু দেখছ তখন তা আর দেখো না। কিন্তু তখনও তুমি ছিলে আর এখনও আছ (নিদ্রায় ও জাগরণে)। তোমার জাগ্রত অবস্থায় তোমার ওপর যা নূতন ক'রে আসে তাকে দূর করতে হবে'', ভগবান বললেন। সে বললে, ''কী করে দূর করব?'' ''যদি তুমি যেমন আছ তেমনি থাকো, তারা আপনা হতেই চলে যাবে। অস্তিত্বই তোমার স্বরূপ। সত্য যা রয়েছে তাকে দেখলে, অসৎ ব'লেই অসৎ চলে যাবে'', ভগবান বললেন। প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করলে, ''কী উপায়ে এটা দেখা যাবে?'' '' 'আমি কে?' আর 'আমার স্বরূপ কী?' অনুসন্ধানে'', ভগবান বললেন। জিজ্ঞাসু বললে, ''কী করে অনুসন্ধান করব?'' ভগবান নীরব রইলেন।

প্রশ্নকর্তা উত্তরের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে তারপর, ''হাঁ, এটাই উপায়'' বলে সেবকদের নিষেধ করা সত্ত্বেও ভগবানের পা ছুঁয়ে প্রণাম ক'রে বৈশ্য সঙ্ঘের সভ্যদের নিয়ে বিদায় নিলে। তারা চলে গেলে ভগবান নিকটের লোকেদের বললেন, ''তারা কি উত্তরটা জানে না? কেবল আমায় পরীক্ষা করতে চেয়েছিল। আমার পা ছুঁয়ে তারা ভাবলে যে কাজ হয়ে গেল। তাদের আর এর বেশি কী প্রয়োজন?''

নেলোরের একজন ধনী রেড্ডী সেখানে ছিল, সে বললে, ''বলা হয় আনন্দই আত্মা। আনন্দে দুঃখ নেই। তাই যদি হয়, যখন জীব আনন্দ অনুভব করে, সে কি তখন দুঃখ থেকে উদ্ধার পায়?'' ভগবান বললেন, ''দুঃখ থাকলেই আনন্দ থাকে। দুঃখ বোধ হলেই আনন্দ কী জানা যায়। দুঃখ বোধ না থাকলে আনন্দ বোধ কী করে হবে? যতক্ষণ এ দু'টি অনুভবের জন্য কেউ আছে ততক্ষণ এ দু'টিও থাকবে। বস্তু যা আছে তা সুখ ও দুঃখের উপরে। তা সত্ত্বেও বস্তুকে সুখ বলে কারণ সৎ, সৎ ও অসতের ওপরে। জ্ঞান, জ্ঞান ও অজ্ঞানের ঊর্ধ্বে বিদ্যা, বিদ্যা ও অবিদ্যার

অতীত। আরও অনেকে বিষয়ের সম্বন্ধে এরূপ বলা যায়। সুতরাং বলার কী আছে?'' এই ভাবটা সদ্‌বিদ্যার দশম শ্লোকে আছে–

সাধারণ জ্ঞান অজ্ঞান জড়িত
অজ্ঞান হয় কিছু জ্ঞান মিশ্রিত
সেই সত্যজ্ঞান যাহা আত্মার।
'কার এই জ্ঞান ও অজ্ঞান' তাহার
অনুসন্ধানে, মিলে তত্ত্ব তার॥

সদ্‌বিদ্যা– 10

* * *

30শে জুন, 1947

(127) ফুল দিয়ে পূজা

সম্প্রতি রামনাথপুরমের একজন অবস্থাপন্ন মহিলা তার বাগান থেকে প্রতিদিন এক সাজি মল্লিকা ফুল এনে হলঘরের সধবা মেয়েদের দিতে আরম্ভ করলে। ভগবান চার পাঁচ দিন দেখলেন কিন্তু কিছু বললেন না। সেও দিয়ে যেতে লাগল। একদিন সে ফুলের সাজি টুলের ওপর রেখে ভগবানকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। ভগবান নিকটের একজনের দিকে চেয়ে বললেন, ''দেখ, এ কিছু এনেছে। বোধহয় ফুল। কিসের জন্য?''

মহিলা ভয়ে ভয়ে বললে যে এটা ভগবানের জন্য নয়, সধবা মহিলাদের জন্য, আর সবাইকে দিতে আরম্ভ করলে। ''ও! তাই যদি হয়, সেটা তাদের বাড়ি বাড়ি দিলেই হয়। এখানে কেন? যদি একজন এরকম ফুল দেয় সবাই দিতে শুরু করবে। এটা দেখে যারা নূতন আসবে তারা ভাববে, এভাবে ফুল দিতে হয় সুতরাং কিনে নিয়ে আসবে। তখনই বিপদ শুরু হবে। আমি ফুল স্পর্শ করি না। অনেক স্থানে ফুলের মালা দেওয়ার রীতি আছে। সেজন্য অনেকে ফুল নিয়ে আসে। আমি ফুল দিয়ে পদ পূজা

বা মাথায় পূজা করতে দিই না। এসব নিয়মের কী দরকার?'' ভগবান বললেন।

সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে, ''না। আমি আর আনব না।'' ভগবান বললেন, ''বেশ। ভাল'', তারপর কাছের লোকেদের দিকে ফিরে বলতে লাগলেন, ''একবার জয়ন্তী (জন্মদিন) উৎসবে কী হয়েছিল জানো?' একজন ভক্ত 'পুষ্পাঞ্জলি' নামে একটা বই ছাপিয়ে বললে, পড়বে। আমি ''আচ্ছা'' বললে, সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগল। মনে হয় তার কাপড়ে কিছু ফুল লুকানো ছিল, পড়া শেষ হতে আমার পায়ে ফুল পড়ল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এটা তারই কাজ। সে যদি আগে বলত তাহলে আমি রাজি হতাম না তাই সে এরূপ করেছিল। কী করা যাবে? তার মতে বোধহয় এরকম না করলে পূজা হয় না।''

আমার এখানে আসার প্রথম দিকে মহালক্ষ্মী পূজার দিন, দু'একজন বিবাহিতা মহিলা ভগবানের পায়ে ফুল দিয়ে প্রণাম ক'রে পূজার অনুমতি নিয়ে চলে যেত। পরের বছর সবাই তাই করতে শুরু করে দিলে। ভগবান বিরক্ত হয়ে, তাদের দিকে চেয়ে বললেন, ''এটা কেন? প্রথমেই এটা বন্ধ করার পরিবর্তে আমার চুপ করে থাকার ফল। যথেষ্ট হয়েছে।''

কেবল নিজের বেলায় নয়, এমনকি ফুল পাতা দিয়ে ঠাকুর পূজা করাতেও ভগবান ভক্তদের বকতেন। আমি আমার আগের একটা চিঠিতে এচম্মার 'লক্ষপত্রী পূজা'র কথা লিখেছি। এরূপ আরও একটা ঘটনা আছে। যে সময়ে ভগবান ভক্তদের নিয়ে থেমে থেমে গিরিপ্রদক্ষিণ করতেন, সে সময়ে তাঁরা একবার সকালে গৌতম আশ্রমে থেমেছেন। মহিলা ও পুরুষ ভক্তদের রান্না, খাওয়া ও বিশ্রাম হয়ে যাওয়ার র, যাতে সন্ধ্যার আগে আশ্রমে পৌঁছান যায় সেজন্য সবাই আবার যাত্রার জন্য তৈরি হচ্ছে, এমন সময়ে একজন মহিলা ভক্ত, যে তিরুচুড়ীতে জন্মেছিল, ভগবানের ছেলেবেলায় খেলার সাথী ছিল ও তাঁর সঙ্গে বেশ অন্তরঙ্গভাবে কথা বলত সেই লদাম্মা সমাধিস্থানের চারিপাশে অজস্র ফুটে থাকা সন্ধ্যামণি ও

থনগেড়ু (ঢোল কলমি) ফুল তুলে সাজি ভরতে লাগল। ভগবান দেখলেন আর হেসে বললেন, ''লদাম্মা, তুমি কী করছ?'' সে বললে, ''আমি ফুল তুলছি।'' ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ''ও তাই। এটা কি তোমার কাজ? আচ্ছা, ঠিক আছে, কিন্তু এত কেন?'' সে বললে, ''পূজার জন্য।'' ভগবান বললেন, ''ও! তুমি এত ফুল তুলে পূজা না করলে বুঝি পূজা হবে না।'' সে বললে, ''তা জানি না। এই গাছে অজস্র ফুল ফুটেছে, তাই তুলছি।'' ''বেশ। তোমার মতে, এদের যদি অজস্র ফুল হয়ে থাকে, সেটা ভাল নয়, তাই এদের নেড়া করে দিচ্ছ। তুমি এদের সৌন্দর্য দেখেছ আর অন্য কেউ সেটা দেখুক, তা চাও না। তুমি এদের জল দিয়েছ, যত্ন করেছ, করো নি? সুতরাং যাতে আর অন্য কেউ এদের শোভা না দেখে সেজন্য তোমার এদের মাথা মুড়িয়ে ফুল তোলার অধিকার আছে। তবেই তোমার পূজা সার্থক হবে, এই তো?'' ভগবান বললেন।

* * *

3রা জুলাই, 1947

(128) অভিষেক

প্রায়ই যাতায়াত করে এমন একজন ভক্ত গতকাল ভগবানের পাহাড়ে থাকার বিষয়ে কথাবার্তার সময়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে, ''ভগবান যখন পাহাড়ে ছিলেন তখন নাকি একজন নারিকেলের জল দিয়ে ভগবানের অভিষেক করেছিল। এটা কি সত্য?'' ভগবান হেসে বললেন, ''আমি যখন বিরূপাক্ষ গুহায় তখন উত্তর ভারত থেকে কয়েকজন মহিলা এসেছিল। আমি তেঁতুলগাছের তলায় চাতালে চোখ বন্ধ ক'রে ওদের বিশেষ লক্ষ্য না ক'রে বসেছিলাম। ভাবলাম একটু পরে চলে যাবে। হঠাৎ একটা কিছু ভাঙ্গার শব্দ হল, তখন চোখ খুলে দেখি নারিকেলের জল মাথা বেয়ে পড়ছে। ওদের মধ্যে একজন মহিলা অভিষেক করছে। আমার আর কী করার ছিল? আমি মৌন কথা বলতে পারি না। আমার কোন গামছাও ছিল

না যে সেটা মুছব, সুতরাং জল শরীরে শুকালো। আবার কর্পূর আরতিও হত, মাথায় জল ঢালা, তীর্থ প্রসাদ আরও সব নানা কাণ্ডকারখানা হত। সেগুলো ঠেকানো বেশ দায় ছিল।''

আমি নিজেই চার পাঁচ বছর আগে এরকম ব্যাপার দেখেছি। ভগবান যে ঘরে স্নান করেন, সেখানে একটা নর্দমা আছে যা দিয়ে জল বেরিয়ে যায়। তার তলায় জল নিকাশের জন্য একটা গর্ত তৈরি করা হয়েছে। স্নানের সময়ে কয়েকজন ভক্ত সেখানে জড়ো হয়ে বেরিয়ে যাওয়া জল মাথায় ছিটাত, চোখ ধুত আর এমনি আচমনও করত। এই ব্যাপার নিঃশব্দে সবার অলক্ষ্যে বেশ কিছু দিন চলছিল। কালে লোকেরা জল নেওয়ার জন্য ঘটি, ঘড়া আনতে আরম্ভ করলে আর বেশ লাইন দেওয়া শুরু হয়ে গেল। তাতে যথারীতি কিছু গোলমাল হতে ভগবানের কানে গেল। তিনি খোঁজ ক'রে সব ব্যাপারটা জানলেন। সেবকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, ''ও! এই ব্যাপার? গোলমাল শুনে আমি ভেবেছি অন্য কিছু। কী আপদ! তোমরা এটা বন্ধ করবে না আমি রাস্তার কলে স্নান করতে যাব? তা করলে তোমাদের আর আমার জন্য জল গরম করার কষ্ট করতে হবে না আর ওদেরও কষ্ট হবে না তীর্থের (স্নানবারি) জন্য অপেক্ষা ক'রে লাইন দিতে হবে না। আমার আর কী দরকার? মাত্র দু'টি জিনিস, একটা গামছা আর একটা কৌপীন। আমি স্নান সেরে এ দু'টি ওখানে কাচলেই কাজ শেষ। অর কল না হলে ঝরনা আছে, পুকুর আছে। এসব ঝামেলা কেন? তোমরা কী বল?'' ভগবান যখন তাদের এরূপ বকলেন তখন তারা সর্বাধিকারীকে সব বললে, তিনিও স্নানের সময়ে সেদিকে কারও যাওয়া একেবারে নিষেধ করে দিলেন।

সে সময়ে আরও একটা ঘটনা হয়েছিল। ভগবান মধ্যাহ্ন ভোজনের পর দুপুরের রৌদ্রে একবার পাহাড়ে যেতেন। ফিরে এলে, হলের কাছে চাতালে সেবকেরা কমণ্ডলু থেকে তাঁর পায়ে জল ঢেলে দিত, তিনি পা ধুয়ে হলের ভিতরে যেতেন। কেউ কেউ সেখানে লুকিয়ে থাকত, ভগবান

চলে গেলে সেই জল তুলে নিয়ে মাথায় ছিটাত। একবার খোঁজ খবর শুরু হতেই সব বেরিয়ে গেল, যাবে না? ভগবান সেটাও লক্ষ্য করেছিলেন। একদিন ঘরের জানলা দিয়ে দেখলেন যে একজন পুরাতন বৃদ্ধ ভক্ত সেই জল মাথায় দিচ্ছে। তিনি সেই সুযোগে বলতে আরম্ভ করলেন, ''এইতো! ওই দেখ! যেই আমি আর বিশেষ খেয়াল করি না অমনি সব বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছে। যতদিনই এখানে থাকুক আর যতবারই আমার কথা শুনুক, এই হাস্যকর ব্যাপারগুলো থামবে না। তারা করছে কী? এবার পা ধোয়া ছেড়ে দেব, বুঝলে?'' তিনি তাদের খুব তিরস্কার করলেন। সেই ভক্ত তো একেবারে হতবাক হয়ে লজ্জায় দুঃখে তৎক্ষণাৎ ভগবানের কাছে ক্ষমা চাইলে।

কেবল যে তাকেই বকলেন তাই নয় উপরন্তু সেবকদের যথারীতি পা ধোয়ার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও পরের দিন থেকে ভগবান পা ধুতে রাজি হলেন না। সে সময়ে শহরে না থাকায় আমি তখন ঘটনাটা জানতে পারি নি। চারদিন পরে, কেউ একজন আশ্রমে ভিক্ষার ব্যবস্থা করলে আর আমাকেও নিমন্ত্রণ করলে। খাওয়ার পর আমি থেকে গেলাম। ভগবানও অভ্যাসমত পাহাড় থেকে ফিরলেন। আমার নিজের সাধনা সম্বন্ধে কিছু সংশয় থাকায় তিনি ফিরে এলে ধীরে সুস্থে জিজ্ঞাসা করব বলে হলের বাইরে পশ্চিম দিকের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কোন কিছু জিজ্ঞাসা বা সংশয় নিরসনের প্রয়োজন হলে আমার এরূপ করাই অভ্যাস। এবার কী হল জানো? সচরাচর পূর্বদিকে দেখার পরিবর্তে তিনি আমি যেদিকে দাঁড়িয়েছিলাম সেদিকে চাইলেন। আমি কিছু একটা সন্দেহ ক'রে সরে দাঁড়িয়ে পথ দিলাম। তিনি আমার দিকে রাগতভাবে চাইলেন। আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। কেন যে এভাবে চাইলেন তা বুঝলাম না। জানলার কাছে ঘুরলে সেবকেরা পা ধোয়ার জন্য জল দিতে গেলে ভগবান জোরে বললেন, ''না'' তারা বললে, ''আপনি রৌদ্রের তাপ থেকে ফিরলেন।'' তিনি বললেন, ''তাতে কী? যদি 'পরিষ্কারিতা' দেখতে যাই, লোকেরা

সেই জলের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে, যথেষ্ট হয়েছে। তোমার ইচ্ছা হয় নিজের পা ধোও।'' এই বলে ভগবান হলে ঢুকে গেলেন।

আমি ভাবতে লাগলাম যে কী এমন অন্যায় করলাম যাতে ভগবান এত বিরক্ত হলেন, যাক্ সংশয় মেটাবার চেষ্টা না ক'রে বাড়ি চলে গেলাম। সন্ধ্যায় খোঁজ নিয়ে আগেকার ঘটনা সব জানলাম। তারপর যা হোক মনে অনেকটা শান্তি পেলাম।

* * *

6ই জুলাই, 1947

(129) তীর্থবারি ও প্রসাদ

অনেক আগে, যখন আশ্রমে বেশি লোক ছিল না, তখন ভগবানের একজন সেবক তাঁর খাওয়া না হওয়া অবধি অপেক্ষা করত, তারপর তাঁর াতায় খেত। ক্রমশঃ আশ্রমিক ও পুরাতন ভক্তগণ সেই পাতা চাইত আর পেতও। যতদিন না এই পাতা নিয়ে কলহের সৃষ্টি হল ততদিন ভগবান কিছু বলেন নি। পাতার কাছে হাত ধোয়ার জন্য একটা রেকাবি দেওয়া হত। তিনি হাত ধুয়ে চলে যেতেই, সেই জল তীর্থবারি বলে গ্রহণ করা হত। কালে আশ্রমিকদের এই দুই অভ্যাস আশ্রম ছাড়িয়ে রমণনগরেও ছড়িয়ে পড়ল।

একদিন একজন ধনী ভক্তের মা খাওয়ার সময়ে এসে ভগবানের কাছে দাঁড়াল, তাকে দেখে ভগবান বললেন, ''তুমি খেতে বসছ না কেন?'' সে কিন্তু বসলে না। ভগবান তার অভিপ্রায় বুঝলেন, কিন্তু যেন জানেন না এইবাবে কিছু বললেন না। আর একদিকে আর একজন ভক্তের আট বছরের নাতনি একটা ঘটি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাকে দেখে ভগবান বললেন, ''তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? বসে পড়ো।'' সে বললে, ''না''। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, ''তবে এসেছ কেন? আর ঘটিটাই বা

কিসের জন্য?'' যতই হোক সে ছেলেমানুষ সরল, অত জানে না যে এটা একটা গোপনীয় ব্যাপার, বললে, ''ঠাকুমা তীর্থবারি নিয়ে যেতে বলেছে।'' ভগবান আর না থাকতে পেরে বললেন, ''বুঝেছি। এই ব্যাপার। ছোট মেয়ে এখানে তীর্থবারির জন্য অপেক্ষা করছে আর মহিলা ওখানে পাতার জন্য, এই তো, তাই না?'' যখন তিনি এরূপ দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন কাছে যারা ছিল তাদের মধ্যে একজন বললে, ''হাঁ''। ''আমি এই ছেলেমানুষি বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি'', তিনি বলে চললেন, ''ওরা ভাবে স্বামী হলঘরে চোখ বন্ধ ক'রে বসে থাকেন, এসব কিছুই লক্ষ্য করেন না। এতদিন আমি এসব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাইনি কিন্তু এ দেখছি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। উচ্ছিষ্ট কি না তীর্থবারি আর প্রসাদ, তার জন্য আবার পালা! দেখ! এরপর থেকে আমি আর রেকাবি বা এখানের কোন জায়গায় হাত ধোব না আর পাতাও এখানে ফেলে যাব না। নিজেই উঠিয়ে কোথাও ফেলে দেব। বুঝেছ? তোমরা সবাই মিলে এইসব করছ। এই তোমাদের একমাত্র শাস্তি।'' এই বলে আরও নানা অভিযোগ করতে করতে খাওয়ার পর পাতাটা মুড়ে হাতে নিয়ে উঠে পড়লেন। লোকেদের যথেষ্ট অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি তাদের পাতা না দিয়ে পাহাড়ে চলে গেলেন ও পথে একটা বাঁকের কাছে সেটা ফেলে দিয়ে হাত ধুলেন। অবশেষে আশ্রমিকেরা অনেক মিনতি ক'রে কথা দিলে যে এরকম অবাঞ্ছিত ব্যাপার বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে। তিনি বললেন, ''সবাই যখন নিজেদের পাতা তোলে ও বাইরে ফেলে, আমিই বা আমারটা কেন ফেলে রেখে যাব?'' 1943 সাল অবধি খাওয়ার পর প্রত্যেকেরই নিজের পাতা তোলা ও ফেলে দেওয়ার নিয়ম ছিল। এই ঘটনার পর সে নিয়মের পরিবর্তন হল।

যখন আশ্রমিকেরা প্রতিজ্ঞা করলে যে, সব পাতা ভগবানেরটা অবধি তারা নিজেরা ফেলবে, তখন তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাতা তোলা বন্ধ করলেন। কিন্তু আজ অবধি তিনি বাইরে হলঘরের সিঁড়ির কাছে হাত ধুচ্ছেন। যদি কেউ তাঁকে রেকাবিতে হাত ধুতে অনুরোধ করে, তিনি বলেন, ''তুমি এদের সবাইকে রেকাবি দেওয়ার ব্যবস্থা করো? যদি সবার

না থাকে তবে আমার একটা থাকার কী দরকার?'' এর আর কী উত্তর দেওয়া যায়?

* * *

৪ই জুলাই, 1947

(130) হস্ত মস্তক সংযোগম্(মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ)

অনেকেই বলবে, ''তুমি গত তিন চারখানা চিঠিতে যা লিখেছ, তাতে মনে হয় যে, শ্রীভগবান পদপূজা, অভিষেক, উচ্ছিষ্ট তীর্থ প্রসাদ কেবল যে অপছন্দ করেন তা নয় উপরন্তু এদের নিন্দাও করেন। কিন্তু গুরুগীতা ও অন্যান্য বই-এ গুরুপদপূজা, পাদোদক পান এরূপ আরও অন্যান্য প্রচলিত ধর্মীয় রীতি আছে। অনেক মহাত্মা তাঁদের শিষ্যদের এসব আচরণ অনুমোদন করেন। তবে এর কী ব্যাখ্যা?'' ভগবানের এমন একটা উচ্চ অবস্থা আর ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তাঁর এরূপ একত্ববোধ যে তিনি গুরু ও শিষ্য ভেদভাব ত্যাগ করতে পারেন। সে কারণে তাঁর পক্ষে এ সবের প্রয়োজন নেই। তিনি এই মত পোষণ করেন যে যারা এখনও দেহাত্মবোধ ত্যাগ করতে পারেনি তাদের সন্তোষের জন্য প্রাচীনেরা এইসব আচার- পদ্ধতি বলে গেছেন। তারপরও প্রশ্ন হতে পারে, ''তাই যদি হয় তবে তিনি এইসব কাজ সম্বন্ধে কখনো উদাসীন থাকেন আবার কখনো প্রতিবাদ করেন কেন?'' যখন দু'তিনজন কদাচিৎ এসব করে তখন তিনি কিছু মনে করেন না বরং তারা এখনও দেহাত্মবোধ ত্যাগ করতে পারেনি বলে দুঃখিত হন কিন্তু যখন এটা একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে যায় তখন তিনি প্রতিবাদ না ক'রে থাকেন কী করে? তিনি এদের দেহাত্মভাবনা যায়নি বলেও দুঃখিত হন। তাঁর প্রতিবাদের মধ্যে হয়তো আরও অনেক সূদচিন্তা আছে যা আমাদের বুদ্ধির অগম্য!

অনেক বই-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে ভগবান নিজেই বিভূতি ইত্যাদি প্রসাদ শিবপ্রকাশ পিল্লাই ও আরও অন্যান্য ভক্তদের দিয়েছেন। আমরা

অনেকের কাছে একথা শুনেছি। তবে ভগবান নিজেই এটা অনেকবার বলেছেন যে যখন ধারেপাশে বেশি কেউ ছিল না তখন তিনি স্বচ্ছন্দে তাদের সঙ্গে মিশতেন আর তারা যা চাইত তাই দিতেন। এখনও কখনো কিছু খেলে, আমাদের মতো পুরাতন ভক্তেরা কাছে থাকলে তিনি পাত্র থেকে তুলে আমাদের দেন। যখন পাহাড়ে ছিলেন, কত সময়ে এমন হয়েছে যে সকলের মতো পর্যাপ্ত খাদ্য নেই, তখন তিনি সবটা মিশিয়ে ছোট ছোট দলা ক'রে সবাইকে একটা ক'রে দিয়ে নিজেও একটা খেতেন। ভক্তদের এটা গুরুর হাতের প্রসাদ মনে করা স্বাভাবিক। এই তো ব্যাপার। আমি কখনো ভগবানকে একথা বলতে শুনিনি যে, তিনি এটা অনুগ্রহ করছেন বলে দিয়েছেন বা আগে কখনো এরূপ ভেবে কিছু করেছেন।

সম্প্রতি একজন ভক্ত যে এরূপ বিবরণী শুনেছে সে নিজেই ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলে, ''আমি শুনেছি, ভগবান হস্ত মস্তক সংযোগম্ (মাথায় হাত দিয়ে দীক্ষা দান) করেছেন। এটা কি সত্য?''

''সে কী করে হয়? হয়তো সোফা থেকে উঠতে গিয়ে বা কথা বলার বা চলাফেরার সময়ে আমার হাত হঠাৎ কারও মাথায় ঠেকে গেছে আর তারা একে হস্তদীক্ষা ধরে নিয়েছে। যাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা আছে হয়তো কখনো তাদের মৃদু চাপড়ও দিয়ে থাকতে পারি। ব্যস্। আমি কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করিনি। আমি সহজ ও সাধারণভাবে সবার সঙ্গে থাকতে চাই। তারা হয়তো এরূপ আকস্মিক স্পর্শকে আমি আশীর্বাদ করলাম ধরে নিয়েছে। এটা হলেই কি হস্ত মস্তক সংযোগম্ (মাথায় হাত দিয়ে দীক্ষা দান) হয়ে গেল ?'' ভগবান বললেন।

প্রায় দশ কি পনেরো দিন আগে একজন সাধু এখানে এসে কয়েকদিন ছিল। সে একদিন ভগবানের কাছে গিয়ে মিনতি করে বললে, ''স্বামী! আপনি যখন খাবেন তার এক গ্রাস আমায় প্রসাদ বলে দিতে আজ্ঞা করুন।'' ''যা খাও তাই ঈশ্বরের প্রসাদ বলে গ্রহণ করো তাহলেই ঈশ্বরের প্রসাদ হবে। আমরা যা খাই তা কি ভগবৎ-প্রসাদ নয়? খায় কে? কোথা

থেকে সে এল? তুমি যদি একবার এর মূলে যাও আর সত্যকে পেয়ে যাও, দেখবে যে সবই ভগবৎ-প্রসাদ'', ভগবান বললেন।

* * *

10ই জুলাই, 1947

(131) ''বিচার মণিমালা''

ভগবানের তামিলে লেখা ''বিচারসাগর-সারসংগ্রহ'' বোধহয় প্রায় তিরিশ বছর আগে লেখা ও অরুণাচল মুদলিয়ারের ছাপানো। যা হোক যেমন হয়, ভগবানের নাম উল্লেখ না থাকায় এটা অজানা রয়ে গেছে। সম্প্রতি কেউ একজন লাইব্রেরি থেকে মালয়ালাম 'বিচার সাগর' বইটা নেয় আর সে যখন বইটা ফেরত দিচ্ছিল সেটা ভগবানের হাতে আসে। তখন তাঁর মনে পড়ল যে তিনি 'বিচারসাগর-সারসংগ্রহ' লিখেছিলেন আর কোন ছাপানো বই আছে কিনা খোঁজ করলেন। খোঁজাখুজির পর দোমড়ানো মোচড়ানো অবস্থায় একটা বই পাওয়া গেল। একজন ভক্ত যখন সেটা পুনর্বার ছাপাবার জন্য নকল করছিল ভগবান তখন তাকে বৈরাগ্য সম্বন্ধে পতাকার দৃষ্টান্তটা যোগ করতে বললেন। সেই ভক্ত যখন জিজ্ঞাসা করলে যে এ দৃষ্টান্তের কী অর্থ, ভগবান হেসে বললেন, ''এর অর্থ জ্ঞানীর সামনে একটা 'বৈরাগ্যের' আর অজ্ঞানীর সামনে একটা 'রাগের' (অনুরাগের) পতাকা উড়ছে। পতাকা দেখলেই লোকে বোঝে যে কে জ্ঞানী আর কে অজ্ঞানী। কারণ অজ্ঞানীর শারীরিক বা মানসিক কারণে বৈরাগ্য হলেও সেটা সাময়িক। রাগের পতাকা এসে সামনে দাঁড়ায়। কিন্তু বৈরাগ্যের পতাকা কখনও সরে যায় না। জ্ঞানীর আর এর থেকে কী বড় চিহ্ন হতে পারে?''

আর একজন জিজ্ঞাসা করলে, ''ভগবান এই বইটা কেন লিখলেন?'' ''সাধু নিচলদাস হিন্দিতে 'বিচারসাগর' লিখেছিল। এতে বহু বাদানুবাদ আছে। অরুণাচল মুদলিয়ার একটা তামিল অনুবাদ কিনেছিল। সে বললে,

‘এটা বড় বিস্তারিত। কৃপা ক’রে একটা ছোট ‘সারসংগ্রহ’ লিখুন।’ সে বার বার অনুরোধ করাতে ও সাধকদের উপকার হবে ভেবে, আমিও লিখলাম। সেও তৎক্ষণাৎ ছাপিয়ে ফেললে। এ প্রায় তিরিশ বছর আগের ঘটনা’’, ভগবান বললেন। ভক্ত জিজ্ঞাসা করলে, ‘‘আপনার নামের উল্লেখ নেই কেন?’’ ‘‘আমার ভয় ছিল পাছে সবাই একটা করে বই এনে সংক্ষিপ্তসার করতে বলে তাই আমি নিজেই নাম দিতে বারণ করেছিলাম’’, ভগবান বললেন।

আমি বললাম, ‘‘হয়তো এরকম আরও কত অজানা লেখা আছে। সেগুলো ছাপা হলে ভাল হত।’’ ‘‘তাই নাকি? তোমার কি আর অন্য কোন কাজ নেই?’’ বলে ভগবান মৌনাবলম্বন করলেন।

ভগবানের মনে হল যে শিরোনামটা সুবিধামত হয়নি তাই সম্প্রতি সেটা ‘বিচার মণিমালা’ করা হল। যখন ওরা ভগবানের নাম দিয়ে এটা ছাপাবার জন্য পাঠাচ্ছিল, তখন আমার মনে হল যে ভগবান যদি নিজে এটা তেলুগুতে অনুবাদ করেন তাহলে ভাল হয়। আমার ভয় ছিল যে হয়তো তিনি রাজি হবেন না তাই আর কিছু বললাম না। মৌনী (শ্রীনিবাস রাও) রাজাগোপাল আইয়ারকে দিয়ে ভগবানকে অনুরোধ করালে যাতে দু’টি বই একই সঙ্গে ছাপা হয় আর আমাকেও উৎসাহ দিয়ে বললে, ‘‘নাগম্মা! তুমিও ভগবানকে বলো না কেন?’’ সে অনুসারে আমি খুব মিনতি করে তাঁকে অনুরোধ করলাম। কিছুক্ষণ আপত্তি করতে লাগলেন, ‘‘আমি কি তেলুগু পণ্ডিত? তুমি লেখ না কেন? আমি কেন লিখব? যা হোক, তিনি করুণাময়, শেষ অবধি আমাদের প্রার্থনায়, তিনি নিজেই তেলুগুতে অনুবাদ করলেন। খুব শীঘ্র এটা দু’টি ভাষায় ছাপা হবে। এটা গদ্যে লেখা হয়েছে, প্রত্যেকটি বাক্য যেন এক একটি সূত্র।

* * *

12ই জুলাই, 1947

(132) বিদেশবাসী

অরবিন্দ বোস একজন অতি পুরাতন বাঙালি ভক্ত, তার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলে, হঠাৎ আঠারো বছর বয়সের কিছু আগে মারা গেল। বোস শোকে কাতর হয়ে শান্তি পাওয়ার আশায় মাঝে মাঝে ভগবানকে প্রশ্ন করত। আজও সে কয়েকটা প্রশ্ন করলে। তার প্রশ্নেও আতুরতা প্রকাশ পাচ্ছিল। ভগবান যথারীতি তাকে আত্মানুসন্ধান ক'রে আত্মজ্ঞান লাভ করতে বললেন। সে তৃপ্ত হল না। তারপর ভগবান বললেন, ''আচ্ছা, আমি 'বিচারসাগর' থেকে একটা গল্প বলি শোন।'' এই বলে নিম্নলিখিত গল্পটি বললেন–

''দু'জন যুবক রাম ও কৃষ্ণ পড়াশুনা ও অর্থোপার্জনের জন্য তাদের বাবা–মাকে বলে বিদেশে গেল। কিছুদিন পরে একজন হঠাৎ মারা গেল। অন্যজন বেশ লেখাপড়া ক'রে অর্থোপর্জন ক'রে সুখে বাস করছিল। কিছুকাল পরে কোন এক ব্যবসায়ী তার নিজের দেশে যাবে শুনে সে তার বাবা–মাকে খবর পাঠালে যে, সে ভাল আছে আর তার সঙ্গী বন্ধু মারা গেছে। ব্যবসায়ী খবরটি ঠিকভাবে বলার পরিবর্তে, যে ছেলে জীবিত আছে তার বাবাকে বললে যে, তার ছেলে মারা গেছে আর যে ছেলে মারা গেছে তার বাবাকে বললে যে, তার ছেলে জীবিত আছে ও অনেক পয়সা করে সুখে আছে। যে ছেলেটি মারা গেছে, তার বাবা–মা ছেলে ফিরে আসবে ভেবে খুশি হল আর যে ছেলেটি বেঁচে আছে তার বাবা–মা ছেলে মারা গেছে ভেবে শোকাতুর হল। বাস্তবিক পক্ষে কেউই তাদের ছেলেকে দেখেনি কিন্তু খবর অনুসারে তারা সুখী ও দুঃখী হল। ব্যস্। যখন তারা সেই দেশে যাবে তখনই তারা সত্য জানতে পারবে। আমাদের অবস্থাও তাই। আমাদের মন যা বলে আমরাও তাই বিশ্বাস করি আর যা আছে তা নেই ও যা নেই তা আছে ভেবে ভ্রান্ত হই। আমরা যদি মনকে বিশ্বাস না

ক'রে হৃদয়ে প্রবেশ ক'রে অন্তরে ছেলেকে দেখি তবে তাদের আর বাইরে দেখার দরকার হয় না।''

এক বছর আগে, বোম্বাই প্রদেশের একজন রানি এসেছিলেন। মহিলাটি ভাল, কয়েকটি সন্তানের জননী। তাঁর স্বামী বিদেশে বাস করছেন। তিনি যতই সাহসী হন, তিনি কি তাঁর স্বামীর অনুপস্থিতি না অনুভব ক'রে পারেন? আমরা সবাই ভেবেছিলাম যে, তিনি ভগবানের দর্শনে মনে শান্তি পাওয়ার আশায় এসেছেন। সে অনুসারে কী হল জানো? মুরুগনার ভগবানের সম্বন্ধে কয়েকটি তামিল কবিতা ও গান লিখেছে শুনে, তিনি কোন একজন বান্ধবীকে দিয়ে অনুরোধ করালেন যে তার মধ্যে ভাল কতগুলো যেন ইংরাজিতে অনুবাদ করানো হয়।

যদিও ভগবান উদাসীনভাবে বললেন, ''আমি কী জানি? মুরুগনারকে বরং জিজ্ঞাসা করো।'' কিন্তু আড়াইটার সময়ে গিয়ে দেখি তিনি কবিতাগুলো দেখছেন ও এখানে ওখানে চিহ্ন দিয়ে সুন্দরেশ আইয়ারকে দেখাচ্ছেন। আমি তাঁর স্নেহ দেখে অবাক হয়ে হলঘরে নিজের জায়গায় বসলাম। আমার দিকে চেয়ে ভগবান বললেন, ''রানি আমায় মুরুগনারের বই থেকে ক'টা গান বেছে ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়ে দিতে বলেছে। তার 'সন্নিধি মুরাই' বই-এ একটা 'ভৃঙ্গসন্দেশম্' নামে অংশ আছে। আমি সেখানে চিহ্ন দিলাম। ভাবটা নায়ক-নায়িকার। মন নায়িকা। রমণ নায়ক। ভৃঙ্গ (চঞ্চল বুদ্ধি) দাসী। চিহ্নিত গানের সারমর্ম- নায়িকা দাসীকে বলছে, 'আমার রমণ অদৃশ্য হয়েছে, তাঁকে খুঁজে নিয়ে এসো।' দাসী বলছে 'ও, শ্রীমতী! রমণ যখন তোমার আত্মস্বরূপ তখন তাঁকে কোথায় খুঁজব? অন্ন উষ্ণ থাকলে তুমি বলো, 'ও! আমার রমণ, আমার প্রভু হৃদয়ে রয়েছেন এই উত্তাপ কি তাঁর লাগবে না? এখন কোথায় গিয়ে খুঁজব? তোমার স্বামী যখন তোমার অন্তরেই রয়েছেন, তখন তাঁকে কোথায় খুঁজব? এই ভ্রান্তি ছাড়ো। যে স্বামী অন্তরে রয়েছেন তাঁর সঙ্গে মিলিত হও ও শান্তিতে থাকো।' গানগুলোর এই নির্যাস। আমি এগুলো দাগ দিলাম তার কাজে লাগতে পারে। বেচারি মহিলা! স্বামী কোথায় আছেন জানা

নেই। মন অস্থির। সুতরাং আমাদের তাকে তার মানসিকতাকে মানিয়ে নিতে বলতে হবে। ভাবলাম এই কবিতাগুলো উপযুক্ত হবে।''

ইতিমধ্যে রানি হলঘরে এলেন, লোকাম্মাকে গানগুলো গাইতে বলা হল আর সুন্দরেশ আইয়ার সেগুলোর ইংরাজি তর্জমা করলে। তিনি বেশ সন্তুষ্ট হলেন। আমরা ভাবলাম, ভগবান এই সুযোগে আমাদের বিদেশে থাকা আত্মীয়-স্বজনের জন্য দুশ্চিন্তা না করে যাতে আত্মস্বরূপ সর্বদা নিকটে থাকে তার জন্য মনকে অন্তর্মুখীন করতে উপদেশ দিলেন।

* * *

18ই জুলাই, 1947

(133) অক্ষয় লোক

গত পরশু একজন তামিল যুবক বিকালে ভগবানের কাছে গিয়ে বললে, ''স্বামী, আজ শুয়ে ধ্যান করার সময়ে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একজন কে তা বলতে পারছি না, ঘুমের মধ্যে এসেছিল। আমাকে দেখে, দৃঢ়স্বরে বললে 'ঈশ্বরের চৌদ্দমাথাওলা কল্কী অবতার হয়েছে। কোথাও তাকে পালন করা হচ্ছে।' ভগবান নিশ্চয়ই কল্কী অবতার এখন কোথায় রয়েছেন বলতে পারবেন, সেই ভেবে এখানে এসেছি।''

''বেশ তো! যে তোমায় স্বপ্নে দেখা দিয়েছিল তাকেই জিজ্ঞাসা করলে না কেন? তোমার সে সময়ে তাকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। তাতে আর কী ক্ষতি হয়েছে? আবার সে ফিরে আসা অবধি ধ্যান করতে থাকো'', ভগবান বললেন। কথার অর্থ না বুঝতে পেরে ছেলেটি বললে, ''আমি ধ্যান করতে থাকলে, সে কি সত্যই এসে, যা জানতে চাই তা আমাকে বলে যাবে?'' ভগবান বললেন, ''সেই অবতার পুরুষ কোথায় আছেন জানতেও পারো আবার নাও পারো। কিন্তু যদি ধ্যান করা ছেড়ে না দিয়ে অবিরাম করে যাও তবে সত্য জানতে পারবে। তখন আর কোন সন্দেহ থাকবে না।''

এই কথাবার্তার সুযোগ নিয়ে আর একজন বললে, ''বলা হয় যে, ঈশ্বর অক্ষয় লোকে থাকেন। এটা কি সত্য?'' ভগবান উত্তর দিলেন, ''আমরা যদি অস্থায়ী লোকে থাকি তাহলে তিনি অক্ষয় লোকে থাকবেন। আমরা কি অস্থায়ী লোকে আছি? যদি এটা সত্য হয় তবে সেটাও সত্য। যদি আমরা সত্য না হই তবে জগৎ-ই বা কোথায় আর কাল-ই বা কোথায়?''

ইতিমধ্যে একটি চার বছরের ছোট ছেলে একটা খেলার মোটর গাড়ি নিয়ে হলে ঢুকল। সেটা দেখে ভগবান বললেন, ''দেখ, গাড়ি আমাদের বয়ে আনল না আমরাই গাড়ি নিয়ে এলাম। এইটাই ঠিক'', বলে হাসতে লাগলেন। পরে আমার দিকে চেয়ে বললেন, ''দেখ, এটাও একটা দৃষ্টান্ত বলে নেওয়া যায়। আমরা বলি 'আমরা গাড়িতে বসলাম', 'গাড়িতে যাচ্ছি', 'গাড়িতে এলাম'। গাড়িটা অচেতন আমরা না চালালে কি সেটা চলে? না। কে চালায়? আমরাই। সেরূপ এই জগৎও। আমরা না থাকলে জগৎ কোথায়? জগতের এই সৌন্দর্য দেখা ও অনুভব করার জন্য নিশ্চয় কেউ আছে। সেই দ্রষ্টা কে? সে। সে সর্বব্যাপী। তবে ক্ষণিক-ই বা কী আর অক্ষয়-ই বা কী? যদি আত্মানুসন্ধানে সত্য জানা যায় তবে আর কোন সমস্যা হয় না।'' ভগবান পূর্বেই এটি সূত্রাকারে সদ্‌বিদ্যার ষোড়শ পদে লিখেছেন (73 সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য)।

* * *

20শে জুলাই, 1947

(134) জ্ঞানদৃষ্টি

নিজের ইচ্ছা হলে কিংবা কেউ অনুরোধ করলে ভগবান ছোট ছোট কাগজে শ্লোক, পদ বা দু'চার লাইন লেখেন। অনেক হারিয়ে গেছে, তা সত্ত্বেও যা পাওয়া গেছে তা সযত্নে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। আমি একটা সাদা খাতা সেলাই ক'রে সেগুলো আঠা দিয়ে লাগিয়ে রাখতে

চেয়েছিলাম। কখনো সখনো একথা ভগবানকে বললে তিনি সব সময়ে উত্তর দেন, ''কী দরকার?''

গতকাল বিকালে আমি সেগুলো লাগাবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে তাঁকে অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন, ''কেন? যদি সবগুলো এক জায়গায় থাকে, কেউ না কেউ স্বামীর লেখা দেখে নিয়ে চলে যাবে। আমরা কিছু বলতে পারব না। স্বামী সকলের সম্পত্তি। ওগুলো আলাদা আলাদা থাকাই ভাল।'' তখন আমি ভগবানের আপত্তির আসল কারণ বুঝলাম আর চেষ্টা করা ছেড়ে দিলাম।

ইতিমধ্যে সম্প্রতি আগত একজন ব্যস্তবাগীশ যুবক জিজ্ঞাসা করলে, ''স্বামী, জ্ঞানীর বাহ্যদৃষ্টি ছাড়া জ্ঞানদৃষ্টিও আছে মনে হয়। আমায় অনুগ্রহ করে সেই জ্ঞানদৃষ্টি দান করে কৃপা করুন কিংবা যিনি আমায় এরূপ দিতে পারেন, তিনি কোথায় আছে বলুন?'' ভগবান উত্তর দিলেন, ''এই জ্ঞানদৃষ্টি নিজের চেষ্টায় লাভ করতে হবে, এটা কেউ কাউকে দিতে পারে না।'' সেই যুবক বললে, ''গুরু যদি ইচ্ছা করেন তবে দিতে পারেন, বলা হয়।'' ভগবান বললেন, ''গুরু কেবল বলতে পারেন 'তুমি যদি এই পথ অনুসরণ করো তাহলে জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করবে।' কিন্তু কে অনুসরণ করছে? একজন গুরু, যিনি জ্ঞানী তিনি কেবল পথ প্রদর্শক কিন্তু চলাটা (অর্থাৎ সাধনা) শিষ্যদের নিজেদেরই করতে হবে।'' যুবকটি হতাশ হয়ে চলে গেল।

একটু পরে রমণনগরবাসী এক ভক্তের পাঁচ কি ছয় বছরের মেয়ে তাদের বাগানের দু'টি কাঁচা ফল এনে ভগবানকে দিলে। সে প্রায়ই ফল ও মিষ্টি এনে ভগবানকে দেয়। এরূপ ক্ষেত্রে ভগবান সবসময়ে বলেন, ''এগুলো কেন?'' কিন্তু তা সত্ত্বেও খান। গতকাল না খেয়ে ফেরত দিয়ে বললেন, ''বাড়ি নিয়ে গিয়ে ফলটি ছোট ছোট করে কেটে সবাইকে দিয়ে বলবে 'এই ভগবানকে দিলাম', 'এই ভগবানকে দিলাম' আর নিজেও একটা খাবে। ভগবান সবার মধ্যে আছেন। রোজ রোজ এসব নিয়ে আসো

কেন? তোমাকে না বারণ করেছি। সবাইকে দাওগে যাও। ভগবান সবার মধ্যে আছেন, লক্ষ্মীটি যাও।'' মেয়েটি দুঃখিত হয়ে চলে গেল। আমার দিকে চেয়ে ভগবান বললেন, ''ছোটদের এরূপ আনতে খুব আনন্দ হয়। তারা যদি বলে স্বামীকে কিছু দেবে, তারা জানে যে তারাও কিছু পাবে। যখন পাহাড়ে ছিলাম, ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটি থাকলেই আমার কাছে আসত। তারা মা-বাবার কাছে পয়সা চেয়ে তাই দিয়ে মিষ্টি, বিস্কুট আর এইরকম সব নিয়ে আসত। আমিও তাদের সঙ্গে বসে আমার ভাগ পেতাম।''

আমি বললাম, ''তাহলে আপনি বালগোপালের মতো বনভোজন করতেন।'' ''তারা যদি বলে স্বামীর জন্য কিছু নিয়ে যাবে, তারা জানে যে তারাও কিছু পাবে। এটা কখনো সখনো করলে, বেশ ঠিক আছে। কিন্তু রোজ কেন? ওরা সবাই খেলে কি সেটা আমারই খাওয়া হল না?'' ভগবান বললেন। তিনি যে সবার মধ্যে রয়েছেন এটা স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আমার মন আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল।

এক সপ্তাহ কি দশদিন আগে কী হয়েছিল জানো? সকালে জলখাবারের সঙ্গে কেউ ভগবানকে আর সবার থেকে বেশি কমলালেবু পরিবেশন করেছিল। তাই দেখে ভগবান কমলালেবু খাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলেন। চার পাঁচদিন আগে যখন ভক্তেরা আবার কমলালেবু খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল তখন ভগবান বললেন, ''তোমরা সবাই খাচ্ছ, এই তো যথেষ্ট।'' ভক্তেরা বললে, ''আপনি খান না, আমাদের কি খেতে কষ্ট হয় না? তাই আমাদের ক্ষমা করার জন্য অনুরোধ করছি।'' ভগবান বললেন, ''ক্ষমা করার কী আছে? আমার ওটা তেমন ভাল লাগে না।'' তারা বললে, ''ওটা ভগবানের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।'' তিনি উত্তর দিলেন, ''দেখ, প্রায় একশ' লোক জলখাবার খাচ্ছে। আমি এতগুলো মুখে খাচ্ছি তাতে হবে না? এই মুখটা দিয়েই কি খেতে হবে?''

এই জ্ঞানদৃষ্টি। কে এটা অন্যদের দিতে পারে?

* * *

19শে জুলাই, 1947

(135) শ্রবণ, মনন আরও অন্যান্য

গতকাল কুম্ভকোনাম থেকে দু'জন পণ্ডিত এসেছিলেন। আজ সকাল 9টায় তাঁরা ভগবানের কাছে গিয়ে বললেন, ''স্বামী, আমরা বিদায় নিচ্ছি। আমাদের প্রার্থনা, আপনি আশীর্বাদ করুন যাতে আমাদের মন শান্তিতে মিশে বা গলে যায়।'' ভগবান যথারীতি ঘাড়টি নাড়লেন। তাঁরা চলে গেলে, তিনি রামচন্দ্র আইয়ারের দিকে চেয়ে বললেন, ''শান্তিই প্রকৃত স্বরূপ। বাইরে থেকে যা আসে তা যদি ত্যাগ করা যায় তবে সেখানে যা থাকে তাই শান্তি। তাহলে কী বা মিশবে বা গলবে? বাইরে থেকে যা আসে তা কেবল দূর করতে হবে। যাদের মন পরিপক্ক হয়েছে তাদের যদি একবার বলা যায় যে স্বরূপই শান্তি তারা জ্ঞান লাভ করে। কেবল অপরিপক্ক মনের জন্যই শ্রবণ ও মননের বিধান কিন্তু পক্ক মনের এসব প্রয়োজন নেই। দূরের লোক যদি জিজ্ঞাসা করে যে রমণ মহর্ষির কাছে কী করে যেতে হয়, আমাদের বলতে হবে এই ট্রেনে চড়বে, এই এই রাস্তায় যাবে। কিন্তু তারা যদি রমণাশ্রমে এসে হলঘরে পা দেয় তবে তাদের ইনিই সেই ব্যক্তি বললে যথেষ্ট হয়। তাদের আর কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই।''

কেউ একজন বললে, ''শ্রবণ ও মননের অর্থ বেদান্তে যা বর্ণনা করা হয়েছে, তাই তো?'' ভগবান উত্তর দিলেন, ''হাঁ। কিন্তু একটা কথা। কেবল যে বাইরের শ্রবণ ও মনন আছে তা নয়, আন্তর শ্রবণ ও মননও আছে। মনের পরিপক্কতার ফলে এগুলো হয়। যারা আন্তর শ্রবণের অধিকারী হয় তাদের আর কোন সন্দেহ থাকে না।''

যখনই কেউ আন্তর শ্রবণ কী জিজ্ঞাসা করেছে তিনি বলতেন, ''আন্তর শ্রবণের অভিপ্রায়, হৃদয় গুহায় অবস্থিত সর্বদা 'অহম্, অহম্' ('আমি, আমি') অনুভবে সমুজ্জ্বল আত্মার জ্ঞান আর এই অনুভূতিটা যে হৃদয়ে রয়েছে জানাই মনন, আর নিজের আত্মাতে থাকাই নিদিধ্যাসন।''

এই অবসরে, এ সম্বন্ধে ভগবানের লেখা শ্লোকটি মনে করা সময়োপযোগী। এই শ্লোকে কেবল যে 'আত্ম-স্মরণের' কথা বলা হয়েছে তা নয় উপরন্তু তা লাভের উপায়গুলোও দেওয়া হয়েছে। লাভ করার অর্থ নিজের আত্মাতেই থাকা।

হৃদয়কুহরমধ্যে কেবলং ব্রহ্মমাত্রং।
হ্যহমহমিতি সাক্ষাদাত্মরূপেণ ভাতি।
হৃদি বিশ মনসা স্বম্ চিন্বতা মজ্জতা বা।
পবনচলন রোধাদাত্মনিষ্ঠো ভব ত্বম্॥
হৃদয়কুহর মধ্যে ব্রহ্ম একমাত্র।
'আমি' 'আমি' আত্মারূপে করিছে নৃত্য।
মনের অনুসন্ধানে, তন্ময়তা বা
শ্বাস সংযমে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া
স্বময় হইয়া, তুমি আত্মনিষ্ঠ হও॥

॥ ওঁ শ্রীরমণ অর্পণমস্তু॥